[ব্রজপর্ব]

বীরেন্দ্র মিত্র

পরিবেশক

নাথ ব্রাদার্স ॥ ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ॥ কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ
জুলাই ১৯৮২

প্রকাশক
সমীরকুমার নাথ
নাথ পাবলিশিং
২৬ বি পণ্ডিতিয়া প্লেস
কলকাতা ৭০০০২৯

প্রচ্ছদ
গৌতম রায়

মুদ্রক
প্রফুল্লকুমার বক্সী
জয়দুর্গা প্রেস
৮৩ রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০০০৯

যদুবংশ

[ব্রজপর্ব]

সম্পন্ন হয়েছিল কুরুক্ষেত্রে, দেবতা ও ব্রাহ্মণদের কূট-রাজনীতি তাকে সুসম্পূর্ণ করে যদুবংশ ধ্বংস করে। ভারতে আর্য-প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় অঙ্গন তাই প্রভাসক্ষেত্র। মহাভারতকার এই সমান্তরাল ইতিহাসটি চেপে গিয়ে মৌষলপর্বে একটি অবিশ্বাস্য রূপকথা অতি স্বল্পতম বাক্যে সাজিয়ে গেছলেন, যা প্রকৃত ইতিহাস নয়, যদুবংশে কলঙ্ক লেপনই ছিল যার মুখ্য উদ্দেশ্য। যদুদের ইতিহাস তাই বিভিন্ন পুরাণে অনুসন্ধান করতে হয়।

এই ইতিহাসকে আমি তিনটি পর্বে খুঁজে দেখার চেষ্টা করব, ব্রজ, মথুরা ও দ্বারকা পর্বে। ব্রজপর্বে বাসুদেব কৃষ্ণের রাজনৈতিক উত্থানের মধ্য দিয়ে সেই ইতিহাসের শুরু। সেটাই বর্তমান উপন্যাসের বিষয়। পরের কথা পরবর্তী পর্বে।

উপন্যাসে প্রসঙ্গ কথা ও তথ্য সূত্র যোজনা, আমার বিশ্বাস, ইতিপূর্বে অন্য কেউ করেন নি। দেখা যাক, এ বিষয়ে পাঠকরা কে কি বলেন।

এই সিরিজে

লেখকের অন্য বই

দানিকেনতত্ত্ব ও মহাভারতের স্বর্গদেবতা

কুরুক্ষেত্রে দেবশিবির

মুখবন্ধ

যদুবংশ [ব্রজপর্ব] উপেন্দ্র কৃষ্ণের রাজনৈতিক উন্মেষকালীন জীবনোপন্যাস মহাভারত সিরিজে এটি আমার তৃতীয় গ্রন্থ হলেও বাসুদেব কৃষ্ণের জীবনালেখ্য রচনার ক্ষেত্রে এটিই প্রথম পর্ব, যদিও বলাই বাহুল্য, ব্রজপর্বে স্বয়ং সম্পূর্ণ। পূর্ববর্তী গ্রন্থদ্বয়ের মতো এ বইকেও আলোচনার আকারেই সাজিয়ে তোলার প্রাথমিক পরিকল্পনা ছিল। এর বিজ্ঞাপিত নামও তাই ছিল, যদুবংশ ধ্বংসকথা।

কিন্তু লেখা যখন এগিয়ে গেছে, প্রায় শ'খানেক পাতার পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত, বেশ কিছু পাঠক পাঠিকার কাছ থেকে •তখন অনুরোধ এলো, কৃষ্ণকথা যেন গল্পাকারেই লেখা হয়। তাঁদের বক্তব্য,—যত সরস ও সহজ সুরেই লিখিত হোক-না-কেন, নিবন্ধ প্রবন্ধের প্রতি সাধারণ পাঠক-মহলে একটা স্বাভাবিক পাঠ-অনীহা আছে। নিবন্ধাকারে লিখিত হলে কৃষ্ণের প্রকৃত ইতিহাস সম্পর্কে কৌতুহলী সাধারণ পাঠকরা তাঁদের কৌতুহল পূরণের সুযোগে বঞ্চিত হবেন। সুতরাং তাঁদের জন্যই লেখাকে ঢেলে সাজান দরকার অতএব প্রস্তুত পাণ্ডুলিপি বাতিল হয়ে গেল।

এঁদের দাবি মেনে নিয়ে বর্তমান রচনাবলীকে নোতুন করে ঢালাই করতে বসে দেখলাম, তর্ক যুক্তি তথ্য প্রমাণ ও ব্যাখ্যাকে চরিত্রে সংলাপে ও ঘটনাবর্তের মাধ্যমে উপস্থাপিত করা বেশ কঠিন কাজ। কৃষ্ণকথা সম্পর্কে প্রচলিত ধ্যান ধারণা ভেঙে যা পুরাণে প্রতিষ্ঠিত প্রকৃত ইতিহাস, মহাভারত পুরাণ থেকে তাকে নিছক গল্পাকারে হুবহু তুলে আনা যায় না। প্রচলিত শ্রীকৃষ্ণকথা উপন্যাসাকারে কেউ কেউ আমাদের উপহার দিয়েছেন বটে, কিন্তু তাতে শুধু দুধের সাধ ঘোলে মেটে, পুরাণ মহাভারতের মুনিতে বানানো আবহমানের গল্পগাছার জঙ্গলে হারিয়ে-যাওয়া লুপ্ত ইতিহাসটি উদ্ধার করে আনা সম্ভব হয় না। সেজন্য দরকার, তাত্ত্বিক আলোচনা। অতএব বিষয়টি নিয়ে মগ্ন করতে সময় বহে যেতে লাগল হু হু করে। ওদিকে আবার আগ্রহী পাঠকদের তাগিদ বহন করে প্রকাশক সমীর নাথ প্রায়ই উপস্থিত হচ্ছেন। সংবাদ, বিভিন্ন বইমেলা এবং তাঁর ঠিকানায় খোঁজ হচ্ছে এই বইয়ের, অতএব সমীরের ভাষায়, 'কৈ বীরেনদা, বংশ ধ্বংস, কতদূর ?'

সমস্যা সমাধানের জন্য সুতরাং একটি অভিনব পন্থা গ্রহণ করতে হল। পুরাণের রূপক অলঙ্কার ছাড়ালে যে চমকপ্রদ ইতিহাসটি বার হয়ে আসে গল্পাকারে তাকেই গাঁথলাম এবং চিরায়ত ধারণার সঙ্গে বে-মিল এই কাহিনীর সূত্র নির্দেশ করার জন্যে উপন্যাসের শেষে সংযুক্ত করলাম একটি প্রসঙ্গ কথা ও তথ্য সূত্র।

গল্পের ধারায় যেখানেই প্রচলিত ভাগবত কাহিনীর মধ্যে ব্যতিক্রম লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসু হবেন পাঠক সেখানেই তিনি পাবেন ফুটনোট নির্দেশক এক একটি সংখ্যা। বাক্যের সঙ্গে উল্লিখিত এই সংখ্যা অনুসরণ করে পরিশিষ্টে প্রসঙ্গ সূত্রটি দেখে নিলেই পাঠকের কৌতূহল মিটবে। কোন্ পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক সূত্র অবলম্বনে চিরায়ত ধারণার ব্যত্যয় ঘটিয়ে নতুন কথা লেখা হল, পাঠক তার যথাযথ নির্দেশ পাবেন ও এভাবেই তাঁর গল্পপাঠের সঙ্গে সঙ্গে পুরাণ প্রবেশও সহজ হবে।

যাঁরা অনুসন্ধিৎসু গবেষক পাঠক, নিছক গল্পরসে অনাসক্ত, প্রসঙ্গসূত্র ও প্রসঙ্গটীকা তাঁদের হাতে তুলে দেবে গবেষণার কাজে সহায়ক যাবতীয় তথ্য। কেননা এই উপন্যাসটি দীর্ঘ গবেষণারই ফলশ্রুতি। কঠোরভাবে এ গল্পকে যেমন তথ্যনিষ্ঠ রাখার চেষ্টা করেছি এবং সেজন্য বিভিন্ন পুরাণের সাহায্য নিয়েছি, তেমনি কৃষ্ণকথা সম্পর্কে আমার পূর্বসূরী ভারততাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকদের বক্তব্যগুলি বিশ্লেষণ করে গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যাটি গ্রহণ করেছি এবং প্রয়োজনে কিছু কিছু মহাজন উক্তি উদ্ধার করেছি প্রসঙ্গটীকায়।

এভাবেই গল্প ও তাত্ত্বিক আলোচনাকে একাধারে সাজিয়ে পাঠকের হাতে তুলে দিতে সময় গেছে। তাই বইটির বিলম্বিত প্রকাশ যাঁদের বিরক্তির কারণ ঘটিয়েছে, আশা করি, বইটি হাতে নিয়ে অতঃপর তাঁরা বিলম্বজনিত ত্রুটি নিজগুণে ক্ষমা করবেন।

যদুবংশ ধ্বংসকথা একখানি বই লিখে শেষ করার বিষয় নয়। সেটি আর একটি মহাভারত। মহাভারতে যাদবদের ইতিহাস কুরু পাণ্ডব পাঞ্চালদের ইতিহাসের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবেই প্রবাহিত হয়েছে। বরং যদুবংশের আয়ুই দীর্ঘতর আর তাই তাদের কথাই দীর্ঘায়াত। কুরুক্ষেত্রে আর্যাবর্তের ক্ষত্রিয় বীরপুরুষরা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেকের ছত্রিশ বছরকাল পরেও যাদব বীরেরা কুশস্থলিতে নিজেদের প্রতিষ্ঠা অক্ষুন্ন রেখেছিলেন। ব্রহ্মার পরিকল্পনায় আর্যাবর্তে ভারাবতরণের (দেশীয় নৃপতিবর্গ ধ্বংসের) কাজ অর্ধেক

১

ব্রজপুর থেকে শূরসেনের রাজধানী মথুরার পথ দীর্ঘ অরণ্যের কোল ঘেঁষে এঁকেবেঁকে ঢেউ তুলে মাঝে মধ্যে যমুনার নীল জলধারার পাশাপাশি গড়িয়ে গেছে। ভোর সকালে ঝাঁক ঝাঁক টিয়া, মাছখেকো তপস্বী সাদা বক এবং অন্যান্য পাখি কলস্বরে এ পথের মাথায় পবিত্র মায়া ছড়িয়ে উড়ে যায়। সন্ধ্যার পর থেকেই কিন্তু পথরেখা ভারি অন্ধকারের কম্বলে গা ঢেকে ক্রমশ নির্জন হতে থাকে। পথিকের চলাচল থেমে যায়, গৃহপালিত নিরীহ জীবেরাও সাহস পায় না জঙ্গলের ছায়ায় ঘুরে বেড়াতে। তখন পথটা শিকারী অজগরের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে থাকে। জঙ্গুলী বাতাস হিস হিস শ্বাস ফেলে। অরণ্যচারী নিশাচররা সজাগ হয়ে ওঠে।

এখন হেমন্তের শেষ অমাবস্যা। শূরসেন, আর্য্য বা উত্তর প্রদেশের অংশ-বিশেষ, এ সময় কনকনে ঠাণ্ডায় কাবু হয়ে আছে। সূর্য্যি ডুবলেই শীত লাফ দিয়ে নেমে চারদিক দখল করে নেয়। পথে জনপ্রাণীর চিহ্ন থাকে না। কিন্তু আজ তারই ব্যতিক্রম সৃষ্টি করে একলা একটা গো-শকট এই পথে কচর কচর করে এগিয়ে চলেছে। গাড়ির নিচে লণ্ঠের আলো পিট পিট করছে, লড়ে চলেছে ঘন কুয়াসার সঙ্গে। বলদের গলায় টুংটাং ঘন্টির শব্দ। তফাৎ যাও! বলে তারা যেন ভয়ার্ত আর্তনাদ ছাড়ছে এবং জঙ্গলের রাজত্বে এভাবে বিঘ্ন সৃষ্টি করায় গাড়ির সওয়ারীরাই যেন ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে আছে বেশি। শান্তি-ভঙ্গের অপরাধে মিশমিশে কালো জন্তুটা একবার যদি গাড়ির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে...

অথচ মহাত্মা ঋষি গর্গের উপায় ছিল না। তাঁর ওপর কড়া আদেশ রাতের আঁধারেই মথুরার পথে গাড়ি নিয়ে ছুটে। অন্ধকারে ব্রজবাসী এ

কংসচরদের নজর এড়িয়ে রাতে রাতে গন্তব্য স্থানে পৌঁছে যাওয়াই সঙ্গত। লোক জানাজানি হলে বিষ্ণু ও বসুদেবের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে, গর্গ ও ব্রজপুরের বিপদ তাতে বাড়বে বই কমবে না।

গাড়ির ছাউনির নিচে কম্বল মুড়ি দিয়ে নিঃশব্দে বসে আছেন গর্গ। অন্যমনে তাকিয়ে আছেন পেছনে সরে-যাওয়া রহস্যময় চাপ চাপ অন্ধকারের দিকে। বাতাস ভারি ও স্তব্ধ। আকাশ কোটি কোটি নক্ষত্রের জরিবুটির নক্সাতোলা কালো আচ্ছাদনে ঢাকা। যমুনার জলে একটানা ঝির ঝির শব্দ। জঙ্গলের গভীরে নানা রকম ভৌতিক আওয়াজ।

বলদ দুটির চোখ গো-চর্মের ঢাকা দিয়ে আড়াল করা। তারা অন্ধের মত গাড়ি টানছে। গাড়োয়ানের হৃদ্‌স্পন্দন গাড়ির গতির চেয়ে দ্রুত। ভয় তাড়াবার জন্য অকারণে বলদ দুটোর লেজ মুচড়ে 'হর্‌র্ হর্‌র্, ছ ছ' করে মাঝে মধ্যে শব্দ-লহর সৃষ্টি করছে সে। আবার ধ্যানস্থ গর্গের উপস্থিতি অনুভব করার জন্য উত্তর না-পেয়েও আপন মনে বকবক করছে। মূল বক্তব্য: এমন একটা বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে ঠাকুরের পক্ষে সন্ধ্যাকালে পথে বার হওয়া ঠিক হয়নি। বলদ দুটোর মতো গরিব মুখ্যু গাড়োয়ানের না হয় জীবনের দাম নেই। কিন্তু ঠাকুর! তিনি তো ছিলেন গোপরাজ নন্দের মাননীয় অতিথি। রাতটা মজবুত দুর্গের মত নন্দালয়ে কাটিয়ে দিনমানে পথে নামলেই পারতেন। বলা যায় না, এখনি হয়ত ঘাপটি-মারা কোনো শের কিম্বা একদল হাতী অথবা একপাল বুনো মোষের পাল্লায় পড়ে প্রাণটা হারাতে হবে। তা ছাড়াও আছে ভূত প্রেত চুরাইনের (ছলনাময়ী প্রেতিনী) উপদ্রব। তাদের নজরে পড়লে আর কি কেউ ঘরে ফিরে যাওয়ার আশা রাখে?

গর্গের কান ছুঁয়ে কথাগুলো বেরিয়ে যায়। তিনি আকাশের নক্ষত্রপথে দৃষ্টি পেতে বসে আছেন। এমন মেঘমুক্ত ভয়ঙ্কর সুন্দর আর উজ্জ্বল আকাশ নির্জন শীতার্ত অমাবস্যা ছাড়া দেখা যায় না। জ্যোতির্বিদ গর্গ দুচোখ মেলে দেখেন। মাথার ওপর যেন একটা ঢাউস কালো কড়াই উবুড় করে কেউ সাদা তিলচূর্ণ ছড়াচ্ছে। পুট পুট করে ফুটে উঠছে বিভিন্ন রাশিচক্র ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি নিয়ে। মনে পড়ে, দেবতা বিষ্ণু কথা দিয়েছেন, নক্ষত্রলোকের অপার অজ্ঞাত রহস্য সম্পর্কে শ্রেষ্ঠ ও গুপ্ত জ্ঞান গর্গ লাভ করবেন জ্যোতির্বিদ দেবতাদের কাছ থেকে। বিনিময়ে দেবতাদের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে হবে তাঁকে। শূরসেনে বিষ্ণুর পুনঃ প্রতিষ্ঠা চাই-ই। ভোজবংশ-বিবর্ধন কংসের ক্ষমতালাভের পর

শূরসেনে বিষ্ণুর প্রাধান্য লুপ্ত হয়েছে। সেই লুপ্ত প্রাধান্য বিষ্ণু ও বিষ্ণু-অনুগামী যাদবদের ফিরে পেতেই হবে। সেটাই দেবকার্য।

সৃষ্টির আদিকাল থেকে জীবজগতে একমাত্র মানুষই প্রলোভনের দাসত্ব স্বীকার করেছে। তাতেই তার বাড় বৃদ্ধি। এক একজন বুদ্ধিমান মানুষ এক এক জাতের প্রলোভনের পেছনে ছুটেছে। মানুষের ইতিহাসের এক একটি দিক তাতে সমৃদ্ধ হচ্ছে। সেই সব দিকের দিকপাল হয়ে বসেছেন এক একটি মহান পুরুষ। জ্যোতির্বিদ্যার জ্ঞানভাণ্ডারে গর্গকে প্রবেশ করতেই হবে। আর সেই সমৃদ্ধ ভাণ্ডারের চাবিকাঠি আছে দেবতাদের হাতে। নক্ষত্রলোকের দিক্‌বিদিক তাঁদের নখদর্পণে। অতএব বিষ্ণুব প্রস্তাবে সম্মত হয়েছেন যদুকুলগুরু গর্গ। বর্তমানে দেবক বসুদেব অন্ধকদের মতো তিনিও বিষ্ণুদাস, অর্থাৎ যদুকুলপতি কংসের বিদ্রোহী প্রজা। সুতরাং কংস যতকাল সিংহাসনে, অন্ধকারই ততদিন তাঁর আশ্রয়। গোপন অভিসন্ধি অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়েই চরিতার্থ হয়। অন্ধকারকে ভয় পেলে সিদ্ধি লাভ ঘটে না।

—ঠাকুর! নিদ আসছে না কি? গাড়োয়ান সাড়া নেয়।

—না! আমি জেগেই আছি।

—বাপস্‌ রে বাপ্‌! বহুত অন্ধেরা! গাড়োয়ান জানায়, গোটা জঙ্গলটা এখন প্রেতভূমি হয়ে আছে।

গর্গ বলেন,—বিষ্ণুর নাম করো, ভয় দূরে সরে যাবে।

—বিষ্ণু কৌন্?

গর্গ বোঝেন, সাধারণ গোপেরা বিষ্ণুর কথা জানে না। তারা ইন্দ্রসেবক।

গর্গ বলেন—বিষ্ণুই প্রধান দেবতা।

চিন্তিত গাড়োয়ান জানতে চায়, বিষ্ণু কি ইন্দ্রের চেয়ে বড়ো?

গর্গ সংক্ষিপ্ত জবাব দেন সম্মতি জানিয়ে তবে তাঁর আর কথা বলতে ভালো লাগে না। অন্য সময় হলে লোকটাকে ধমকে থামিয়ে দিতেন। কিন্তু এখন সেটা উচিত নয়, ভয় তাড়াতে সে কথা চালিয়ে যেতে চায়। জন্তু-জানোয়ারের চেয়ে নিরক্ষর মানুষদের মনে ভূতের ভয়, অতিলৌকিক বিষয় সম্পর্কে ভীতিই বেশি। তাছাড়া গাড়োয়ান গর্গের আসল পরিচয়ও জানে না। তাই গর্গকে যতটা ভয় ও সমীহ করা তার উচিত, ততটা অবনত হওয়ার কথাও তার মনে আসে না। গর্গকে সে গোপরাজ নন্দের অতিথি সাধারণ দান-গ্রহণকারী পুরোহিত হিসেবেই বিবেচনা করছে।

আবার কিছুক্ষণ হট্ হট্ ছ ছ হর্‌র্ হর্‌র্ ধ্বনি সৃষ্টি করে ঘড়ঘড়িয়ে গাড়ি ছোটায় গাড়োয়ান। ঝম্‌ঝম্ বাজে বলদকণ্ঠের ঘুঙুর।

হঠাৎ অস্ফুট গোঙানার স্বর ভেসে আসতে গর্গের অন্যমনস্কতা কেটে যায়। চমকে গাড়োয়ানের দিকে ফিরে তাকান। লাগাম আলগা করে পাথরের মূর্তির মতো বসে আছে লোকটা। মাথাটা জঙ্গলের দিকে কোনাকুনি ফেরানো।

—কী হল রে! অমন করছিস কেন?

একটা হাত কাঁপতে কাঁপতে একটু উঁচু হয়, জড়িত কণ্ঠে গাড়োয়ান জানায় জঙ্গলে শের অথবা প্রেতের চোখ জ্বলছে। ঐদিকে। এক, দুই, তিন জোড়া!

মিথ্যে নয়, দৃষ্টিভ্রমও নয়। গর্গও সেই আলোকবিন্দু দেখতে পান। অনুমানে বোঝেন, ঐ তিনজোড়া আলোকবিন্দুর দূরত্ব খুব কম নয়। জঙ্গলের কোনো এক প্রান্তে ওগুলো টিমটিম করছে গাছ-গাছালির ফাঁকে। কিন্তু ঐ তিনজোড়া আলোর বিন্দু যে বাঘের চোখ নয়, গর্গের তা বুঝতে দেরি হয় না।

আলো দেখে ভয় দূরের কথা, গর্গ বরং উৎসাহে ছাউনির ভেতর নড়ে চড়ে বসেন। মনে মনে বলেন, তবে কি এটাই সেই জায়গা? এখানেই তাঁর নৈশ অভিযানের ইতি?

গাড়োয়ানকে বলেন,—এখান থেকে বৃন্দাবন কতদূর বল্‌ত?

—কিছু তো দিক্‌বিদিক ঠাহর হচ্ছে না ঠাকুর! তো যতটা দূর এসেছি, মনে হয় কি, বৃন্দাবন ক্রোশ খানেক হবে। জঙ্গলের ভেতব আর এক পথ চলে গিয়েছে, সেই দিকে।

যমুনা বাঁক নিয়েছে এখানে। চলে গেছে আন্‌পথে গোবর্ধন পর্বতের দিকে। মথুরা, ব্রজভূমি, বৃন্দাবন। হিসেব ঠিকই মিলছে তাহলে। এমন এক জায়গায় জঙ্গলের ঘন রোমশ নাভিমূলেই তাঁদের তাঁবু থাকার কথা। গর্গের আর সংশয় নেই। নিশ্চয় ঐ আলোক বিন্দু সেই আস্তানারই আলো। তিনি নিশ্চিন্ত হন।

বলেন,—গাড়ি থেকে নেমে আলোটা খুলতে পারবি?

—হাই বাপস! এ্যায়সা আদেশ মৎ দিজিয়ে ঠাকুর! গাড়োয়ান যেন প্রাণভয়ে আর্তনাদ করে ওঠে।

সাহস দিয়ে গর্গ বলেন—ভয় কি, আমিও তোর সঙ্গে নামছি।

আলোটা নিয়ে গর্গ সঙ্কেত জানাতে চান। কিন্তু গাড়োয়ান গাড়ি থেকে

নামতে নারাজ। যেন এই দুহাট-খোলা বাঁশ কাঠের গাড়িটাই তার দুর্গ। এমন ভয়ঙ্কর জায়গায় বেচারা সেই দুর্গ পরিত্যাগ করতে রাজি নয়।

নিরুপায় বোধ করেন ঋষি গর্গ। জোর দিয়ে আদেশ করতেও পারেন না। কেননা এখান থেকে আলোগুলির যে দূরত্ব তাতে বোঝা দায়, পথের ঠিক কোনখানে গিয়ে সঙ্কেত জানানো উচিত। অন্ধকারে আলোকবিন্দু বহুদূর থেকেও নজরে পড়ে। তবে এটাও ঠিক, ঐ আলোকবিন্দু ব্রজভূমি ও বৃন্দাবনের মধ্যবর্তী স্থান নির্দেশ করছে। ব্রজভূমি অরক্ষিত উন্মুক্ত প্রান্তর প্রদেশ বললেই হয়। মথুরা থেকে এই সড়ক পথের দ্বারা সরাসরি যুক্ত। বৃন্দাবন বনপ্রান্তে অরণ্যবেষ্টিত অঞ্চল। সেজন্যই ঠিক হয়েছে নন্দকে তাঁর সম্প্রদায় নিয়ে বৃন্দাবনে সরে যেতে বলা হবে। সেখানে চট করে কংসচরদের পক্ষে উৎপাত সৃষ্টি করায় অপেক্ষাকৃত অসুবিধার কথা বিবেচনা করেই বিষ্ণু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। তাছাড়া মথুরা ও বৃন্দাবনের মধ্যে ঐ দেব-ছাউনি, যা দিনমানে ও রাত্রেও লোকচক্ষুর সম্পূর্ণ আড়ালে থাকে, তাও বৃন্দাবনের ওপর নজরদারি করতে পারবে সহজেই।

আবার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হল শকট চালকের ভয়ার্ত অস্ফুট আর্তনাদে। গর্গ গাড়োয়ানের দিকে চোখ ফেরাতেই তাঁর দৃষ্টিও স্থির হয়ে গেল। দেখলেন, ঘন জঙ্গল আর কুয়াসা ভেদ করে একটা বড়সড় আলোকবৃত্ত এইদিকে এগিয়ে আসছে। কুয়াসার দুর্ভেদ্য আবরণ থাকায় এখনো তা গাড়ির ওপর এসে পড়তে পারেনি। বোঝা যাচ্ছে, আলো এগিয়ে আসছে এবং জঙ্গলে শুকনো ঝরা পাতায় মচমচ শব্দ হচ্ছে। চলমান আলো দেখে ভয়ে মূর্ছা গেছে শকট-চালক।

গর্গ স্থির হয়ে বসে থাকেন। ভয় নয় তাঁর মনে এখন বরং সাহসই সঞ্চারিত হয়েছে। তিনি নিশ্চিত যে ঐ আলোকদণ্ড দেবতাদের হাতে থাকে। দেবলোকের প্রহরীরা এমনি হাতবাতি নিয়ে নিশুত রাতে গন্ধমাদন পর্বতে প্রহরায় নিযুক্ত থাকেন। দেবসান্ত্রীদের প্রধান যমরাজের তাঁরা অনুচর। নাম যমদূত। যমদূতদের সঙ্গে ভয়ঙ্কর শিকারী সারমেয় সঙ্গী দেখা যায়। এরা যেমনি হিংস্র, শত্রু সন্ধানে তেমনি তৎপর। আশ্চর্য এদের দেখতে। এদের নাক লম্বাটে আর দুটি প্রধান চক্ষু ছাড়াও এদের আছে বাড়তি দুটি করে অক্ষিগোলক। এদের রোমের রঙও ভয়াবহ বিচিত্রবরণ। পৃথিবীতে এমন কুকুর কোথাও দেখা যায় না।[২]

আলো আরও কাছে এসেছে। আলোর পেছনে থাকায় ধারকের চেহারা অস্পট। তবে তা মনুষ্যাকৃতি। সম্ভবত তার দেহ পীতবস্ত্রে আচ্ছাদিত। কেননা আচ্ছাদিত অবয়বটি কবন্ধ একটি শরীরের আকার নিয়েছে এখন। বস্ত্রের রঙের জন্যই অন্ধকারে তা অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। পীত-বসনধারী বিষ্ণুর সেবক হিসেবে বিষ্ণুদাসেরা হলুদ রঙের চাপা পোষাক ব্যবহার করেন। তাঁদের পায়ে থাকে চর্মপাদুকা এবং তা বাঁধা থাকে গোড়ালির উর্ধ্বভাগে।[২]

গর্গ শ্বাস রুদ্ধ করে একাকী অপেক্ষায় রইলেন। একা, কারণ শকটচালক মূর্ছিত। মূর্ছিত মানুষ তো মৃতেরই সমান।

কাছে এসে মূর্তিটি হাতের আলো নিভিয়ে সঙ্কেত বাক্য উচ্চারণ করলেন—জয় বিষ্ণু!

প্রত্যুত্তরে গর্গও করজোড়ে বললেন,—জয় বিষ্ণু।

আগন্তুকের কণ্ঠস্বর খসখসে, ভাষা মার্জিত সংস্কৃত, অন্ধকারে মুখ দেখা যায় না। মনে হয়, মৃদু হেসে তিনি প্রথমে এক টুকরো অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ করলেন। তারপর বললেন,—ভয় পেয়েছিলেন নাকি, ঋষি গর্গ!

একই রকম মার্জিত সংস্কৃতে গর্গ উত্তর দিলেন—আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা আগেই নির্দিষ্ট না থাকলে ভয় পাওয়া আমার পক্ষেও অস্বাভাবিক ছিল না।

অনুচ্চ কণ্ঠে হেসে দেবদূত বললেন,—মানুষেরা বড় অল্পেই ভীত হয়ে পড়ে। আপনার শকট চালক বোধহয় ভয়ে প্রাণ হারিয়েছে।

দেবতারা স্বাভাবিকভাবেই মর্ত্যবাসীকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখে থাকেন, গর্গ তা জানেন। এটা তাঁর পছন্দ নয়। কিন্তু দাসের পক্ষে আনুগত্য প্রকাশই রীতি। তাই গর্গ বললেন—সাধারণের পক্ষে দেবজ্যোতি সহ্য করা সম্ভব নয়। এরা ঘোর অন্ধকারে আছে। মিথ্যা ভয়ই এদের একমাত্র সম্বল। তবে এ মৃত নয়, মূর্ছা গেছে

দেবদূত বললেন,—ওদের এই ভয় ও অজ্ঞতাই আমাদের রক্ষাকবচ, ঋষি। ওদের ভয় ও অজ্ঞতাকে শুধু কাজে লাগানো নয়, তাকে যত বাড়িয়ে তোলা যাবে, দেবকার্য সাধন ও পুরোহিত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার পথও ততই প্রসারিত হবে। কি বলেন?—বলে তিনি বেশ পরিতৃপ্ত ভাবে হাসলেন।

গর্গের সর্বাঙ্গ শিহরিত হল সেই খসখসে হাসির স্পর্শে। মনে হল, আশপাশের গাছের পাতাও যেন শর্‌শর করে উঠল সে হাসি শুনে। গর্গ নীরব

থাকলেন। এই দেবদূত স্পষ্টবাক। এঁর কথায় লুকোছাপা নেই। কিন্তু কে ইনি? ইনিই কি শূরসেনে প্রেরিত বিষ্ণু প্রহরীদের প্রধান, বিষ্ণুব্রত?

দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে গর্গ প্রশ্ন করলেন—বসুদেবের কাছে শুনেছি, বৃন্দাবনের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মহাত্মা বিষ্ণু যে দেবশিবির স্থাপন করেছেন এই অঞ্চলে, সেই শিবিরাধ্যক্ষ হলেন, মহাত্মা বিষ্ণুব্রত। বিনীত জিজ্ঞাসা, আপনিই কি মহাত্মা···?

—না, না! মহাত্মা বিষ্ণুব্রতের আদেশে আমি আপনাকে শিবিরের পথ প্রদর্শন করে নিয়ে যেতে এসেছি। চলুন!

—কিন্তু?

—দ্বিধা কেন, ঋষি?

—অমারা চলে গেলে একাকী এই অরণ্য সীমান্তে দুর্ভাগা শকট চালক মূর্ছিত অবস্থায় দুষ্ট জীবের দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। এর কী ব্যবস্থা হবে?

দেবদূত আগের মতই সেই হৃৎকম্প সৃষ্টিকারী হাসি হেসে বললেন,—ঋষিবর! শুনেছি, জ্ঞানে বুদ্ধিতে আপনি যদুকুলে একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এবং দেবলোক আপনাকে একজন ব্রাহ্মণ নেতা হিসেবে নির্বাচন করেছেন। তা, সামান্য ব্যক্তির জন্য আপনার এই মমতা কি দেবকার্যের প্রতিবন্ধক হবে না? দেবকার্য-সাধনে তুচ্ছ ব্যক্তিদের স্থান কোথায়? আপনাকে হয়ত প্রত্যক্ষ করতে হবে আর্যাবর্তের বুকের ওপর এক মহা শশ্মানভূমি। আপনি কি জানেন না, বিষ্ণু আগেই তাদের মেরে রেখেছেন যাদের মৃত্যুই সঙ্গত। দেবকার্য সাধনে তৎপর ব্যক্তিরাই পুণ্যবান। তাঁরা মহাত্মা বিষ্ণুর দ্বারা রক্ষিত। বসুদেব সামান্য জনের জন্য মনে অকারণ দয়া ও ক্ষমা পোষণ করেন না। তাঁর শিক্ষা উত্তম।

—কিন্তু তিনি রাজপুরুষ!

—এবং আপনিও রাজপুরোহিত। অতএব এই শকট চালককে তার ভাগ্যের হাতেই ছেড়ে দিয়ে আমার সঙ্গে আসুন। মহাত্মা বিষ্ণু যদি তাকে আগেই মেরে রেখে না থাকেন, এ যাত্রা সে বেঁচে যাবে। তবে আমার বিবেচনায় তার মরাই ভালো। কেননা সে আমাদের সংবাদ জেনে গেছে। মূর্খ ব্যক্তি। এ সংবাদ সে প্রচার করে ফেলবে। আর তাতে আমাদের অসুবিধা। দেবকার্যে জ্ঞাতে অজ্ঞাতে যারাই পথের কাঁটা, বিষ্ণুব্রতের

সেবাদাসরা তাদের বেঁচে থাকার কোনো প্রয়োজন গণনা করে না। তাই একে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে যাওয়াও নিরাপদ নয়। এর চিরমুক্তি হওয়াই উচিত।

কথা শেষ করে প্রহরী দেবদূত দু হাতে তালি দিয়ে অন্ধকারে কাদের যেন আহ্বান করলেন। গর্গ দেখলেন, জন চারেক অস্পষ্ট মূর্তি অন্ধকার ভেদ করে এগিয়ে এলো।

প্রহরী আদেশ করলেন,—ঐ ব্যক্তিকে শিবিরে নিয়ে যাও। মহাত্মা বিষ্ণুব্রত যেমন আদেশ করবেন, ওর প্রতি তেমনি ব্যবহার কোরো।—তারপর গর্গের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন,—আসুন ঋষি! আগামী কাল শূন্য গোশকট দেখে নন্দগোপ ভাববেন পথে আপনারা দুজনেই অরণ্যচারী জন্তুর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে ধরাধাম ত্যাগ করেছেন। বলে তিনি হাসতে হাসতে এগিয়ে চললেন চূর্ণ পত্রে শব্দ তুলে। গর্গ অনুসরণ করলেন দেবদূতকে।

জঙ্গলের পায়ে চলা পথ একপাশে ফেলে ঝোপঝাড়ের মধ্যে গর্গ ও দেবদূতেরা এগিয়ে যান। সামনে পেছনে দেবদূতদের হাতবাতির আলো। এই আলো দেখে জন্তু জানোয়ার কাছে আসে না। তাছাড়া তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে দুটি নেকড়ে বাঘের মতো কুকুর। তাদের দুজোড়া চোখও জ্বলছে। গর্গ কুকুর দুটিকে দেখে বুঝলেন, এরা সেই ভয়ঙ্কর অপার্থিব সারমেয় নয়। সে জাতের কুকুর, গর্গ শুনেছেন, নিত্যহিমা পার্বত্য প্রদেশের নিচে নামতে পারে না। সমতলের ঠাণ্ডাও তাদের পক্ষে যথেষ্ট নয়। পায়ে চলা পথে অরণ্য সম্পদ সংগ্রহকারীরা আসা যাওয়া করে বলেই হয়ত দেবতারা সাবধানে এপথ ত্যাগ করে আরও গভীর অরণ্যে শিবির স্থাপন করেছেন। গুপ্তবিদ্যায় তাঁদের তুলনা নেই। হয়ত হতভাগ্য শকট চালককে সেইজন্য দেবশিবিরে প্রাণ হারাতে হবে। গর্গের মন বিষণ্ণ হয়। তিনি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন।

দেবদূত বলেন—এই দুর্ভেদ্য জঙ্গলে আমাদের শিবিরের সংবাদ কংসচরেরা কোনদিনই পাবে না। তাছাড়া····আবার সেই ব্যঙ্গাত্মক হাসি হেসে বলেন,—তাছাড়া আপনাদের রাজপুরুষরা নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণে এমনিই অন্ধ যে দেশের নিরাপত্তা নিয়েও তাঁরা বিশেষ মাথা ঘামান না। আমার অভিজ্ঞতা বলে, আর্যাবর্তে রাজাদের চরবাহিনীও যথার্থ সৎ ও নিষ্ঠাবান নয়। উৎকোচের দ্বারা সহজেই এদের বশীভূত করা যায়।

একথায় গর্গ মনে মনে লজ্জা পান। কথাগুলি নির্মম সত্য। এ অভিযোগ আর্যাবর্তের রাজপুরুষ ও অভিজাত শ্রেণীর প্রতিও প্রয়োগ করা

যায়। বলতে কি, বসুদেব প্রমুখ এবং গর্গও তো একই দোষে দুষ্ট। তাঁরাও কি দেবতাদের প্রদত্ত প্রলোভনে বশীভূত হননি? বসুদেব স্বপ্ন দেখছেন, কংসকে উৎখাত করে ক্ষমতা করায়ত্ত করার। গর্গ মোহাচ্ছন্ন হয়েছেন, জ্যোতির্বিদ্যা লাভ করার প্রতিশ্রুতিতে। তাছাড়া শূরসেনের পুরোহিত সম্প্রদায়ের[৩] নেতৃত্ব তাঁর ওপরেই অর্পিত হয়েছে। এই নেতৃত্বের প্রলোভনও কম নয়। দেবতারা রাজশক্তির ওপরে দেবকার্যে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিযুক্ত পুরোহিতদের প্রতিষ্ঠিত করছেন ও করবেন। দেবতাদের ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার অর্থই হবে পুরোহিত শাসিত একসূত্রে গ্রথিত ভারতবর্ষ।

দেবতাদের তাঁবু-শিবির বড় বড় গাছের আচ্ছাদন মাথায় নিয়ে আত্মগুপ্ত। তাদের ঘোর সবুজ রঙ হারিয়ে গেছে হরিতাভ বৃক্ষারণ্যের গর্ভে। তাঁবুর কাছাকাছি আসতে দেব-প্রহরী ও কুকুর প্রহরীর সম্মুখীন হতে হল প্রথমেই। এদের বাধা অতিক্রম করে তাঁবুদ্বারে পৌছানোর উপায় নেই। গর্গের পথপ্রদর্শককে দেখে সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দিল অপর প্রহরীরা। গর্গকে আনা হল সুন্দর একটি তাঁবুর মধ্যে। তাঁবুর অভ্যন্তরস্থ চাদর বিভিন্ন নক্সায় সজ্জিত। রয়েছে সেখানে শয্যা ও আসন। ছোট চৌকিতে ফল ও সোমরস।

গর্গ যুক্তকরে অভিবাদন জানালেন শিবিরাধ্যক্ষ বিষ্ণুব্রতকে। ঈষৎ নীলাভ গাত্রবর্ণ। প্রায় গোলাকার রোমহীন মুখাবয়ব। অনায়ত চক্ষুর্দ্বয় আঁখিপক্ষহীন বললেই হয় এবং দেহ খর্বাকৃতি হলেও বেশ বলিষ্ঠ।

বিষ্ণুব্রতও নমস্কার বিনিময় করে বললেন,—নমস্তে! সুস্বাগতম্ ঋষি গর্গ![৪]

জনৈক ব্রতচারী দেবতা দুই পাত্রে পানীয় পরিবেশন করলে গর্গ পানীয় গ্রহণে বিনীত অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন। প্রত্যুত্তরে মৃদু হেসে বিষ্ণুব্রত জানালেন যে, প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় গর্গকে বেশ কাহিল দেখাচ্ছে, এখনি তাঁকে আরও হিমশীতল স্বর্গের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিতে হবে। সুতরাং পানীয় এসময় তাঁর তেজ অক্ষুন্ন রাখতে সহায়তা করবে। দেবপ্রিয় সোমরস তিনি নির্দ্বিধায় পান করুন।

দেব-প্রহরীর মতই বিষ্ণুব্রতের কণ্ঠস্বরও খসখসে তবে নিষ্ঠুর ও ব্যঙ্গাত্মক নয়। বিষ্ণুব্রতের কণ্ঠস্বরে গর্গের প্রতি সমীহের ভাব প্রকাশিত হচ্ছে। তিনি গর্গের মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন।

—আমার প্রতি কি মহাত্মা বিষ্ণুর কোনো আজ্ঞা প্রেরিত হয়েছে, মহাত্মা বিষ্ণুব্রত?

—হ্যাঁ ঋষি ! মহাত্মা বিষ্ণুর আদেশ, আপনাকে এখনই বদরিকাশ্রমে যেতে হবে। মথুরার সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আগামীকাল ব্রাহ্ম মুহূর্তে মেরু শৃঙ্গে ব্রহ্মার সভা বসবে। আপনি শূরসেনের বিষ্ণুব্রতীগণের প্রতিনিধিত্ব করবেন সেখানে। আপনি নিশ্চয় শুনেছেন, বসুদেব, কৃষ্ণ ও বলরামের নিরাপত্তার জন্য নন্দজীর গোপসম্প্রদায়কে মথুরার নিকটবর্তী ব্রজপুর থেকে বৃন্দাবনে সরে যেতে বলা হবে। সেজন্য প্রস্তুতি চলছে। আমাদের এই শিবির স্থাপনারও অন্যতম উদ্দেশ্য বৃন্দাবনের রক্ষণাবেক্ষণ। বৃন্দাবন হবে বিষ্ণুরক্ষিত অঞ্চল। সভার আলোচ্যের মধ্যে আশাকরি এই বিষয়টিও থাকবে।

এই সময় তাঁবুতে এসে প্রবেশ করলেন সেই প্রহরী যিনি গর্গকে পথ দেখিয়ে এনেছেন। প্রহরী গর্গের শকট চালক সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য নিবেদন করে মন্তব্য করলেন যে, এমন একটি জীবন্ত বাক্‌শক্তি সম্পন্ন প্রাণী, যে ঘটনাচক্রে আজ একজন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী, তাকে পৃথিবীতে এর পরও বিচরণ করতে দেওয়া উচিত হবে না।

সঙ্গে সঙ্গে গর্গ করজোড়ে আবেদন করলেন—মহান বিষ্ণুব্রত, আমি এই অবোধ শকট চালকের প্রাণভিক্ষা চাই।

গম্ভীর চিন্তিত মুখে বিষ্ণুব্রত বললেন—আপনার প্রার্থনা আমাকে বড়ই বিব্রত করছে, ঋষি। আমরা মূর্খ প্রত্যক্ষদর্শীদের চিরমুক্তিরই নির্দেশ দিই। এছাড়া নান্যোপায়। আমাদের উদ্দেশ্যের প্রতিবন্ধকতা এরা না বুঝেই করবে। আপনি নিশ্চয় কোনো সঙ্কটের মধ্যে আমাদের নিক্ষেপ করতে চান না। ঋষি, দেবকার্যে প্রাণবলি হলে সে পুণ্যাত্মার অক্ষয় স্বর্গলাভ সুনিশ্চিত।

গর্গ মনে মনে বিষণ্ণভাবে হাসলেন। একথা তাঁদেরও প্রচার করতে বলা হয়। কিন্তু মৃত ব্যক্তি স্বর্গলাভ করবে কি উপায়ে। এই তো তিনি আজই সশরীরে স্বর্গে চলেছেন। তবে, মৃতের স্বর্গলোক কোথায় ?

গর্গ প্রশ্ন করলেন,—মহাত্মা ! আমি সশরীরেই স্বর্গে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। ঐ দুর্ভাগা মৃত অবস্থায় তবে কোন্ স্বর্গে যাবে ?

বিষ্ণুব্রতের মুখাবয়ব কঠিন ও বিরক্ত হল। দেবস্থানে বিতর্ক অপরাধ। কিন্তু ঋষি গর্গ এখন দেবতাদের সহায়ক। তিনি স্বয়ং বিষ্ণুর দ্বারা নির্বাচিত। তাঁকে সেই অপরাধের জন্য শাস্তি দেওয়ার অধিকার অধস্তন দেবতা বিষ্ণুব্রতর নেই।

মুখের ভাব তখনই যথাসাধ্য নরম করে বিষ্ণুব্রত বললেন,—মহাত্মা নচিকেতা ধর্মকে (যম) মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব ও গতি সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন। মহাত্মা ধর্ম উত্তর দেন, দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং অর্থাৎ দেবতারাও এ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন। সুতরাং ঋষি গর্গ, এ প্রশ্নের উত্তর আমার মত নগণ্য দেবতার জ্ঞানবুদ্ধিমত ব্যাখ্যাত হওয়ার কথা নয়। আপনি বরং এ প্রশ্ন স্বর্গে গিয়ে মহাত্মা বিষ্ণুকেই করবেন।

এই কথা বলেই বিষ্ণুব্রত অকস্মাৎ অত্যন্ত ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ালেন। অর্থাৎ তিনি আর প্রশ্নোত্তরে রাজি নন। তাঁর সিদ্ধান্ত তিনি নিয়ে নিয়েছেন।

বললেন,—আর দেরি করা অনুচিত। মনোগতি সম্পন্ন আকাশযান, যেটি আমার ব্যবহার্য, প্রস্তুত। আমার সেই উত্তম যানের চালক অপেক্ষায় আছে। আপনি অনুগ্রহ করে তার অনুগমন করুন। রাতের আঁধারে এই শব্দহীন যানকে শূরসেনের ও অন্যান্য রাজ্যের আকাশ সীমা অতিক্রম করে দেবরাজ্যে পৌছাতে হবে। আর বিলম্ব করবেন না!

গর্গ বুঝলেন, শকট চালকের সঙ্গে দ্বিতীয়বার তাঁর সাক্ষাতের আর কোনো সম্ভাবনা নেই! পুনরায় বিতর্কেরও সুযোগ নেই। তিনি বিমর্ষ মনে বিষ্ণুব্রতের সঙ্গে তাঁবুর বাইরে এসে দাঁড়ালেন। আকাশ উজ্জ্বল নক্ষত্ররাজিতে ঝকমক করছে। ঐ পথ ধরে তাঁকে যেতে হবে দেবভূমি মেরুলোকে। ইতিপূর্বে আর একবার তিনি সেই অপূর্ব নিসর্গশোভাপূর্ণ দেবায়তনে গেছেন। অদ্ভুত এক উড়ন্ত পক্ষীর পেটে বসে এই যাত্রা। রীতিমত ভয় করে। কেননা পক্ষীসদৃশ হলেও সেই উড়ন্ত পক্ষী ধাতব অবয়বসম্পন্ন এবং তার অভ্যন্তরে জাজ্বল্যমান যন্ত্রাদি ও সর্পাকার রজ্জুসদৃশ্য বস্তু দেখা যায়। চালক তারই সাহায্যে ধাতব পক্ষীটিকে খুশিমত চালনা করেন।

আঁধার কালো রাত্রে একলা পাখির মত ধাতব যানটি কঙ্খলের আকাশ মার্গ অতিক্রম করছিল। নিচের পৃথিবী অন্ধকারে ডুবে আছে, যদিও আকাশ নির্মেঘ। মাঝে মধ্যে চালক দেবতা মহর্ষি গর্গকে শোনাচ্ছিলেন অপস্রয়মাণ সমতলের কথা।

কিছুক্ষণ ওড়ার পর চালক বললেন,—আমরা এখন কঙ্খলের ওপরে। নিচে বয়ে চলেছে অলকা-মন্দাকিনীর পবিত্র শীতল বারিধিপুষ্ট পুণ্যতোয়া

জাহ্নবী গঙ্গা। ঐ দক্ষপুরীর কয়েকটি স্তম্ভ দেখা যাচ্ছে অস্পষ্ট ছায়ামূর্তির মত। ভাগীরথী গঙ্গা বহে চলেছেন কাশীধামের দিকে।

গর্গ যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে প্রশ্ন করেন,—শুনেছি, কাশীধাম দেবদেব শঙ্করের সৃষ্টি। একদা ঐ প্রদেশ ছিল তাঁরই রাজধানী এবং দক্ষ প্রজাপতি সেখানে তাঁর তপস্যা করে অভিশাপ মুক্ত হন।

চালক মাথা হেলিয়ে বললেন,—আমরাও শুনেছি। শঙ্করের প্রিয়স্থান কাশীধামে অগস্ত্য মুনির সন্ধানে দেব-প্রধানরা গিয়েছিলেন একবার সদলবলে। ইন্দ্র, অগ্নি, যম, বরুণ, বায়ু, কুবের প্রমুখ কাশীতে উপস্থিত হয়ে চমৎকৃত হন। শঙ্করের আমন্ত্রণে ব্রহ্মাও কাশীধামে যান। ব্রহ্মা বলেন, "কাশী স্বয়ং বিশ্বেশ-নির্মিতিঃ"। অগস্ত্য লোপামুদ্রাকে বলেছেন, জগতে কাশীর রচনা পারিপাট্য অতুলনীয় অথবা অন্যত্র তা দৃষ্ট হয় না। কারণ, কাশী জগদ্স্রষ্টা বিধাতার সৃষ্টি নয়। অর্থাৎ কাশী যে প্রভু শঙ্করের দ্বারাই সৃষ্টি হয়েছে, বিধাতার সৃষ্টির সঙ্গে তার তুলনা করে অগস্ত্য সেটাই বোঝাতে চেয়েছেন।[৫]

কৌতূহলী গর্গ এই সুযোগে আরও কিছু জেনে নেওয়ার চেষ্টা করে বলেন, —এই কণ্ড্খলের অধিকার নিয়েই তো ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শঙ্করের তুমুল সংঘর্ষ হয়। তাতেই কণ্ড্খল বা দক্ষের রাজত্ব হরিহর স্থান হিসেবে বিভক্ত হয়ে যায়। ব্রহ্মপুর্বা কণ্ড্খল তাঁরা তিনজনেই ভাগ করে নেন। তাই না?

এ প্রশ্নের সরাসরি জবাব দিতে চালকের অনিচ্ছা তাঁর গম্ভীর কণ্ঠস্বরের মধ্যে ব্যক্ত হল। নিজে দেবজাতীয়, সুতরাং তিনি দেবতাদের বিবাদের প্রসঙ্গ আলোচনায় অনিচ্ছুক। বললেন,—দেবতাদের দখলদারির সংঘর্ষ অধিকাংশই দেবস্তাবক রাজা ও ঋষিদের ক্ষমতা দখলের বিবাদ থেকে উদ্ভূত বলে জানবেন। অনুগামীদের জমির লড়ায়ে দেবতারা প্রায়ই জড়িয়ে পড়েন। তাঁরাও নিজের নিজের অনুগামীদের রক্ষা করেন। না হলে তাঁদেরই বা স্ব স্ব প্রতিষ্ঠা থাকে কেন, বলুন। এসব তাঁদের করতেই হয়। তবে দেবতাদের সামগ্রিক স্বার্থ-রক্ষার প্রশ্নে সকল দেবপ্রধানই ব্রহ্মার বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হন। যেমন, আর্যাবর্তে এক ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে তাঁরা সবাই হাত মিলিয়েছেন। কংস, জরাসন্ধ, ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্মক, নরক কেউ তাঁদের রোষবহ্নির জ্বালা থেকে অব্যাহতি পাবেন না, এ আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি। প্রত্যেক অঞ্চলের সুরবিরোধী নরপতিগণকে ধ্বংস করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এক এক অপরাজেয় দেব-প্রধান আশাকরি, এ সংবাদ আপনিও জানেন।

—যতদূর গতবারের ব্রহ্মার সভায় শুনেছি, তাতে মনে হয়, শূরসেন অঞ্চলের দায়িত্ব নিয়েছেন দেবদেব বিষ্ণু। কুরুপাঞ্চালকে দেবানুগত করার দায়িত্ব অর্পিত আছে শঙ্করের ওপর।

—হ্যাঁ, দেবরাজ ইন্দ্র তাঁদের সহযোগী। বিষ্ণু কৌশলী, কিন্তু দেবসেনাধ্যক্ষ শঙ্কর সম্মুখ সমরাঙ্গনে রুদ্রপ্রতাপশালী এবং নির্মম। আর্যাবর্তে ভারতযুদ্ধ যদি একান্তই অনিবার্য হয়, আমার বিশ্বাস, শঙ্করের ওপরই পুরোপুরি তখন দেবসৈনাপত্য অর্পিত হবে। অবশ্য কূট রাজনীতিতে বিষ্ণুর সমকক্ষ কেউ নেই। ব্রহ্মার পরিকল্পনা রূপায়ণে সবরকম কূটকর্মের নায়ক তিনিই থাকবেন। কিন্তু ঋষি, আমরা এখন নিষধ পর্বতের ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছি। অল্পক্ষণের মধ্যেই গন্ধমাদন! সুতরাং আলোচনা থাক।

গর্গ বুঝলেন, নিজের পাণ্ডিত্য জাহির করার মোহে সামান্য চালক পদাধিকারী দেবতাটি দেবরাজনীতির অনেক তথ্যই আবেগের বসে উদ্‌ঘাটিত করে বিচলিত বোধ করছেন। তাঁর কাছ থেকে অধিকতর কোনো সংবাদ আর আহরণ করা সম্ভব নয়, অথবা তিনিও তা জানেন না। এখন প্রসঙ্গান্তরে প্রবেশ করাই ভালো।

চালক আসনের পাশেই গর্গ বসে আছেন। এই যানটিতে চালকের পাশে মাত্র দুজন যাত্রী বসতে পারেন। পশ্চাদ্‌ভাগ সম্ভবত মালপত্র পরিবহণের কাজে লাগে। চালকের সামনে ও দু পাশে এবং মাথার ওপর যে স্বচ্ছ আবরণী তার মধ্য দিয়ে আকাশ ও নিম্নাঞ্চল দেখা যায়। যানটি এখন পার্বত্য পথের ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে। নিচের দৃশ্য উঁচু নিচু ছায়া-শরীর নিয়ে আদিগন্ত অন্ধকারের তরঙ্গমালা সৃষ্টি করে নিঃসাড়ে শুয়ে আছে বলে মনে হচ্ছে।

—আমরা কি এখনও নিষধ পর্বতমালার ওপর আছি?—প্রসঙ্গ পাল্টে গর্গ শুধোন।

—না, ঋষি। এখন আমরা উড়ে চলেছি গন্ধমাদনের ওপর। এই মনোরম নিত্যহিমা পার্বত্য অঞ্চল দেবতাদের দ্বারা রক্ষিত। তবে এখনো স্বর্গের দুয়ারে পৌঁছাতে কয়েক পল দেরি আছে। স্বর্গদ্বার থেকে আরও উত্তরভাগ দেবতাদের সংরক্ষিত এলাকা। সেখানে দেবাদেশ ভিন্ন কারও প্রবেশাধিকার নেই, তা তিনি যতবড় মুনি ঋষিই হোন না কেন।... কথায় ছেদ টেনে নিচে ইঙ্গিত করে চালক বললেন,—আমরা এখন বদ্রিকাশ্রম, বিষ্ণুস্থানের দ্বারদেশে

এসেছি। নিচে গন্ধমাদনভুক্ত শতশৃঙ্গ পৰ্বত। এই পর্বতের ক্রোড়ভূমি বিধৌত করে অলকানন্দার প্রবল নিম্নাভিমুখী স্রোতধারা মন্দাকিনীর সঙ্গে সঙ্গত হতে চলেছে।

গর্গ নিচের দৃশ্য দেখার চেষ্টা করলেন কিন্তু কালো রোমশ প্রকাণ্ডাকার হস্তী পৃষ্ঠের মত পর্বতশ্রেণী ব্যতীত আর কিছুই তাঁর নজরে পড়ল না। পাহাড়ের গায়ে কোথাও কোথাও সরু সাদা ফিতের মত হিমায়িত জলকণা তুষার চাদরের সৃষ্টি করেছে। অন্ধকারে সেই ক্ষীণ রেখাই একমাত্র স্পষ্ট। সম্ভবত অলকানন্দার বুকেও স্থানে স্থানে বরফ জমে আছে।

গর্গ বললেন,—শুনেছি, শতশৃঙ্গ পর্বতে বর্তমানে কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের ভ্রাতা পাণ্ডু তাঁর দুই মহিষীকে নিয়ে বসবাস করছেন। সেখানেই দেব-ঔরসে কুন্তী ও মাদ্রীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেছেন পঞ্চপাণ্ডব ?

—ঠিকই শুনেছেন মহাত্মা ধর্মের ঔরসে যুধিষ্ঠির, বায়ুর ঔরসে ভীমসেন, দেবরাজ ইন্দ্রর ঔরসে অর্জুন কুন্তীগর্ভে এবং দেবতা অশ্বিনীকুমারদের ঔরসে মাদ্রীগর্ভে নকুল ও সহদেব নামক পঞ্চপুত্রের জন্ম হয়েছে। এই দেবপুত্ররাই হবেন কুরুবংশ ধ্বংসের কারণ। কংসের দিন শেষ হয়েছে—কৃষ্ণ ও বলরামের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই। তাঁরাও দেবপুত্র, বিষ্ণুপুত্র। কিন্তু এবার আমরা নামছি, মহর্ষি, আপনি আপনার কটিবন্ধ শক্ত করে বেঁধে নিন। ঐ দেখুন, নরপর্বতের প্রশস্ত অবতরণ ক্ষেত্র যেখানে আরও দু'একটি বিমান লক্ষিত হচ্ছে। আপনার আসনের পেছনে শীতবস্ত্র আছে। আসার সময় মহাত্মা বিষ্ণুব্রত দিয়ে দিয়েছেন। নামার আগে সর্বাঙ্গ শীতবস্ত্রে আবৃত করে নামবেন। এখন নরপর্বতে হিমশীতল ঠাণ্ডা। পার্বত্য ঠাণ্ডা ক্রমে সহনীয়। কিন্তু হঠাৎ সে ঠাণ্ডা অত্যন্ত মারাত্মক।

গর্গ ক্ষিপ্র হাতে চালকের নির্দেশমত শীতবস্ত্রে আপাদমস্তক আচ্ছাদন করতে করতে দেখলেন, এই নরপর্বত এলাকা বিভিন্ন আলোক মালায় সুসজ্জিত। অবতরণ ক্ষেত্রটি দিবালোকের মত উজ্জ্বল এবং সেখানে শরীরের সঙ্গে আঁটো সাঁটো পোষাকে আবৃত দেবতারা ব্যস্তসমস্তভাবে নানা কাজে লিপ্ত আছেন, দু একটি বিমানপোতও দেখা যাচ্ছে। পর্বতের এই অংশ সম্পূর্ণ সমতল।

২

নরপর্বতের এই অঞ্চলটা প্রশস্ত একটি সমতল উপত্যকা। হিমালয়ের বহু স্থানেই বিস্তীর্ণ সমতল ভূভাগ আছে। আছে স্বচ্ছ মিষ্টি জলের হ্রদ। এ সবই প্রকৃতির আপন খেয়ালে সৃষ্ট। কিন্তু উপত্যকা ও প্রকৃতি-সৃষ্ট গিরিসঙ্কটে পৌঁছানোর জন্য পথ তৈরী করে নিতে হয় উচ্চ পর্বতের কোলে কোলে। পাহাড় ফাটিয়ে বানাতে হয় বাসযোগ্য ও চাষযোগ্য ভূমি। আর চাষবাসের পক্ষে হিমালয় আদর্শ স্থান। এই অভ্রভেদী পর্বতশ্রেণী কেবলমাত্র প্রস্তরাকীর্ণ নয়। সরস মাটির ভাগ প্রচুর। আকাশযান থেকে নেমে চমৎকৃত গর্গ স্বর্গের শোভা দেখেন স্তম্ভিত হয়ে। মনে হয়, গগনচুম্বী পর্বতশীর্ষগুলি দিগন্তের কোলে মাথা ঠেকিয়ে প্রত্যূষকালীন প্রণতি জানাচ্ছে উদীয়মান অরুণচ্ছটাকে। পূবের আকাশে আগুন লেগেছে সেই অরুণরাগে। অন্যদিকে পশ্চিমের ঢালে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। একই জায়গায় দাঁড়িয়ে দিনমণির আগমন ও নিশারানীর বিদায়দৃশ্য একমাত্র এই পার্বত্য স্বর্গলোকেই দেখা যায়। সমস্ত অন্তর থেকে তখন উৎসারিত হয় সেই দুর্লভ দৃশ্যের মহান স্রষ্টার প্রতি সকৃতজ্ঞ প্রণতিগীতি।

মোহাচ্ছন্নের মত গর্গ সান্দ্র কণ্ঠে গেয়ে ওঠেন :

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভোঃ মধুরং মধুরং বদনং মধুরং
মধুগন্ধী মধুস্মিতম্ এতদহো মধুরং মধুরং মধুরং মধুরং।

দেবযান চালক মোহাবিষ্ট ঋষি গর্গের দিকে ফিরে তাকান। তাঁর মনেও শোভাময়ী প্রকৃতির মধুময় স্পর্শের ছোঁয়া লাগে হয়ত। বলেন,—চমৎকার! সবই মধুময়। ব্রহ্মের শরীর থেকে সেই মধু সহস্র ধারায় ক্ষরিত হয়ে পড়ছে। মধু ক্ষরতি তদ্‌ব্রহ্ম! তাই না, ঋষি?

তন্ময়চিত্ত গর্গ থমকে দাঁড়ান। দূরে নীলকণ্ঠের তুষারশুভ্র কিরীট রুপোর মতো ঝিকিয়ে উঠেছে এক পশলা কুয়াসা ক্ষণিকের জন্য অপসারিত হতেই, আত্মস্থ গর্গ একটি ঋক্ আবৃত্তি করেন উদাত্ত গলায় :

মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধ্বীর্ণ সন্ত্বোষধীঃ।

বলেন,—এ এক অপূর্ব স্থান! এই স্বর্গলোকে সমীরণ মধু বহন করছে। সিন্ধুসন্ধানী কলোস্বিনী স্বর্ণদী অলকানন্দা বিতরণ করছেন মধু। আহা, ঋষি তাই বলেছেন, বনস্পতি ও ওষধিসকল মধুময় হোক্! কিন্তু সুউচ্চ বনস্পতি অথবা মৃগপক্ষী কিছুই তো নজরে পড়ছে না।

দেবযান চালক উত্তর দেন,—আরও নিম্ন পার্বত্যপ্রদেশে আপনি তাদের দেখতে পাবেন, উচ্চলোকের শোভা অন্যরকম। এই বদরিকাশ্রম দেবগন্ধর্বগণের ক্রীড়াভূমি, 'আক্রীড়ভূমিং দেবানাং গন্ধর্বাপ্সরসাং তথা'। এটি নিত্য হিম-শীতল, গাছপালা মৃগপক্ষী এখানে দুর্লভ বললেই হয়। এখানে বর্ষাকালে পথ দুর্গম হয়ে ওঠে। অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং বিশ্বকর্মার কর্মীরা তাই সদাই ব্যস্ত থাকেন পার্বত্য পথ নির্মাণে। সুপটু গন্ধর্বগণও তাঁদের সাহায্য করেন।[১] ঋষিরা এজন্যই এই প্রদেশকে বলেছেন :

সন্তি নিত্যহিমাদেশা নির্বিক্ষ মৃগপক্ষিণঃ।
সন্তি কেচিন্মহাবর্ষা দুর্গাঃ কেচিদ্ বাসদাঃ ॥[২]

গর্গ মুখ ফিরিয়ে জানতে চান,—দুর্গ কেন?

চালক বলেন,—দুর্গাঃ বলতে হয়ত তাঁরা দুর্গমতার কথা বলেছেন, অথবা এখানে দেবতাদের যে সুরম্য হর্মগুলি আছে, আছে মহাত্মা বিষ্ণুর প্রাসাদ, দুর্গম সেই দেবায়তনগুলিকেও দুর্গাঃ বলা হয়ে থাকলে ঋষির কবিত্বই এই শব্দ ঝঙ্কারে বিকশিত হয়েছে বলা যায়।

বিস্মিত গর্গ চালকের প্রতি সশ্রদ্ধ দৃষ্টিপাত করে বলেন,—আপনি তো নিজেও কবি ও পণ্ডিত। দেবতারা কি সকলেই সুপণ্ডিত?

চালক ঈষৎ হাস্য করে বলেন,—দেববাক্যই কি ঋষিবাক্য নয়? তাকে কি আপনারা শ্রুতি বলেন না। এই সুললিত সংস্কৃত কি দেবভাষা নয়? কে শেখালো মর্ত্যের ব্রাহ্মণকে এই ভাষা, কে দিল তার মনে গীতছন্দের মধ্যে বাক্য যোজনার শিক্ষা?

গর্গ সলজ্জভাবে বললেন,—আমার অসতর্ক উক্তি - নিজগুণে ক্ষমা করুন!

পর্বত শিখরগুলিতে ক্রমে ক্রমে সূর্যালোক পড়ে এক একটি চুড়ো আঁধার ফুঁড়ে জেগে উঠেছে। গর্গ দেখেন, সেই অপূর্ব শোভা। মনে হয়, সূর্যও বোধহয় পূর্ব দিগন্তের কোনো পর্বতে ধীরে ধীরে আরোহণ করছেন এবং দেবতাদের মতো হাতবাতির আলোক নিপাত করছেন বিশিষ্ট উচ্চশির পর্বতের রৌপ্য-

মুকুটগুলির ওপর। তিনি গুনগুন করে সূর্যস্তব করেন। সেই বিখ্যাত স্তোত্র—জবাকুসুম সঙ্কাশং ···।

নরপর্বতে দেবতারা আবছা মূর্তির মত তাঁদের পাশ দিয়ে হন্‌হন্ করে হেঁটে যাচ্ছেন। কর্মব্যস্ততা শুরু হয়ে গেছে চারদিকে। একে অন্যকে অতিক্রম করার সময় চলমান অবস্থায় কুশল বিনিময় করছেন সেই খসখসে স্বরে, 'জয় বিষ্ণু', 'জয় বিষ্ণু', বাক্যোচ্চারণ করে।

গর্গের সঙ্গী দেবতা বলেন,—আপনার বাঁ পাশের এই পবতটিই উর্বশী পবত। ওপরে দেব-নর্তকী উর্বশীর শিবির। সম্ভবত তিনি এখন প্রত্যুষকালীন প্রসাধনে ব্যস্ত। কেননা ঐ দেখুন, তাঁর কাষ্ঠনির্মিত সুন্দর হর্ম্য থেকে আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত হচ্ছে।[৩]

গর্গ যত দেখেন ততই মোহিত হন। মনে মনে ভাবেন, এই পার্বত্য স্বর্গ এতো মনোরম ও সমৃদ্ধিশালী বলেই সমতলের ভারতবর্ষীয় রাজন্যবর্গ এ রাজ্য অধিকারের জন্য বারবার স্বর্গ আক্রমণ করেছেন। সুরবিরোধী সেই অসুর নৃপতিদের আক্রমণের ভয়ে দেবতারা সব সময়ই সন্ত্রস্ত থাকেন। তাই স্বর্গ-রাজ্যের প্রবেশ পথগুলিতে অতন্দ্র দেবপ্রহরীরা সর্বদা টহল দিয়ে বেড়ান। দেবগণের বিশেষ অনুমতি ছাড়া স্বর্গে প্রবেশের অধিকার লাভ কোনো ভূমিজের ভাগ্যে ঘটে ওঠে না। তাই যাঁরা এই দুর্লভ শোভাময়ী পবিত্র স্থানে আসার সুযোগ পান, তাঁরা পৃথিবীতে পুণ্যবান নামে প্রখ্যাতি অর্জন করেন।

দেবতা বলেন,—ঋষি! আমরা চলেছি অলকানন্দার দিকে। কান পেতে শুনুন সেই স্বর্গীয় অলকাপুরী হিমবাহ-নিঃসৃত অলকানন্দার কলোচ্ছ্বাস।

গর্গ জিজ্ঞাসা করেন—কতদূর এই অলকাপুরী?

—সুমেরু পর্বতে তুষারের জটাজাল থেকে নিঃসৃত হচ্ছেন গঙ্গা ও অলকা-নন্দা। নারায়ণ পর্বত যা সুমেরু পর্বতেরই অংশ, সেখান থেকে লক্ষ্মীবন, আরও এগিয়ে গেলে অলকাপুরী, যার মনোমোহিনী দৃশ্য বর্ণনা করতে দেবতারাও অক্ষম। এই অলকানন্দা স্বর্গলোক থেকে পার্বত্য পথ বেয়ে নেমে গেছেন গন্ধমাদনের বুক দিয়ে নিষধ পর্বতের দিকে। মাঝে তাঁর গঙ্গার সঙ্গে মহাসঙ্গম ঘটেছে এবং নিজের নিজস্ব নামও হারিয়ে গেছে গঙ্গা নামে।[৪] আপনি অলকানন্দায় স্নান পূজা সেরে প্রস্তুত হ'ন। পবিত্র বিষ্ণুবস্ত্র পরিধান করে সভায় যাবেন।

গর্গ বুঝলেন, বিষ্ণুবস্ত্র মানে পীতবরণ বস্ত্র ও আজানুলম্বিত পীত আলখাল্লা। দেবতারা শরীরের সঙ্গে চাপা পীতবস্ত্র পরিধান করে'ছন। এঁরা সকলেই

বিষ্ণুসেবক। এঁদের গলায় থাকে তুলসীর কণ্ঠহার। এ অঞ্চলে বিস্তৃত তুলসী-বন আছে।

সঙ্গী আবার বললেন,—অলকানন্দার কোলেই একটি তপ্ত কুণ্ড আছে। স্নানে দেহের মালিন্য অপসৃত হবে। আরাম পাবেন।

চিন্তিত গর্গ বললেন,—কিন্তু বিষ্ণুব্রত বলেছিলেন, মহাত্মা ব্রহ্মার সভারম্ভ হবে ব্রাহ্ম মুহূর্তে। সেই পবিত্র ক্ষণ তো

সঙ্গী বললেন, -হ্যাঁ, নির্ধারিত সময়ের পরিবর্তন হয়েছে। অবতরণ করা-মাত্র আমাকে জানানো হয়েছে, সভা বিলম্বিত হবে। পূর্বদিক থেকে দেবরাজ ইন্দ্র কৈলাসে যাবেন। সেখানে মহাত্মা শঙ্করকে তাঁর মাতলিচালিত আকাশরথে তুলে নিয়ে তিনি আসবেন। তাঁর আগমন বিলম্বিত হবে, কারণ তাঁকে মর্ত্যবাসী বণিকদের সঙ্গে তাঁর বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে জরুরী সভায় মিলিত হতে হয়েছে।[৫]

কথা বলতে বলতে মসৃণ পথ ধরে গর্গ ও দেবদূত অলকানন্দার ধারে এসে দাঁড়ালেন। পাহাড়ের বুক থেকে প্রকাণ্ড একটি কূর্মাকৃতি প্রস্তরখণ্ডের ওপর তুমুল উচ্ছ্বাসে অলকানন্দা আছড়ে পড়ছে। তার নীল জলধারা এখানে দুগ্ধফেনশুভ্র। পেঁজা তুলোর মত রাশি রাশি ফেনার আবর্ত সৃষ্টি হয়েছে সেই পাথুরে তাওয়ার ওপর। চারদিক গুরু গুরু ধ্বনিতে উচ্চকিত হয়ে উঠেছে। এই অলকাবতরণ ক্ষেত্র থেকে অল্প দূরে চমৎকার ঝুলন্ত কাঠের পুল। পুলের মুখে দুজন দেবপ্রহরী। দেবদূত তাঁদের কাছে এগিয়ে গেলেন। আলাপের পর নারায়ণ পর্বতে প্রবেশের অনুমতি মিলল। সেদিকেই তপ্তকুণ্ডে নামার ঘাট। গর্গ স্নানে নামলেন।

স্নানরত দেবতা ও গন্ধর্বরা এখানে বেদমন্ত্র আবৃত্তি করছেন। অথর্বগণ আবৃত্তি করছেন অথর্ব-বেদের পুরুষসূক্ত: যা বলে, সর্বজগৎ একই পুরুষের মহিমা। যা কিছু ভোগ্যরূপ, সবই সেই একেশ্বর। ইনি দেবতা ও মানুষ সকলেরই ঈশ্বর। [অ/১৯/৬]।[৬]

গর্গ আশ্চর্য হলেন এমন মহামন্ত্র শুনে। দেবতারা ও দেবর্ষিরা যে পরমেশ্বরের বন্দনা করছেন, সমতল ভারতে কোনো ঋষি তার প্রচার করেন না। তাঁরা ঈশ্বরপুত্র এক এক দেবতাকেই সর্বেশ্বররূপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সেই সেই দেবতার অলৌকিক ক্ষমতার কথা প্রচার করে বেড়ান। দেবতাদের রীতি-নীতি এই দেবায়তন হিমালয়ে একরকম, আবার তাঁদের উপদেশ সমতল আর্যাবর্তে অন্যরকম। দেবতাকে ঈশ্বর বানানোর মস্ত চক্রান্ত চলছে মর্ত্যের অবোধ

জনগণের মধ্যে এবং গর্গকেও এই মিথ্যাচারিতার অংশীদার হতে হবে। সেটাই দেবকার্য। যেদিন দেবক বসুদেবের সঙ্গে হাত মেলালেন গর্গ, সেদিনই তিনি দেবতাদের কৌশলী রাজনীতির জালে আবদ্ধ হয়ে পড়লেন। এখন আর সেই জটাজাল ছিন্ন করে বেরিয়ে আসার পথ তাঁর নেই। তাহলে তাঁকেও ধ্বংস হয়ে যেতে হবে।

গর্গ নিঃশব্দেই স্নান সেরে উঠে এলেন। কুণ্ডের একপাশে পোষাক পাল্টানোর জায়গা। সেখানে গর্গকে পীতবস্ত্র দেওয়া হল। এই বস্ত্র পরিধানের অর্থ, গর্গও বিষ্ণুদাসে পরিণত হলেন।

পাকচক্রে গর্গ তাঁর যাদব-মানসিকতা পরিহার করতে বাধ্য হওয়ায় মনে মনে সর্বদাই এক ধরনের আত্মবিরোধ অনুভব করেন। এখন তা যেন আরও কষ্টকর মনে হল। অনুতাপ অন্তরের ওপর চেপে বসতে চাইছে।

হাঁটতে হাঁটতে ঈষৎ ক্ষুব্ধ কণ্ঠে তিনি বললেন,—ঋষি দুর্বাসা কি এই সভায় আসছেন, বিষ্ণুপাদ?

বিষ্ণুদাসদের বিষ্ণুপাদ বলে সম্বোধনের চল আছে, তাই গর্গ তাঁর সঙ্গীকে এই অভিধার দ্বারা সম্বোধন করলেন।

বিষ্ণুপাদ হাসলেন,—জানি ঋষি। দুর্বাসার প্রতি আপনার বিদ্বেষ আছে। বস্তুতপক্ষে আমরা, বিষ্ণুব্রতীরাও দুর্বাসাকে পছন্দ করি না। অত্যন্ত দাম্ভিক ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানব এই রুদ্রসেবক। বিষ্ণু নিজেও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট নন। কিন্তু তিনি দেবদেব শঙ্করের ক্ষমতা ও প্রশ্রয়ে অত্যন্ত উগ্র হয়ে উঠেছেন। তাঁর শিষ্য সংখ্যাও দশ সহস্র। দেবকার্য সাধনে তিনি নির্দয় ও নির্মম।

গর্গ বললেন,—কিন্তু অত্যাচারের দ্বারা বশ্যতা আদায় করা যায় না। সে বন্ধন স্থায়ীও হয় না।

—যথার্থ কথা। বিষ্ণুর শিক্ষাও তাই। তবে প্রয়োজনে তিনিও নির্মম হতে বলেন। দয়া ও মমতা বুকে নিয়ে আপনি যুদ্ধে অগ্রসর হতে পারেন না। আর্যাবর্তের অসুরদের সঙ্গে হিমালয়ের সজ্ঘর্ষ ক্রমেই প্রবলতর হয়ে উঠছে। এটা প্রেম ও ক্ষমার অবস্থা নয়। তাই দুর্বাসাকে এবং তাঁর উন্মত্ত আত্মম্ভরিতাকেও ক্ষমা করা হচ্ছে। তবে দেবতারা কারোরই অতিবৃদ্ধি শেষ পর্যন্ত সহ্য করেন না। একদিন দুর্বাসাকেও হতমান হতেই হবে।

গর্গ বললেন,—আমার একটি শর্ত ছিল…

—জানি। দুর্বাসা যে সভায় উপস্থিত থাকবেন, আপনি তা বর্জন করবেন।

কিন্তু, ঋষি! মনের মধ্যে নিরন্তর দ্বন্দ্ব নিয়ে তো দেবকার্য সাধন সম্ভব নয়। সময়কালে আপনাকেও অত্যন্ত নির্মম হতে হবে। এক ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনে আর্যাবর্তের কর্দমমৃত্তিকা রুধিরাক্ত হবে। তখন আপনি তা সহ্য করতে পারবেন তো?

—প্রয়োজনে এ অবস্থা মানতেই হবে, বিষ্ণুপাদ। যদুবংশও তো সেই শোণিত মহোৎসবের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। আর আমি কি ইতিমধ্যেই দেবস্বার্থের প্রয়োজনে একাধিক শিশু হত্যার সঙ্গে নিজেকে লিপ্ত করে ফেলিনি?

গর্গ একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলে বিষ্ণুপাদের দৃষ্টি বিস্মিত ও কঠিন হয়ে উঠল, তবে তখনই নিজের মনোভাব গোপন করে তিনি বললেন,—শিশুহত্যা বলতে আপনি নিশ্চয় কৃষ্ণজন্ম সম্পর্কে মহাত্মা বিষ্ণুর কৌশলের কথা বলছেন। কিন্তু আপনি কি জানেন, দেবকী গর্ভজাত অপর ছটি শিশু আসলে বসুদেব ও দেবকীর পুত্রই নয়? আর সেজন্যই তাঁরা অবিচলিতভাবে একটির পর একটি শিশুকে কংসের হাতে তুলে দিয়েছেন। বাস্তবিক, একমাত্র বিষ্ণুই জগতে এমন এক অপূর্ব কূটনৈতিক খেলা খেলে সফল হয়েছেন, তাঁর কার্যাবলী অত্যন্ত সূক্ষ্ম!

গর্গ সবিস্ময়ে পথের মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়েন। তাঁর দুই চোখ বিস্ফারিত।

বলেন,—ঘটনাটি শোনার জন্য অত্যন্ত কৌতূহল হচ্ছে, বিষ্ণুপাদ!

বিষ্ণুপাদ এগুতে থাকেন। বলেন,—চলুন, আগে প্রাতঃকালীন জলযোগ সেরে নিই আমার তাঁবুতে। এসব একান্ত গোপনীয় গূঢ় ধর্ম। মানবকুলে একথা জানেন একমাত্র বসুদেব ও দেবকী। আমি জানিনা, আপনাকে গূঢ়তত্ত্ব জানানো উচিত হবে কি না। এ বিষয়ে প্রথমে আমি মহাত্মা বিষ্ণুর সঙ্গে আলাপ করে তারপর আপনাকে জানাবো।

অধীর গর্গ বলেন,—কিন্তু ভেবে দেখুন, দেবকার্যে আমার নির্দ্বন্দ্ব হৃদয়ে যোগদান করাই কি উচিত নয়? আমি লোকচক্ষে যদুকুল-পুরোহিত, কিন্তু ঘটনাচক্রে বসুদেবের নেতৃত্বাধীন কংসাবিরোধীদের পৌরোহিত্যে আজ নিযুক্ত। অর্থাৎ সমগ্র যদুকুলের একটি ভগ্নাংশমাত্রকেই আজ আমি মিত্রপক্ষীয় বলে গ্রহণ করেছি। কিন্তু আমার কাছে যাদবমাত্রেই স্নেহাস্পদ হওয়ার কথা। এবং বস্তুত পক্ষে বিষ্ণুর আধিপত্য অস্বীকার করা ছাড়া কংস নিজে কোনো ক্ষমাহীন অপরাধও করেনি। অবমাননা করেনি সে আমাকে অথবা অপর কোনও যাদব বৃদ্ধকে। সে বরং যাদবদের বিবদমান গোষ্ঠীগুলির মধ্যে বিরোধাবসানের চেষ্টাই চালাচ্ছে। আত্মকলহের জন্য যাদবদের যে দুর্নাম

ছড়িয়ে গেছে প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতে এবং যার জন্য তারা দুর্বল জাতিতে পরিণত হচ্ছিল উগ্রসেনের শিথিল শাসন কালে, কংস ক্ষমতায় বসে যাদবদের সেই লজ্জা থেকেও মুক্ত করেছে। তার বিজয়াভিযানে চতুর্দিক চমকিত। বসুদেব থেকেই তার সর্বনাশ, একথা স্বয়ং দেবর্ষি নারদের মাধ্যমে জানার পরেও সে কিন্তু দেবকী ও বসুদেবকে স্বগৃহে পূর্ব মর্যাদায় সঙ্গেই রেখেছে এবং বসুদেব এখনও তার মন্ত্রণা সভায় একজন সম্মানিত সদস্য। কংসের এইসব সদ্‌গুণের কথাও তো আমি ভুলতে পারি না।

বিষ্ণুপাদ ঘাড় ফিরিয়ে গর্গকে দেখেন। সুন্দর সৌম্য মূর্তি। টকটকে ফর্সা রঙ অরুণাভায় আরও রক্তিম দেখাচ্ছে। তুষারশুভ্র ধ্যানমগ্ন পর্বতের মতোই পবিত্র দেখাচ্ছে ঋষিকে। মনে মনে বিষ্ণুপাদ অবাক হয়ে ভাবেন, দেবদেব বিষ্ণু কি গর্গের নির্বাচনে ভুল করেছেন? এঁর অন্তরের টান কংসের প্রতি এখনও প্রগাঢ়। ইনিই কংসবিরোধী চক্রের পুরোহিত হিসেবে নির্বাচিত! বিষ্ণুর মহিমা তিনিই জানেন। কাকে দিয়ে তিনি কোন্ কাজ করাবেন? এসবই বিষ্ণুর গোচরে আনতে হবে।

বিষ্ণুপাদ কেবলমাত্র দেবযানের একজন সাধারণ চালক নন, তিনি বিষ্ণুর এক উত্তম অনুচর। বিষ্ণুপাদের ওপর অগাধ আস্থা দেবতা বিষ্ণুর। এই দেবানুচরটি মর্ত্যজনের সঙ্গে সহজে মিশতে পারেন ও অনেক গোপন সংবাদ সংগ্রহ করেন কৌশলী আলাপের দ্বারা। তাই বিষ্ণুব্রতের দক্ষিণ হস্ত-স্বরূপ বিষ্ণু তাঁকে শূরসেনের গোপন দেব-আস্তানায় প্রেরণ করেছেন।

বিষ্ণুপাদের সঙ্গে গর্গ তাঁর তাঁবুতে আসেন। যেহেতু বিষ্ণুপাদ এখন আর্যাবর্তেই অবস্থান করছেন এজন্য তাঁর বাসস্থান অন্য কাজে লাগানো হয়েছে। তাই এখানে এলে তিনি সামরিক তাঁবুতেই থাকেন। অবশ্য এই তাঁবুও অতি মনোরম। দেবযানের মোটা ও স্বচ্ছ স্ফটিকশুভ্র চাদরে এই তাঁবু নির্মিত। ফলে তাঁবুর অভ্যন্তর ভাগ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বলে মনে হয়। মেঝেয় পুরু পশুচর্ম বিছানো। ভেতরে তাঁবুর প্রাচীর রঙিন পর্দায় আবৃত।

বিষ্ণুপাদ পর্দা সরিয়ে দিতে সেই স্বচ্ছ আবরণ দিয়ে বহির্দৃশ্য দেখা গেল। গর্গ দেখলেন, বাইরে আকাশ আরও ফর্সা হয়েছে এবং কর্মী দেবতারা আরও বেশি সংখ্যায় পথে নেমেছেন। অপূর্ব সুন্দরী কয়েকজন নারীও চলাচল করছেন। এঁরা পর্বতবাসী গন্ধর্ব অথবা দেবনারী তা অবশ্য গর্গ বুঝতে পারলেন না।

দুগ্ধজাত মিষ্টান্নের সঙ্গে বলবর্ধক ও শীতনিবারক সুমিষ্ট ঠাণ্ডা সোমরসও পরিবেশিত হল।

খেতে খেতে বিষ্ণুপাদ বললেন,—আপনি শুনে সুখী হবেন, দুর্বাসা এই সভায় আসছেন না। আর্যাবর্তে তাঁর কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

—কী দায়িত্ব তাঁর ওপর ন্যস্ত হয়েছিল?—গর্গ প্রশ্ন করেন।

—রাজা কুন্তিভোজের পালিতা কন্যা কুন্তীকে শিক্ষা দানের কাজে তাঁকে নিযুক্ত করেন দেবদেব শঙ্কর। তিনি সফল হয়েছেন। কুন্তী আজ আর্যবার্তে দেবকার্য সাধনক্ষম শিক্ষিতগণের মধ্যে অন্যতমা এবং সম্ভবত শ্রেষ্ঠাও। দেবতাদের নিযুক্তিক্রমে ধৃতরাষ্ট্র ভ্রাতা পাণ্ডুর মহিষী নির্বাচিতা হয়েছিলেন তিনি। ব্রহ্মার পরিকল্পনা সার্থক হতে চলেছে কুন্তীদেবীর মাধ্যমে। আসবার সময় পাণ্ডুর বর্তমান সাধনস্থল আপনাকে দেখিয়েছি গন্ধমাদন পর্বতে। তখনই বলেছিলাম, দুর্বাসার শিক্ষায় স্নাত কুন্তীদেবীর আহ্বানে দেবতা ইন্দ্র, ধর্ম, পবন ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় গন্ধমাদনে গিয়ে পাণ্ডুর দুই মহিষী কুন্তী ও মাদ্রীর গর্ভে দেবসন্তান পঞ্চ পাণ্ডবকে উৎপন্ন করেছেন। এঁরাই ধৃতরাষ্ট্র বংশের উৎসাদন করে কুরুরাজ্যে চাতুর্বর্ণাশ্রম ও ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্য স্থাপন করবেন তা আগেই বলেছি। ঋষি, এক ধর্মরাজ্যে আপনারাই হবেন আর্যাবর্তের প্রকৃত শাসক।[৬]

গর্গ শুধোন,—এতোবড় একটা কাজ করার পর দুর্বাসাকে বিশ্রাম নিতে বলা হল কেন?

—না, না, বিশ্রাম নয়। বর্তমানে তিনি তাঁর শিষ্যবাহিনী নিয়ে সাধারণের মনে সন্ত্রাস ও দেবানুগত্য সৃষ্টিতে ব্যাপৃত আছেন। তাছাড়া তাঁর কাজেও একটি গুরুতর ত্রুটি ঘটে গেছে যা দেবতা সূর্য ও ইন্দ্রের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণ হয়ে উঠছে ক্রমশ। কুন্তীর কন্যকাবস্থায় একটি পুত্রের জন্ম হয় সূর্যের ঔরসে। বলা বাহুল্য, দেবতারা এই অবৈধ সন্তানের জন্ম চাননি। কিন্তু এখন অবস্থা আয়ত্তের বাইরে। এই ভ্রান্তি কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। সুতরাং দুর্বাসা অতঃপর সাধারণ স্তরে প্রচারের দায়িত্ব পেয়েছেন মাত্র।[৭]

—কুমারী গর্ভে কানীন পুত্র! সে পুত্র এখন মৃত না জীবিত? ব্যগ্রভাবে জানতে চান গর্গ।

—ক্ষমা করুন ঋষি! কথার স্রোতে এমন তন্ময় ছিলাম যে আমার অধিকার লঙ্ঘন করে যাচ্ছি। আর প্রশ্ন করবেন না। যতটুকু জানাবার, দেবদেব বিষ্ণুই তা আপনাকে জানাবেন।

—কিন্তু বিষ্ণুপাদ, তাঁকে প্রশ্ন করার সাহস কজনের হয়? হয়ত আপনি যতটুকু বললেন, তার বেশি কিছুই আর জানতে পারব না।

বিষ্ণুপাদ হাসলেন,—দেবকার্যে ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্কর ও ইন্দ্র, যতটুকু প্রয়োজন তদতিরিক্ত সংবাদ দেবতাদেরই দেন না। আমরা তা জানার কৌতূহল প্রকাশ না করলেই কাজ দ্রুত এগুবে। আপনি নির্ভর করতে শিখুন ঋষি। যাঁরা আত্মসমর্পিত এবং নির্ভরশীল, দেবপ্রধানরা তাঁদের পুরস্কৃত করেন। দেবতারা তার্কিকের দণ্ড দেন।

গর্গ আর প্রশ্ন করতে সাহস পেলেন না। তিনি জানেন, দেবতাদের কোপ অর্জন করার অর্থ যমের যন্ত্রণাগারে নরক ভোগ।[৮]

৩

প্রাতঃরাশ সেরে বিষ্ণুপাদের সঙ্গে গর্গ আবার ফিরে এলেন অলকানন্দার সেই সাঁকোর ধারে।

গর্গকে দাঁড করিয়ে বিষ্ণুপাদ এগিয়ে গেলেন অলকানন্দা পারাপারের সাঁকোর মুখে প্রহরারত দুই দেবপ্রহরীর কাছে। চারদিকে তখনও কুয়াসা কাটেনি। অদূরবর্তী স্থানও অস্পষ্ট। দূর থেকে প্রহরী দুজনের ছায়া ছায়া অবয়বমাত্র দেখা যায়। বিষ্ণুপাদ তাঁদের সঙ্গে কয়েকটি বাক্যালাপের পর ইঙ্গিতে গর্গকে কাছে ডাকলেন। সাঁকোর ধারে এসে গর্গ দেখলেন, প্রহরী দুজন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁকে পর্যবেক্ষণ করছেন। তাঁদের ভ্রূপক্ষ্মহীন ক্ষুদ্রকায় অক্ষিবলয় দুটির দৃষ্টি অন্তর্ভেদী। নির্লোম মুখ পীত প্রস্তরের মতো ভাবলেশ ও কঠিন। শরীর খর্বাকৃতি। দর্শনে বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়। তাঁরা পথ ছেড়ে দিলেন।

সাঁকো পার হয়ে নারায়ণ পর্বতে পুনঃপ্রবেশ করে দুজনে এগিয়ে চললেন ঘন কুয়াসাজাল ভেদ করে। দূর পর্বত শিখরে মেঘের পর্দা সরে গেছে। দেখা যাচ্ছে, নীলকণ্ঠের ঈষৎ চাপা চুড়ো। চুড়োটি অনেকটা ব্যাঙের আকৃতি। পাশে সাদা চাদরের মতো হিমায়িত ঝর্ণা পর্বতের গায়ে জমে আছে। এই ক্ষণিক দর্শন বেলা বেড়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার মেঘের পর্দায় আবৃত হয়ে যাবে।

পথে কয়েকটি অদ্ভুত দর্শন অস্ত্রধারী পুরুষকে দেখে গর্গ বিষ্ণুপাদকে জিজ্ঞেস করলেন,—এঁরা কারা? ইতিপূর্বে আর একবার যখন মহাত্মা ব্রহ্মার সভায় এসেছিলাম, তখন এমন বিচিত্র পুরুষ তো দেখিনি স্বর্গলোকে?

বিষ্ণুপাদ গর্গকে আকর্ষণ করে আরও কয়েক পদ এগিয়ে গিয়ে বললেন, —সাবধান, ঋষি, এঁরাই মহাত্মা রুদ্র অর্থাৎ শঙ্করের সেনা।—অল্পেই উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। এঁরা শঙ্করের আগমন উপলক্ষে এখানে এসেছেন। তাঁরই রক্ষী বাহিনী।

গর্গ দেখলেন, এ পুরুষবৃন্দ দেবতাদের মতো উজ্জ্বল বর্ণ নন। নাতিদীর্ঘ, কিন্তু কুরূপ নন। এঁরা সম্ভবত অতিমাত্রায় বর্ণপ্রিয়। সবাঙ্গের পোষাকে বিভিন্ন বর্ণের উৎপাত লক্ষ্য করা যায়। মাথায় জটা নেই, তবে ঘন ও ঝাঁকড়া চুল

উষ্ণীষের আকারে শোভা পাচ্ছে। কেশবরণ খয়েরি। এরা চুলেও রঙ মাখে। আর সব চেয়ে লক্ষণীয় হল, এদের কণ্ঠদেশ। প্রত্যেকের কণ্ঠই নীল ও লাল বর্ণে বিচিত্রিত।[১] গর্গ ইতিপূর্বে শঙ্করকে দেখেননি। তিনি মনে মনে ভাবলেন, রুদ্রাধিপতি শঙ্করও কি তাঁর কণ্ঠদেশ নীলবর্ণে রঞ্জিত করেন? তাই কি তাঁর অন্য নাম, নীলকণ্ঠ?

পর্বতের বাঁক ঘুরে ঘুরে বিষ্ণুপাদ গর্গকে নিয়ে একটি সুগন্ধী কাষ্ঠ নির্মিত সুরম্য হর্মের বিশাল কারুকার্যখচিত দ্বারদেশে উপস্থিত হলেন। এটিই দেবদেব মহাত্মা বিষ্ণুর বিখ্যাত প্রাসাদ। আঙিনায় সুন্দরী অপ্সরাদের সঙ্গে কতিপয় গন্ধর্ব বাগান পরিচর্যায় রত। বিষ্ণু-রক্ষীরা পীতবর্ণের পরিচ্ছদে নীল বেগুনি রঙের কটিবন্ধ বেঁধে প্রহরা দিচ্ছেন। তাঁদের কাঁধে ধনু ও পিঠে নিষঙ্গ।

বাহারী পার্বত্য ফুলের ছোট ছোট বাগিচা সপ্রশংস দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করে গর্গ বললেন,—দেবপ্রধানদের মধ্যে বিষ্ণুই বোধহয় সবচেয়ে সৌখীন, তাই নয়?

—দেবরাজ ইন্দ্রও কম যান না। বরং তিনি দেবগণের মধ্যে সবচেয়ে বিলাসী। তাঁর সভায় দেবনর্তকীদের দেহবিভঙ্গ ও বিলসিত মুদ্রাগুলি জিতেন্দ্রিয় মহর্ষিরও তপোবল হরণ করতে পারে।—হাসলেন বিষ্ণুপাদ,—মহাত্মা বিষ্ণু নিরামিষপ্রিয়, তিনি বহুবল্লভা হলেও প্রেমিক। দেবরাজ ইন্দ্র আমিষাশী ও সোমরসের বিশেষ অনুরাগী। নারী প্রধানত তাঁর ভোগ-বিলাসের সামগ্রী ও নর্মসহচরী। কিন্তু আর কথা নয়, ঐ শুনুন, সভায় উদ্বোধন স্তোত্র পাঠ শুরু হয়েছে। আমরাই বোধহয় দেরি করে ফেলেছি।

আর্যাবর্তে এমন বৈভবপূর্ণ সভাগৃহ কদাচিৎ দেখেছেন গর্গ। প্রশস্ত কাষ্ঠ নির্মিত প্রকোষ্ঠ। ঘরে একটি মঞ্চ। ব্যাঘ্রচর্মের দ্বারা তার পাটাতনের মধ্যভাগ সম্পূর্ণভাবে আবৃত। নানা বর্ণের পুষ্পস্তবকে সে মঞ্চ সুসজ্জিত। মঞ্চের নিচের গৃহতল জতুদ্রব্যের সাহায্যে এমন সুচারুরূপে মার্জনা করা হয়েছে যে, পাটাতনের ওপর ছাদের কারুকাজও স্পষ্ট প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। গৃহতলে উপবিষ্ট রয়েছেন বহু দেবতা ও মর্ত্যবাসী ব্রাহ্মণরা। মঞ্চের মধ্যভাগে রক্তপলাশ বরণ দেবমন্ত্রী ব্রহ্মাকে ঘিরে বসেছেন নীল বর্ণ ইন্দ্র ও বিষ্ণু এবং ঈষৎ কপিশ বরণ সঙ্কর। পিছনের সারিতে অন্যান্য দেবনেতা। এঁদের মধ্যে উজ্জ্বল বর্ণবিশিষ্ট সুশ্রী পুরুষ সূর্য, একত্র সংযুক্ত দেহ অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং অদ্ভুত মুখাবয়ব ও আকৃতি বিশিষ্ট কুবেরকে চিনতে পারলেন মহর্ষি গর্গ।[২]

ব্রহ্মার নির্দেশে মঞ্চের পুরোভাগে এসে দাঁড়ালেন ধর্মরাজ যম। বিষ্ণুপাদের সঙ্গে ব্রহ্মার আদেশমাত্র গর্গও মঞ্চে উঠে সাষ্টাঙ্গে প্রণতি জানালেন দেবতাদের।

যথাবিহিত সম্ভাষণের পর জলদগম্ভীর স্বরে যম তাঁর ভাষণে বললেন,—পূজনীয় দেবমন্ত্রী, পূজ্যপাদ বিষ্ণু শঙ্কর ও ইন্দ্রাদি দেবগণ, এবং উপস্থিত আমন্ত্রিত মহাত্মাবৃন্দ! আপনারা ইতিপূর্বে মেরু পর্বতে ব্রহ্মার সভায় উপস্থিত ছিলেন। সেখানে 'ভারাবতরণের' প্রশ্নটি দেবশ্রেষ্ঠদের উপস্থিতিতে বিশেষ ভাবে আলোচিত হয়। পৃথ্বী প্রতিনিধি দেবর্ষিগণও সে সভায় উপস্থিত হয়ে দেবতা ও ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষী পার্থিব নৃপতিদের বিরুদ্ধে আসুরিক আচরণের অভিযোগ করেন। আপনারা আরও অবগত আছেন যে, পূর্বে মৎস্যাধিপতি উপরিচর বসু, কুরুরাজ প্রতীপ পুত্র শান্তনু প্রমুখ ধর্মানুগত রাজপুরুষগণের সঙ্গে হিমালয়বাসী দেবতাদের মৈত্রী ও গভীর সখ্যতা ছিল। তাঁরা যেমন দেবশিবিরের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করেন, দেবতারাও বিনিময়ে তাঁদের দেন প্রভূত শক্তি ও উপঢৌকন। রাজা বসু দেবদত্ত বিমানে আকাশ পথে বিচরণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন বলেই সকলে তাঁকে উপরিচর বসু নামে জানেন। তিনিই এবং প্রয়াত কুরুরাজ বিচিত্রবীর্যের জননী সত্যবতীর পিতারূপে পরবর্তীকালে বিশ্রুতকীর্তি হন। তিনি তাঁর রাজ্যে ইন্দ্রপূজার প্রচলন করেন।[৩] কিন্তু এই সব মহাত্মা রাজপুরুষগণের বংশধররা স্বর্গলোকের ঐশ্বর্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে আজ আর্যাবর্তে সংগঠিত হচ্ছেন। সম্রাট জরাসন্ধ সুরবিরোধী জোট তৈরীতে ব্যস্ত। তিনি অত্যন্ত পরাক্রান্ত এবং দেবতাদের থেকেও বহুগুণে শক্তিশালী। সেই অসুর নৃপতি সুরবিরোধী চক্রান্ত সাধন করার জন্য আর্যাবর্তের অসুর জোটে মিত্রসংখ্যা বাড়িয়ে চলেছেন। যাঁরা তাঁর এই জোটে সমবেত হতে অনিচ্ছুক, এমন রাজাদের নিহত ও বন্দী করছেন। জরাসন্ধের এবং তাঁর শক্তি জোটের প্রভাবে ধরার ভার বাড়ছে।

বিষ্ণু এই সময় খাটো স্বরে বললেন,—ধর্মরাজ! আপনার অবতরণিকা আর একটু সংক্ষিপ্ত করুন, উপস্থিত মহাত্মারা এই পূর্ব ইতিহাস অবগত আছেন।

যম ঘাড় ফিরিয়ে মাথা নিচু করে বিষ্ণুর আদেশ গ্রহণ করলেন এবং আবার বলতে লাগলেন,—অসুরপতি জরাসন্ধের সঙ্গে সম্প্রতি আপন শক্তি সম্মিলিত করতে সম্মত হয়েছেন মথুরাপতি পরাক্রান্ত ভোজকুলবিবর্ধক কংস। আপনারা জানেন, ইতিপূর্বে মথুরা তথা সমগ্র শূরসেনে মহাত্মা বিষ্ণুর প্রভাব ছিল অপ্রতিহত। সকলেই, এমন কি যদুনেতারাও সবাই মহাত্মা বিষ্ণুর পূজায়

সহায়তাই করতেন। ব্রহ্মণরা ছিলেন সেখানে পরম নিশ্চিন্ত এবং দেবানুশাসনের মূলব্যবস্থা চাতুর্বর্ণাশ্রমও প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছিল। কিন্তু গণতন্ত্রী যাদবগণ কালক্রমে স্ব স্ব প্রধান হয়ে উঠলে নিজেদের মধ্যে ক্ষমতাদ্বন্দ্ব প্রবল হয়ে ওঠে। অন্তর্ঘাত ও ভেদবিভেদে এই গণতন্ত্রী শূরসেন যখন দুর্বল হয়ে পড়ছে তখন উগ্রসেনের দুর্বলতার সুযোগে কংস ক্ষমতা দখল করলেন। তিনি জাতীয় ঐক্যের আহ্বান জানালেন এবং আগে জরাসন্ধের অগ্রগতি রোধ করে তাঁর সঙ্গে সঙ্ঘর্ষে লিপ্ত হয়ে তাঁর দুই কন্যাকে বাহুবলে জয় করে নিজেকে যাদব শিরোভূষণরূপে প্রতিষ্ঠিত করলেন। স্বভাবতই তরুণ যাদবগণ যাঁদের রক্ত স্বভাবতই উত্তপ্ত, তাঁরা কংসকে মহানায়করূপে বরণ করলেন।[8] কংস মদমত্ত হয়ে ঘোষণা করলেন, দেবতারা বহিরাগত। তাঁরা মর্ত্যমানবকে শোষণ করে তাঁদের মনোমত শাসন প্রবর্তন করছেন এবং তাঁদের লক্ষ্য তাঁদের অনুগত ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ নেতাদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করে সমগ্র আর্যাবর্তে দেবানুগত এক ধর্মরাজ্য স্থাপন করা। তিনি আহ্বান জানিয়েছেন, দেবতাদের এই চক্রান্ত রুখতে হবে এবং সেজন্য সমস্ত শূরসেনে বন্ধ করতে হবে বিষ্ণুপূজা। তিনি বিষ্ণু সহযোগীদের নির্বিচারে বহিষ্কৃত করছেন। এমতাবস্থায়, আমরা, দেবশিবির চুপ করে বসে থাকতে পারি না। শত্রু প্রবল হওয়ার আগেই তাকে সর্বাংশে নিধন করা শ্রেয়। সুতরাং মহাত্মা বিষ্ণুও কৌশলে পালটা ব্যবস্থা নিয়েছেন। যাদবকুলে বিষ্ণুঅনুগতের সংখ্যা মুষ্টিমেয় হলেও নগণ্য নয়।

গর্গকে তর্জনীদ্বারা নির্দেশ করে যম বললেন,— ইনি মহর্ষি গর্গ, জ্যোতির্বিদ এবং যদুকুলের সর্বজন পূজনীয় পুরোহিত। অতীব আনন্দের কথা, সম্যক বিবেচনা করে মহর্ষি গর্গ শূরসেনে মহাত্মা বিষ্ণুর আধিপত্য স্বীকার করেছেন এবং আজ এই সভায় দেবগণ গোষ্ঠীভুক্ত হওয়ার স্বর্গীয় সম্মান অর্জন করবেন। তাঁকে বরণ করবেন স্বয়ং জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ দেবমন্ত্রী ব্রহ্মা।

যম তাঁর ভাষণ শেষ করলে সভায় গুঞ্জন ও করতালি ধ্বনি শোনা গেল। সভাগৃহে উপবিষ্ট পিছনের সারির দেবতারা অর্ধোত্থিত হয়ে গর্গকে ভালো করে দেখার চেষ্টা করতে লাগলেন এবং গর্গ পুলকিত ও আরক্ত মুখে বারবার উর্ধ্বাঙ্গ অবনত করে সকলকে অভিবাদন জানালেন।

যম তাঁর বক্তব্য শেষ করে বসে পড়লেন। সভাগৃহে বেজে উঠল শঙ্খধ্বনি অপূর্ব সুন্দরী দুই গন্ধর্বকন্যা মঞ্চে উঠলেন। দুজনের হাতে দুটি স্বর্ণথালি। একটিতে একখণ্ড পীত উত্তরীয়, অপরটিতে তুলসী মালিকা ও রক্তচন্দন এবং

জলন্ত ঘীয়ের প্রদীপ। সভাগৃহ স্তব্ধ ও মুগ্ধ হয়ে অপেক্ষায় রইলেন দেবমন্ত্রী ব্রহ্মার গাত্রোত্থানের জন্য।

রক্তপলাশবরণ ব্রহ্মা তাঁর রক্তাভ গৈরিক উত্তরীয় বিন্যস্ত করতে করতে উঠে এলেন মহর্ষি গর্গের সামনে। গর্গ নতজানু হয়ে বসলেন তাঁর পদপ্রান্তে।

বরণ ও আশীবচন আবৃত্তির পর ব্রহ্মা প্রথমে গর্গকে পরিয়ে দিলেন দেবানুগত্যের স্মারকচিহ্নস্বরূপ একটি উপবীত। তারপর কপালে এঁকে দিলেন রক্তচন্দন। সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গীয় বাদ্য ও শঙ্খধ্বনি হল। ব্রহ্মা পরিয়ে দিলেন পীত উত্তরীয় এবং একটি ফুটফুটে গন্ধর্বকন্যা দিলেন গর্গের গলায় তুলসীর মালা।

সমবেত হর্ষপ্রকাশ শেষ হলে ব্রহ্মা বললেন,—মহর্ষি গর্গের পরিচয় আপনারা আগেই পেয়েছেন ধর্মরাজের ভাষণে। তাঁকে আমি শূরসেনে দেবপক্ষের মহর্ষি নিযুক্ত করলাম। এই মহর্ষি ইতিমধ্যেই দেবকার্য সাধন করে স্বর্গে এসেছেন। তিনি দেবকী গর্ভজাত বিষ্ণুপুত্র কৃষ্ণ এবং রোহিণী গর্ভজাত সঙ্কর্ষণের নামকরণ করেছেন গোকুলে গোপরাজ নন্দের আলয়ে। ইনি জ্যোতিষ ও জ্যোতির্বিদ্যায় সুপণ্ডিত এবং আমি অঙ্গীকার করছি, দেবগণের জ্ঞাত জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কিত মহান জ্ঞানভাণ্ডারের দুয়ার গর্গের সামনে আমরা উন্মোচিত করব। দেবপক্ষে যোগদানের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার হিসেবে ইনি এই বরই প্রার্থনা করেছেন।

হর্ষোল্লাসের জন্য কিছুক্ষণ বিরতির পর ব্রহ্মা পুনরায় বললেন,—আর্যাবর্তে সুরবিরোধী নরপতির অভ্যুত্থান ঘটছে। স্বর্গরাজ্য আক্রান্ত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা প্রতিরোধের জন্য আমরাও বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। মেরু পর্বতের সভায় দেবতা ও দেবর্ষিগণের ঔরসে পৃথ্বীনারীদের গর্ভে সন্তান উৎপাদনের যে নির্দেশ আমি প্রদান করি, আনন্দের বিষয় তা চমৎকারভাবে সফল করেছেন বিভিন্ন দেবশ্রেষ্ঠগণ। মহাত্মা বিষ্ণু অপূর্ব অকল্পনীয় উপায়ে কৃষ্ণ বলরামের জন্মপর্ব সমাধা করেছেন। শূরসেনের রাজনৈতিক ঘটনাবর্ত নিয়ন্ত্রণের জন্য সুতরাং দেবসভা বিষ্ণুর ওপর সম্পূর্ণ ক্ষমতা ন্যস্ত করলেন। (হর্ষধ্বনি), মহর্ষি গর্গ বিষ্ণুরই নির্দেশে দেবস্বার্থ সাধন করছেন (করতালি)। আর্যাবর্তের উত্থান পতনে মর্ত্যে ইন্দ্রসম মর্যাদা নিয়ে আমরা প্রতিষ্ঠিত করব বিষ্ণুপুত্র কৃষ্ণকে। যথাকালে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁকে উপেন্দ্র পদে অভিষিক্ত করে বিষ্ণুদ্বেষী কংসের নিধনে নিযুক্ত করবেন। দেবগণের সহায়তায় কৃষ্ণ সফল হবে সর্বতোভাবে, এই বিশ্বাস আমি রাখি।

ব্রহ্মা আসন গ্রহণ করলে উঠে দাঁড়ালেন শঙ্কর। পেশীবহুল উন্নত দেহী।

সুশ্রী মুখশ্রী। মাথায় পিঙ্গল জটাজুট ব্রহ্মতালুর ওপর চুড়ো করে বাঁধা, কণ্ঠদেশ রুদ্রদের মতো নীল বর্ণে রঞ্জিত। গর্গের মনে হল, দেবসভায় এই শঙ্করের মূর্তিই অনন্যসুলভ। মর্ত্যবাসীদের সঙ্গে তাঁর দৈহিক সাদৃশ্য অনেক বেশি। অত্যন্ত বলশালী পৃথ্বীপুরুষের সঙ্গে তাঁকে তফাৎ করার কোনো চিহ্ন লক্ষিত হয় না।[৫]

শঙ্কর যা বললেন তা অধিকাংশই দেবপক্ষের বিক্রমপ্রকাশক। তাঁর বক্তব্যে জানা গেল, দেবতারা সমগ্র আর্যাবর্তে সর্বশেষ এক শক্তি পরীক্ষার জন্য তৈরী হচ্ছেন এবং সেই যুদ্ধে সম্মুখ সমরে নেতৃত্ব করার দায়িত্ব দেবমন্ত্রী তাঁর ওপরেই ন্যস্ত করেছেন। দেবতাদের এই আস্থা শঙ্কর তাঁর সর্বশক্তি প্রয়োগ করে অটুট রাখবেন। তিনি বললেন,—হস্তিনাপুরের সিংহাসনে সুরবিরোধী ধৃতরাষ্ট্র এখন ক্ষমতাসীন। যদিও তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা পাণ্ডুর সিংহাসনে ন্যায্যত কোনো দাবি নেই, দেবতারা স্থির করেছেন, দেবমন্ত্রীর নির্দেশমত আর্যাবর্তের মহর্ষিদের সহায়তায় জনমানসে উত্তম প্রচারের দ্বারা সেই দাবি প্রতিষ্ঠিত করবেন। ধৃতরাষ্ট্র দেব-অভিসন্ধি জানতে পেরে পাণ্ডুকে প্রচুর ধন-দৌলত দিয়ে হস্তিনাপুর থেকে একরকম নির্বাসিত করেছেন।[৬]

শঙ্কর গম্ভীর উচ্চনাদে হাস্য করলেন,—ধৃতরাষ্ট্রের এ কাজে আমাদের অনেক সুবিধেই হয়েছে। পাণ্ডু আশ্রয় নিয়েছেন এখন দেবতাদেরই কাছে। আছেন শতশৃঙ্গ পর্বতে। ফলে আমাদের কাজও সহজ হয়েছে। দেবমন্ত্রী ব্রহ্মার অপূর্ব কৌশলে আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি এক মহান বুদ্ধিমতী নারীকে যিনি পাণ্ডুর প্রথমা মহিষী হয়েছেন দেবতাদেরই নির্দেশে। মহর্ষি গর্গ এখন অসামান্যা নারী কুন্তীর পরিচয় সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। ইনি যদুবংশীয় ভূস্বামী শূরের কন্যা এবং এই সভায় আলোচিত শিশু কৃষ্ণের পার্থিব পিতা বসুদেবের ভগ্নী। এঁর প্রকৃত নাম পৃথা। রাজা শূর তাঁর জ্ঞাতিভ্রাতা নিঃসন্তান কুন্তিভোজকে এই কন্যা দান করেন। সেই থেকে পৃথা পালক পিতার নাম অনুসারে পৃথিবীতে কুন্তী নামে পরিচিত। আমার নিযুক্ত মহর্ষি দুর্বাসা কুন্তীকে দেবস্বার্থ সাধনের অভিপ্রায়ে দীর্ঘকাল অতি উত্তমরূপে শিক্ষা দান করেছেন। আমি দুর্বাসাকে যে মন্ত্রপূতঃ যন্ত্র দান করি সেই যন্ত্রের দ্বারা দেবতাদের আহ্বান জানিয়ে কুন্তী হয়েছেন দেব ঔরসে জাত বীরপুত্রের জননী। পাণ্ডুর অপর মহিষী মদ্রদেশীয়া মাদ্রীর গর্ভে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেছেন নকুল ও সহদেব। শূরসেনে যেমন বিষ্ণুপুত্র কৃষ্ণ, হস্তিনাপুরে তেমনি এই পঞ্চপাণ্ডব হবেন দেবানুশাসন প্রবর্তনের মর্ত্যবাসী সহায়ক শক্তি। এই সভায় আমি

অঙ্গীকার করছি, হস্তিনাপুর থেকে অতি পরাক্রান্ত নৃপতি ধৃতরাষ্ট্রকে উৎখাত করে পাণ্ডুপুত্রদের ক্ষমতাসীন করবার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করব। দেবমন্ত্রী ব্রহ্মা আমার ওপর এই যে গুরু দায়িত্ব অর্পণ করেছেন আমি তা অক্লেশে বহন করব। স্পষ্ট ভাষায় এ কথা ঘোষণা করছি যে, দেবমন্ত্রীর কূট রাজনীতি এবং বিষ্ণু ইন্দ্র ও অন্যান্য পরাক্রান্ত দেবতাদের সহায়তায় আমরা আর্যাবর্ত থেকে দুর্বিনীত দেবদ্বেষী রাজাদের চিরদিনের মত উৎখাত করতে সমর্থ হব।

তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে শঙ্কর বক্তৃতা শেষ করলে উঠে দাঁড়ালেন পীতবসনধারী দেবদেব বিষ্ণু।

অপার্থিব নীল বরণ বিষ্ণুর দিব্য মূর্তি মঞ্চে ও সভাগৃহে উৎসুক আগ্রহের সঞ্চার করল। গর্গের মনে হল, বিষ্ণুর প্রভাবে স্বর্গীয় সভামঞ্চ আরও আলোকিত হয়ে উঠল। গর্গ সশ্রদ্ধ ও মুগ্ধ নেত্রে বিষ্ণুর দিব্য কান্তির প্রতি একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন।

বিষ্ণু কথা বলেন ধীরে। সুস্পষ্ট সংস্কৃতে ছন্দবদ্ধ সেই ভাষণেও সৃষ্টি হয় এক অপার্থিব আবহাওয়া। তিনি সভাসদ্ সবাইকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ জানিয়ে বললেন,—আমার কার্যভারের কথা আপনারা শ্রদ্ধেয় দেবমন্ত্রী ব্রহ্মার ভাষণেই জেনেছেন। মহর্ষি গর্গকে আমরা আমাদের সঙ্গে পেয়ে আজ আনন্দিত। আমি আশা করব, গর্গ তাঁর পূর্ব সংস্কার এবং সুরবিরোধী যদুদের প্রতি স্নেহ পরিত্যাগ করে পবিত্র মনে দেবস্বার্থে অতঃপর সম্পূর্ণভাবে আত্ম বিনিয়োগ করবেন। আমি জানি, দেবক ও বসুদেবের মতো এখনও তাঁর মন নির্দ্বন্দ্ব নয়। কংসের প্রতিও তাঁর স্নেহ অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মতো প্রবাহিত হচ্ছে। পৃথিবীর মানুষের প্রতি তিনি স্নেহপরায়ণ। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, অচিরকাল মধ্যেই তাঁর অন্তঃকরণ ধর্মভাবে আচ্ছন্ন হবে এবং তিনি ধর্মাত্মারূপে শূরসেনে বিষ্ণুপূজা ও চাতুর্বর্ণাশ্রম প্রথা পুনঃ প্রবর্তনের জন্য যত্নবান হবেন। বিনিময়ে আমরা তাঁকে প্রদান করব বিপুল জ্ঞানভাণ্ডার। তিনি পরিচিত হবেন দেবর্ষি ও ব্রহ্মর্ষি রূপে। হবেন বিশ্বভুবনে প্রখ্যাত। আর আর্যাবর্তে এক ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হলে ব্রাহ্মণ পদাশ্রিত সেই ভাবতে অন্যান্য দেবর্ষিদের মত তিনি হবেন মানবকুলে শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণ নেতা। (করতালি)

গর্গ মাথা অবনত করে বসে ছিলেন। বুঝলেন, বিষ্ণুপাদ ইতিমধ্যে তাঁর মনোশ্চাঞ্চল্যের সংবাদ বিষ্ণুর গোচরীভূত করেছেন। বিষ্ণুর বক্তব্যে গর্গের প্রতি যেমন নির্দেশ আছে তেমনিই আছে ভর্ৎসনা ও প্রলোভন।

বিষ্ণু অপাঙ্গে গর্গকে লক্ষ্য করে আবার বললেন,—দেবানুগতদের আমরা প্রভূত শক্তি প্রদান করে পুরস্কৃত করি। পৃথ্বী প্রতিনিধিদের আহ্বান জানিয়ে তাই বলব, আপনারা সব ধর্ম পরিত্যাগ করে দেবতাদেরই শরণাগত হন। তাঁরা আপনাদের সকল শুভাশুভের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন, লোকপালরা রক্ষা করবেন আপনাদের সমস্ত প্রাকৃতিক অপ্রাকৃতিক অমঙ্গল থেকে। দেবস্বার্থে নিবিষ্ট চিত্তে পার্থিব স্নেহবন্ধন ত্যাগ করে কাজ করুন। ফলাফলের চিন্তা আপনাদের নয়, সে চিন্তা দেবতারাই করবেন। ফল আকাঙ্ক্ষা করবেন না, আপনাদের প্রাপ্য ফল প্রদান করব আমরাই।

সভাগৃহ যেন নিস্তব্ধ বনানীর মতো এই সময় দেবগণ পরিবেষ্টিত গর্গের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করতে লাগলেন নিঃশব্দে। বিষ্ণুপাদ গর্গের কানে কানে কিছু বলতে গর্গ প্রথমে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হলেন তারপর জানুপেতে বিষ্ণুর পদযুগল চুম্বন করে বললেন,—এই সভায় আমি বিষ্ণুপদ চুম্বন করে অঙ্গীকার করছি, আজ থেকে দেবস্বার্থ সাধনই হবে আমার একমাত্র চিন্তা এই বিশ্ব সংসারে মহান দেবতাগণেরই অধিকার। তাঁরা এক মহা শুভলগ্নে নক্ষত্রশোভিত নীলাকাশ ভেঙে নেমে এসেছেন বিবদমান আর্যাবর্তকে এক সূত্রে গ্রথিত করার জন্য। বাস্তবিক, তাঁরাই পরমেশ্বরের প্রকৃত প্রতিনিধি, মহাশক্তির অংশভাগ। সুতরাং বিশ্বের সকল বস্তুতে আছে তাঁদেরই অংশ।[৭] অতঃপর জগতে আমি একথাই প্রচার করব, বলব, "ইস্টান ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ। তৈর্দত্তান প্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্ক্তে স্তেন এব সঃ॥" বলব, যজ্ঞের দ্বারা তুষ্ট দেবতারা বর্ষণাদির দ্বারা অন্নপানাদি যে সমস্ত ভোগ্য বস্তু প্রদান করেন, সেসব তাঁদের উদ্দেশ্যে নিবেদন না করে কেবল নিজে ভোগ করলে তাতে চৌর্যবৃত্তিরই অপরাধ হয়।

প্রচণ্ড উল্লাসের মধ্যে বিষ্ণু দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করে গর্গকে আশীর্বাদ করলে মঞ্চে উপবিষ্ট ব্রহ্মাসহ অন্যান্য দেবতারাও দুহাত তুলে আশীর্বাদ জানালেন। সভার সমাপ্তি ঘোষিত হল।

বাইরে এসে গর্গ দেখলেন, ভোরের কুয়াশা অপসারিত হয়েছে, উজ্জ্বল মিষ্টি রোদ্দুরে স্বর্গীয় পার্বত্যলোক ভেসে যাচ্ছে। পর্বতপৃষ্ঠগুলি আগে মেঘের মতো মনে হয়েছিল। এখন তাদের দেখে মনে হচ্ছে, ইন্দ্রের হস্তীযূথ যেন নির্লোম পৃষ্ঠদেশে বিভিন্ন মাপ ও প্রকারের হাওদা চাপিয়ে পর পর বসে আছে আরোহীর অপেক্ষায়। কোথাও কোথাও তুষারাবৃত শীর্ষগুলিকে দেবতাদের

রৌপ্যমণ্ডিত শিরস্ত্রাণ বলে ভুল হচ্ছে। চারদিক প্রশান্ত ও নির্মল। এখানে নির্জনতা ও একাকীত্বই শোভা। গর্গ ভুলে যান পাশেই হেঁটে আসছেন বিষ্ণুপাদ। আপন মনে আবৃত্তি করেন :

অনেক-বাহূ-দরবক্ত্রনেত্রং
পশ্যামি ত্বাং সর্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং,
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর! বিশ্বরূপ॥

বিষ্ণুপাদও মুগ্ধ হন ঋষি গর্গের উদাত্ত কণ্ঠের আবৃত্তি শুনে। কিন্তু সতর্কভাবে চারিদিকে তাকিয়ে বলেন,—কার বন্দনা করছেন ঋষি? এই দেবলোকে একমাত্র দেবপ্রধানরাই বিশ্বেশ্বরের বন্দনা করার অধিকারী। আমরা এবং মানুষেরা বন্দনা করবো শুধু দেবপ্রধানদের। তাঁরাই লোকপাল। এখানে ভাবমুগ্ধ হবেন না।

গর্গ একটু সলজ্জ হেসে বললেন,- বহু সাধনা করেছি বিষ্ণুপাদ, কিন্তু বিশ্বেশ্বরকে এভাবে আর কখনো প্রত্যক্ষ করিনি। এই চরাচরব্যাপ্ত হিমশীতল হিমাচলে এসে উপলব্ধি করলাম তাঁর মহান সর্বব্যাপী বিশ্বরূপ। তাই গান উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল আমার কণ্ঠে। হৃদয়ে এক অদ্ভুত আলোড়নের মন্থন অনুভব করছি।

—কিন্তু কী বলছিলেন আপনি? কেবলমাত্র এই গানের সুরধ্বনি যে আমার হৃদয়কেও মথিত বিমথিত করছে ঋষি। বলুন, আরও একবার বলুন।—মুগ্ধ হয়ে পড়েন বিষ্ণুপাদও।

গর্গ তুষারশুভ্র পর্বত শিখরের দিকে তাকিয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মতো বললেন,—ঐ আমি তাঁর সর্বব্যাপী বিশ্বরূপ দেখতে পাচ্ছি :

বহু বাহু, বহু উদর, বহু মুখ ও নেত্রযুক্ত সেই বিশ্বেশ্বর অনন্ত অনিঃশেষ। আমি তাঁর আদি অন্ত মধ্য কিছুই পরিমাপ করতে সক্ষম নই।

গর্গ পুনশ্চ আনন্দাপ্লুত নয়নে আদিগন্ত হিমাচলের শোভায় মুগ্ধ হয়ে বলে উঠলেন :

অনন্ত! দেবেশ! জগন্নিবাস!
ত্বমক্ষরং সদসৎ তৎ পরং যৎ॥

বললেন : দেবতাদেরও ঈশ্বর তুমি। তুমি অনন্ত। তুমিই জগতের আশ্রয়! হে জগন্নাথ, তুমিই পরব্রহ্ম, তুমিই সদসৎ!

তোমাকে প্রণাম! তোমাকে সম্মুখে, পশ্চাতে ও সকল দিক থেকে প্রণাম! নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে, নমোঽস্তু তে সর্বত এব সর্ব!

বিষ্ণুপাদ স্মিতমুখে বললেন,—ভগবানকে জানাই আমারও প্রণাম। ঋষি, একমাত্র আপনার পক্ষেই বলা সম্ভব যে, অনন্ত সর্বব্যাপী ঈশ্বর দেবতাদেরও ঈশ্বর। দুর্ভাগ্য আমাদের, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রমুখ দেবগণের শাসনে মানুষ কেন, আমরা সাধারণ দেবতারাও আজ ভুলতে বসেছি যে, ব্রহ্মাদি দেবগণেরও ঈশ্বর আছেন। পরব্রহ্ম পরমেশ্বরকে ভুলিয়ে দিয়ে দেবশ্রেষ্ঠরাই নিজেদের ঈশ্বর হিসেবে ঘোষণা করেছেন। পাপ পুঞ্জীভূত হচ্ছে ঋষি। এক ঈশ্বর বহু হচ্ছেন। এক ধর্ম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠী ধর্মে স্বার্থান্ধ হচ্ছে। ধর্মের অর্থই যাচ্ছে পাল্টে। এমন একটা সময় আসবে যখন দেবতাদের এই কূটকৌশলী প্রচারের ফলে পরমেশ্বরের স্বরূপই আমরা ভুলে যাব মহর্ষি, সেই দুর্দিনের আর দেরি নেই। ঘোর কাল ঘনিয়ে আসছে। কিন্তু উপায় নেই। দেবতাদের মহাশক্তির অগ্রগতি অপ্রতিরোধ্য। ঈশ্বরের ওপর দেবতাদের প্রতিষ্ঠা অনিবার্য। আপনি বরং সরে দাঁড়ান, ঋষি! এই মিথ্যাচারকে আপনি তো মেনে নিতে পারবেন না।

গর্গ হাসলেন,—সরে দাঁড়ানোর সময় এখনো আসেনি, বিষ্ণুপাদ! যখন তা আসবে, বিশ্বেশ্বরের নির্দেশ তখন অন্তরেই অনুভব করব। এখন আমার প্রধান কাজ, কংসের সন্ত্রাস থেকে জাতিকে রক্ষা করা। সেটাই আমার বিশ্বেশ্বর-বন্দনা। তিনি যে সর্ব জীবের অন্তরাস্থিত ঈশ্বর। জীবের মুক্তিতেই তাঁর আরাধনা তাই সফল।

৪

মধ্যাহ্নে স্বর্গলোকের পথ-ঘাট জনবিরল হয়ে আসে। সভায় আগত প্রধান অতিথিরা তাদের আকাশযানে বিভিন্ন দিকে প্রস্থান করেছেন। বিভিন্ন দেবপ্রধানের বিশেষ রক্ষী বাহিনী এখন দল বেঁধে পদব্রজে চলেছেন বদরিকাশ্রম ছেড়ে। তাঁরা পাহাড়ী পথে কেউ ঘোড়ায়, কেউ লোমশ পার্বত্য গবাদি পশুর পিঠে, কেউ কেউ বা পায়ে হেঁটে যাচ্ছেন। বিষ্ণুপাদের তাঁবুর স্বচ্ছ প্রাচীর-পর্দায় চোখ রেখে মহর্ষি গর্গ সেই সব শোভাযাত্রা দেখছিলেন।

তাঁবুতে প্রবেশ করলেন বিষ্ণুপাদ। তাঁর পাদুকার মচমচ শব্দে মুখ ফেরালেন গর্গ।

বিষ্ণুপাদ স্মিত মুখে বললেন,—আপনি ভাগ্যবান, মহর্ষি! স্বয়ং মহাত্মা বিষ্ণু আপনাকে তাঁর মন্ত্রণা কক্ষে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। আপনি এই একান্ত সাক্ষাৎকার কাজে লাগিয়ে আপনার প্রশ্নের উত্তরগুলি তাঁর কাছ থেকে জেনে নিতে পারেন।

গর্গ উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ালেন,—কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা আমার জানা নেই বিষ্ণুপাদ। আপনিই যে এই সাক্ষাৎকারের আয়োজন করেছেন তা আমি বুঝতে পারছি। আমার প্রতি আপনার সহানুভূতি আমি প্রথম থেকেই অনুভব কবছি।

বিষ্ণুপাদ কিছুক্ষণ গর্গর মুখের দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে রইলেন। মনে হল, তাঁর দৃষ্টি যেন এই তাঁবুর প্রাচীর ভেদ করে অন্যত্র উধাও হয়েছে। ধীরে ধীরে তিনি বললেন,—সহানুভূতি বলে লজ্জা দেবেন না, ঋষি। বরং বলুন, আমি আপনার সঙ্গে সহমর্মিতা অনুভব করছি।

—সহমর্মিতা! গর্গ বিস্মিত হলেন।

—হাঁ, ঋষি! সহমর্মিতা। আমি দেবজাতীয়, কিন্তু পৃথিবীতে গিয়ে মানুষের সঙ্গে বসবাস করে আমি তাদের ভালোবেসে ফেলেছি। তাদের সরলতা, স্নেহ প্রেম ভক্তি ও বিশ্বাস আমাকে মুগ্ধ করেছে। জানেন ঋষি, দেবতারা জ্ঞানে বুদ্ধিতে ও প্রযুক্তিবিদ্যায় যত উন্নত হয়েছেন, তাঁদের হৃদয় ততই

কঠিন ও আবেগহীন হয়ে এসেছে। আমরা যেন ক্রমশ যন্ত্রে পরিণত হতে চলেছি। আমাদের শাসন ও অনুশাসন আষ্টেপৃষ্ঠে আমাদের ঘিরে ধরছে। অবসর নামক আমাদের কোনো স্ফূর্তি নেই। আমরা দেবসভ্যতার দাস।

একটি শ্বাস মুক্ত করে বিষ্ণুপাদ বললেন,—এর আগে দেবপ্রধানদের অনুগ্রহ-প্রার্থী যে সব ঋষিদের সঙ্গে আমার মেশার সুযোগ হয়েছে, লক্ষ্য করেছি, তাঁরা আমাদের আত্মোন্নতিকামী সমৃদ্ধিশীল জীবন যাত্রায় আকৃষ্ট হয়ে নিজের আপনজন ও পৃথিবীকে দেবতাদের কাছে বিকিয়ে দিয়ে আগেভাগেই আত্মসমর্পণের জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হয়ে আছেন। নিজের প্রতিষ্ঠাই এ দের কাছে একমাত্র কাম্য। দেবকার্যের দায়িত্ব পেয়ে এঁরা যেন কৃতার্থ। তার ভালোমন্দ সদসৎ নিয়ে প্রশ্ন নেই। এবং দেবতাদের কাছে ক্ষমতা লাভ করে তা তাঁরা পৃথ্বীবাসীর ওপর প্রয়োগ করে নিজের সামান্য প্রতিষ্ঠায় তুষ্ট। এঁরা স্বজাতীয়ের শত্রু। আত্মসুখে বিভোর। একমাত্র আপনার মধ্যেই স্পষ্ট ব্যতিক্রম লক্ষ্য করছি। তাতে শ্রদ্ধা হয়··

গর্গ একবার সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকান। তিনি যেন বুঝতে চান বিষ্ণুপাদের মনোগত অভিপ্রায়। বিষ্ণুপাদ কি পরীক্ষা করছেন গর্গের মনোভাব? তাঁর সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে গর্গের কথাবার্তায়? তিনি কি বুঝে ফেলেছেন, গর্গ সম্পূর্ণভাবে দ্বন্দ্বমুক্ত নন? শূরসেনের মানুষের প্রতি গর্গের আন্তরিক টান হয়ত এই দেবতার পছন্দ নয়।

সতর্কতার সঙ্গে গর্গ বলেন,—মহৎ কাজে নির্মম হতেই হয়। আজ যাঁরা পৃথ্বীপতি তাঁরা সাধারণের উন্নতির জন্য কিছু মাত্র চিন্তি নন। বিলাস, মৃগয়া, এবং আরামই তাঁদের লক্ষ্য। এজন্য প্রজার ওপর করবৃদ্ধি ও অত্যাচার লেগেই আছে। কংস নিজের বিজয়াভিযানগুলি সফল করার জন্য নিত্য করবৃদ্ধি করে চলেছেন। পৃথ্বীপতিদের মহিষীর সংখ্যা সহস্র সহস্র। এদের ভরণপোষণ ও বিলাসের জন্য সাধারণ মানুষের সর্বস্ব অপহৃত হচ্ছে। রাজপুরুষদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য প্রজাবর্গের স্ত্রী ও কন্যারা নিরাপদ নয়। নন্দালয়ে অবস্থানের সময় দেখেছি, সেই সরলমতি গো-পালক সম্প্রদায় কংসের রাজ-পুরুষদের দ্বারা কী ভাবে সর্বক্ষণ নির্যাতিত হচ্ছে। কর গ্রহণের কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। রাজকোষের প্রয়োজনে যখন ইচ্ছে ও যথেচ্ছা কর প্রদানের হুকুম জারি হয়। ভয় দেখিয়ে রাজপুরুষরা রাজার অজ্ঞাতসারে প্রজার সর্বস্ব

অপহরণ করে। হঠাৎ হঠাৎ ত্রাস সৃষ্টি হয় শান্তিপ্রিয় পল্লীগুলিতে। এই অত্যাচারও নিবারিত হওয়ার প্রয়োজন।

বিষ্ণুপাদ হাসেন,—সেই নিরাপত্তা কি আসবে লোভী ব্রাহ্মণের মাধ্যমে? তাঁরা দেবতাদের সাহায্যে একদিন রাজার ক্ষমতাও গ্রাস করবেন। তখন এক রাজার বদলে মানুষ শোষিত হবে হাজার হাজার ব্রাহ্মণের দ্বারা।

—বিষ্ণুপাদ! সবিস্ময়ে গর্গ তাকান।

বিষ্ণুপাদ বলেন,-- কিন্তু দেবতারা বস্তুত সে অবস্থা চান না।

—তাঁরা কী চান?

প্রথমত তাঁরা যুদ্ধপ্রিয় কলহপরায়ণ গর্বিত রাজপুরুষদের উৎখাত করে প্রতিষ্ঠিত করতে চান একটি সংহত সমাজ-ব্যবস্থা। খণ্ড বিচ্ছিন্ন ভারতবর্ষকে বেঁধে দিতে চান একসূত্রে। বিশৃঙ্খলার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে চান নিয়মের রাজত্ব।

—এ তো অতি উত্তম অভিপ্রায়।

বিষ্ণুপাদ উজ্জ্বল দৃষ্টিতে তাকান,—সেই মহৎ উদ্দেশ্যই মহাত্মা বিষ্ণুর। মহর্ষি, আপনি তাঁর ওপর পূর্ণ আস্থা স্থাপন করতে পারেন।

গর্গ সজলনেত্রে বিষ্ণুপাদকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাঁর সঙ্গে বিষ্ণুর মন্ত্রণা কক্ষের উদ্দেশ্যে পথে এসে নামলেন। তাঁর মনের ভার অনেকটা হাল্কা হয়ে গেছে। যে গ্লানি ও অপরাধবোধ তাঁকে পীড়া দিচ্ছিল, মনের সেই কুয়াসা সরে যেতে গর্গের মানসলোক পবিত্র এই স্বর্গভূমির মতোই স্নিগ্ধতা লাভ করেছে। ওদিকে বিষ্ণুপাদও গর্গকে বারবার লক্ষ্য করতে করতে অগ্রসর হচ্ছেন। তিনিও খুশি। গর্গের এই পরিবর্তনে বিষ্ণু যে বিষ্ণুপাদের প্রতি অত্যন্ত তুষ্ট হয়ে তাঁকে পদোন্নতির দ্বারা পুরস্কৃত করবেন এ বিষয়ে বিষ্ণুপাদের সন্দেহ নেই। তিনি ভালোভাবেই গর্গের মানসিক চিকিৎসা করে সফল হয়েছেন আজ।

বেশ কিছুক্ষণ কম্পিত বক্ষে অপেক্ষা করতে হল গর্গকে। শেষে এক সময় দেবদেব বিষ্ণু ডেকে পাঠালেন তাঁকে।

রুদ্ধদ্বার কক্ষ। উচ্চাসনে বিষ্ণু এবং পদতলে গর্গ ভিন্ন আর কেউ নেই।

মৃদু হেসে বিষ্ণু বললেন,—আপনার যে কোনো প্রশ্ন আপনি নির্ভয়ে নিবেদন করতে পারেন, ঋষি। মনে দ্বন্দ্ব নিয়ে কোনো কাজে সাফল্য সম্ভব নয়।

গর্গ মাথা নিচু করলেন। তারপর অর্ধস্ফুট স্বরে বললেন,— আমার অপরাধ ক্ষমা করুন, দেবকার্যে আমার মন এখন স্থির হয়েছে। শুধুমাত্র একটি বিষয়

জানার অত্যন্ত কৌতূহল। যদি আপনার বিবেচনায় আমাকে তা জানানো উচিত মনে করেন, তবেই প্রশ্ন করি।

—আপনার প্রশ্ন খুবই সঙ্গত। আমি বিষ্ণুপাদের কাছে শুনেছি। কৃষ্ণ বলরামের শিক্ষার কিছু দায়িত্ব আপনাকেই নিতে হবে। দেবক ও বসুদেবের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ রাখতে হবে। সুতরাং কৃষ্ণজন্ম সম্পর্কে আপনার মনের দ্বন্দ্ব মিটিয়ে নেওয়াই ভালো। হ্যাঁ। কৃষ্ণ, বসুদেবের নয়, নন্দেরও নয়, সে আমারই পুত্র।

—আপনার। গর্গ দুই কর কপালে ছোঁয়ালেন, বললেন,—জয় বিষ্ণু, জয় কৃষ্ণ!

—তবে শুনুন সে কাহিনী। বিষ্ণু ধীরে ধীরে রহস্য উন্মোচন করলেন সুললিত সংস্কৃত ভাষায়।

সরল বাঙলায় সংক্ষেপিত কাহিনীটি এই রকম :—

ক্ষমতা পেয়ে কংস যখন শূরসেন থেকে বিষ্ণুর আধিপত্য নষ্ট করতে উঠে পড়ে লাগলেন, দেবতা আর তাঁদের অনুগ্রহভাজন সম্প্রদায় তখন তৈরী হতে লাগলেন প্রতিশোধের জন্য। বিষ্ণু গোপনে সাক্ষাৎ করলেন কংসের কাকা দেবকের সঙ্গে। কারও ঘরে আগুন লাগাতে হলে জ্ঞাতিশত্রুদের হাত করতে হয়। দেবতারা লক্ষ্য করেছেন, ভারতের মাটিতে এই অস্ত্র শানায় ভালো। তাই কংসের প্রতিপক্ষে দেবককে পেলে তাঁদের উদ্দেশ্য সফল হয়।

নরম সরম উগ্রসেনকে সহ্য করা দেবকের পক্ষে সহজ ছিল। রাজ্যে অগ্রজেরই অধিকার। সেটাও মেনে নিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু কংসের উত্থানে দেবক অসন্তুষ্ট। দেবতারা এ সুযোগ কাজে লাগালেন। কংসের প্রতি যাতে দেবক সমস্ত স্নেহ ত্যাগ করেন, এজন্য বিষ্ণু দেবককে একটা গোপন খবর দিলেন। বিষ্ণু জানালেন, কংস উগ্রসেনের ছেলেই নয়। কোনো এক দুর্বল মুহূর্তে কংসের মা দানবপতি দ্রুমিলের দ্বারা গর্ভিণী হন, আর তার ফলেই কংসের জন্ম।

গর্গ সবিস্ময়ে বিষ্ণুর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। বিষ্ণু স্মিত মুখে বললেন,—সে অনেক কথা, ঋষি! দেব, দানব ও ব্রাহ্মণদের ঔরসে পৃথিবীর নারীরা যে কত গর্ভ ধারণ করেছেন তার সংখ্যা ও হিসেব আমারও জানা নেই। কংসও এমনি এক দানবের পুত্র।

গর্গ বললেন,—প্রভু! অপরাধ নেবেন না। এ এক অবিশ্বাস্য কাহিনী। উগ্রসেন-মহিষী অত্যন্ত সৎস্বভাব সম্পন্না নারী। পতিব্রতা। তিনি এমন কাজ করেও স্বামীর কাছে তা গোপন রাখলেন?

গর্গের প্রতিবাদে অসহিষ্ণু বিষ্ণু রুষ্টস্বরে বললেন,—মহর্ষি! দেবতার বাক্য বেদবাক্য বলেই সকলের মান্য। আপনার তার্কিক মন আপনার উন্নতির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু আমি তা চাই না। আমি আপনাকে সসম্মানে নির্বাচিত করেছি। স্বজাতিবর্গ সম্পর্কে আপনার মোহভঙ্গ হওয়া উচিত।

গর্গ ভয়ে বিবর্ণ হলেন। করজোড়ে বললেন,—আপনি আমাকে আশ্বাস দিয়েছেন বলেই আমি আমার মনের দ্বন্দ্ব....

বাধা দিয়ে বিষ্ণু বললেন,—তার অর্থ এই নয় যে, আমার প্রতিটি বক্তব্যকে আপনার কাছে প্রমাণ করতে হবে।

এই সময় অন্তঃপুর থেকে এক অপূর্ব সুন্দরী গন্ধর্বকন্যা এবং বহির্দ্বার দিয়ে এক দেবদূত প্রবেশ করলেন।

বিষ্ণু দেবদূতের দিকে সপ্রশ্নে তাকালে দূত অভিবাদন জানিয়ে বললেন,—বাইরে দেবর্ষি নারদ আপনার সাক্ষাৎ-প্রার্থী।

বিষ্ণু বললেন,—তাঁকে ভেতরে আনো।

তারপর গন্ধর্বকন্যার দিকে তাকালেন।

উর্ধ্বাঙ্গে কাঁচুলিমাত্র, নিম্নাঙ্গের সুশোভন নিতম্ব-প্রদেশ খাটো পীত বসনে আবৃত সেই সুন্দরী বিষ্ণু-সেবিকা জানালেন,—বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মীদেবী বিষ্ণুর আহারেব ব্যবস্থা করেছেন, তিনি কি কিছুক্ষণের জন্য ভিতরে যাবেন?

—তুমি যাও, মোহিনী! আমি আসছি।

এই সময় দেবগায়ক নারদ এসে প্রণাম করলেন। বললেন,—আপনার আদেশ মতো সব কাজ সেরে এলাম। দেরি হয়ে গেল। তাই আর সভায় গান গেয়ে সকলকে আনন্দ দিতে পারলাম না আজ।

বিষ্ণু বললেন,—কাজই আগে আর তাতে আপনার পারদর্শিতা সত্যিই প্রশংসনীয়। খুব ভালো সময় এসেছেন, দেবর্ষি। আপনি তো মহর্ষি গর্গকে চেনেন! ইনি তার্কিক। অত্যন্ত প্রমাণ-প্রিয়।—তারপর মৃদু হেসে বিষ্ণু বললেন,—যে কংস তার জন্মকাহিনী আপনার কাছে শুনে সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করেছিল, মহর্ষি তা আমার মুখে শুনেও সেই আস্থা স্থাপন করতে পারছেন না! আমি কিছুক্ষণের জন্য অন্তঃপুরে যাচ্ছি। এই সময় আপনি গর্গের সন্দেহ নিরসন করতে পারেন কিনা একটু চেষ্টা করে দেখুন।

গর্গ অস্ফুট স্বরে কিছু বলতে চাইলেন। কিন্তু বিষ্ণু আর অপেক্ষা না করে অন্তঃপুরের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করলেন। তাঁর পাদুকার মশমশ শব্দ মিলিয়ে যেতে

নারদ গর্গের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন,—ভয়ের কিছু নেই। বিষ্ণু রুদ্র নন যে এখনই শাস্তির বিধান দেবেন। আমি জানি মহর্ষি, আপনি পণ্ডিত ও বিবেচক। কংসের দুর্ভাগ্য, আপনার মন্ত্রণা থেকে সে নিজেকে বঞ্চিত করেছে। কিন্তু সে কথা থাক। বিষ্ণুর আদেশে আমি আপনাকে সেই কাহিনী শোনাই, যা শুনিয়েছিলাম আমার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত কংসকে। স্বীকার করি, কংস অত্যন্ত সজ্জন এবং বীর। বীরত্বই তার অলঙ্কার। আর আর্যাবর্তের বীর পুরুষদের মতোই সেও স্বভাব-সরল। এই সারল্য ক্ষত্রিয় পুরুষদের যেমন একটি সদ্‌গুণ, রাজপুরুষ হিসেবে তেমনই তা তাঁদের বিনাশেরও কারণ। অতি সরলতাই কংসের ধ্বংস ত্বরান্বিত করবে। নয়ত আজ তার সমকক্ষ বীর বস্তুতই জরাসন্ধ ছাড়া আর কেউ নেই। আমিও তাকে স্নেহ করি। অবশ্য দেবকার্যে স্নেহমমতা অপেক্ষা কর্তব্যই প্রধান। আমি কাজের মানুষ। ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্রাদি দেবতার কাজই আমার জীবনব্রত, সেখানে অন্যান্য প্রশ্নের কোনো স্থান নেই।

গর্গ সাহস করে আর কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করলেন না, নীরবে তাকিয়ে রইলেন উজ্জ্বল বর্ণ নারদের সৌম্য মূর্তির দিকে। এই দেবর্ষির মুখাবয়ব ও দেহকান্তি এমনই মনোলোভন যে তিনি সহজেই সকলের মনে মোহ সৃষ্টি করতে পারেন। কথা বলেন সকলেরই মনোরঞ্জন করে।

নারদ বললেন,—বিষ্ণুর প্রাধান্য যখন কংস অস্বীকার করল তখন আর প্রকাশ্যে দেবতা ও তাঁদের অনুগামী ব্রাহ্মণরা শূরসেনের পথে-ঘাটে বিচরণের সাহস পেলেন না। কংসকে ভয় করে না এমন কে আছে?

নারদ দেবতাদের মতোই আত্মপ্রশংসা প্রিয় এবং গর্বিত। তাঁর মুখে দেখা দিল এক টুকরো গর্বের হাসি, বললেন—তখনই দেবসভায় ডাক পড়ল আমার। আমি ছাড়া এঁদের গতি নেই, কেননা আমার গতিবিধি বড় সূক্ষ্ম। আমি যে কার মিত্র আর কার শত্রু, এই দেবতারাও তা জানেন না। দেবকার্যের মহৎ প্রয়োজনে আমি আজ এর, কাল তার বন্ধু। তাই দেবসভায়ও নিন্দুকরা আমাকে কলহ সৃষ্টির দূত বলে গালি-গালাজ করেন। কিন্তু…পরিতৃপ্তভাবে হেসে নারদ আবার বললেন,—তবু আমাকে নাহলে তাঁদের চলে না। এঁরা কাজ বোঝেন, যদি আপনি এঁদের উদ্দেশ্য ঠিক ঠিক সফল করে যান, তবে আপনার শত অপরাধও মার্জনীয়। দুরাচারী দুর্বাসা আজ অমিত ক্ষমতার অধিকারী। দেব ব্রাহ্মণ সকলের ওপরই তিনি কোপ ও দাপট প্রদর্শন করে বেড়ান। তার একমাত্র কারণ, দেবতাদের পায়ে মানুষের মাথা তিনি বলপ্রয়োগ

করে নুইয়ে দিতে জানেন। প্রশ্নে কাজ কি মহর্ষি। ধর্ম পথেই একমাত্র উন্নতি। আর্যাবর্তের শাসকমণ্ডলীর দিন শেষ হয়ে এসেছে। আজ হোক, কাল হোক, দেবসভ্যতার জয় কেউ ঠেকাতে পারবে না। তাঁরাই ধারণ করবেন ধরার ভূভার। সেটাই ধর্মীয় পথ। বুদ্ধিমানে আজ তাই বিনাবাক্যে সেপথই অবলম্বন করছে।

গর্গ বললেন,— ধর্মপথ? ধর্মপথ কি শুধুই কুটিল রাজনীতি?

—যদি তাকে রাজনীতি বলেন তবে তাই। আমি বলব, দেবনীতি। ধর্ম মানে ধারণ করা। যে যখন জনগণের ভাগ্যবিধাতা, তার অনুশাসনই তখন ধর্ম। দেবতারা যে শাসন প্রশাসন প্রবর্তন করছেন ও করবেন, যতদিন তার প্রভাব থাকবে অপ্রতিহত, ততদিন সেটাই হবে ধর্ম হিসেবে মান্য। ধর্মের ব্যাখ্যা অতি সূক্ষ্ম, মহর্ষি।

গর্গ জিজ্ঞাসা করলেন—কিন্তু ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে পরমার্থতত্ত্বের তাহলে কেমন-ভাবে মিল করব? জনগণের মধ্যে ধর্মের প্রচারের স্বরূপ কী হবে? এর মধ্যে অনন্ত অব্যক্ত পরমেশ্বরের ঠাঁই কোথায়?

মাথার ওপরে তর্জনী নির্দেশ করে নারদ বললেন,—পরমেশ্বরের ঠাঁই ঐ অনন্ত নীলাকাশে। এই সর্বত্র। কিন্তু তাঁকে কে জানে? মানুষের ঈশ্বররাই এখন পরমেশ্বর। যিনি ক্ষমতাবান, তিনিই ঠিক করে দেবেন কে তাঁর জনগণের পরমেশ্বর। আর ক্ষমতাবানের অনুশাসনই ধর্ম, সেটাই তাবৎ সমাজের পরমার্থ। আপনার আমার ক্ষেত্রেও। সুতরাং এবিষয়ে নির্দ্বন্দ্ব হয়ে নিজেকে সমর্পণ করুন, তাতেই মুক্তি।

গর্গের নীরবতা লক্ষ্য করে নারদ মৃদু হেসে বললেন,—হবে। আস্তে আস্তে আপনিও উপলব্ধি করবেন। নান্য পন্থা।

গর্গের মনে হল, বস্তুতই তাঁর আশপাশ উর্ধ্ব নিম্ন সব জায়গায়ই একটি অদৃশ্য অর্গল পড়ে গেছে। এর থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় দেবতার করুণা। তিনি মাথা নিচু করে ধীরে ধীরে বললেন,—আপনি যা বললেন. তাতে সদসৎ নির্বাচনের অধিকার থেকে ধর্মপথ-যাত্রী বঞ্চিত, এটাই মেনে নিতে হয়।

—তাতে আর সন্দেহ কি? সৎ ও অসৎ তো দুটো শব্দ। যুগে যুগে যেমন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবে, তার ব্যাখ্যাও তেমনি পাল্টাবে। এটাই তো নিয়ম। মিথ্যে আপনার মগজে কিছু এলোমেলো প্রশ্ন জড় করে কষ্ট পাচ্ছেন।

গর্গ একটি দীর্ঘশ্বাস মোচন করে বললেন,—অতঃপর আত্মসমর্পণের চেষ্টাই করব। এখন কংসের জন্ম বৃত্তান্ত শোনার আগ্রহ হচ্ছে।

নারদ বললেন,—হাঁ যা বলছিলাম। আমার ডাক পড়ল দেবসভায়। আদেশ হল, কংসকে ভিনভাবে আক্রমণ করতে হবে। বর্তমানে তার যা প্রতাপ তাতে আক্রমণ রচনা করতে হবে দুই স্তরে। এক, তার মনোবল ভেঙে দিতে হবে, তাকে দূরে সরিয়ে দিতে হবে তার আপনজন থেকে। দুই, তার প্রতি যদুদের বিশ্বাস শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা নষ্ট করতে হবে। তারপর সম্মুখ সমর। পৃথিবীর মানুষ দেবতাদের আপনজন বলে কখনই ভাবতে পারে না। ভয় শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে কেউ কেউ আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু তাঁদের অদ্ভুত অপার্থিব জীব হিসেবেই গণ্য করে। দেবতারা বহিরাগত। তাই তাঁদের প্রতিষ্ঠা টিকিয়ে রাখতে হলে তা মর্ত্য মানুষের সাহায্যেই টিকিয়ে রাখতে হবে। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হলে, মর্ত্যবাসীকেই তাদের আপনজনের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দেবতারা নেপথ্য সাহায্য দিয়ে ধ্বংস করবেন দেবশত্রুদের। মানুষ তাঁদের প্রসন্ন করবে, তাঁরাও সহায্য করবেন মানুষকে।

নারদ কথা থামালেন। এই সময় সেই গন্ধর্বকন্যা শ্বেত-পাথরের পাত্রে মিষ্টি ফলের রস এনে তাঁদের দিলে নারদ হেসে বললেন,—মোহিনী! তোমার গানের গলাটি ঠিক এই পানীয়ের মতোই মিষ্টি।

মোহিনী তার টুকটুকে অধরোষ্ঠে ততোধিক মিষ্টি হাসি ছড়িয়ে প্রস্থান করল।

এক চুমুক পান করে নারদ শুরু করলেন,—বসন্তকালে প্রকৃতি ও মানুষ সম্ভোগের অভীপ্সায় কামাতুর হয়। তেমনি এক সময়ে কংসমাতা সখীদের সঙ্গে বেড়াতে যান সুযামুন পর্বতে। সুযামুনের সর্বাঙ্গে রূপের ছটা। চারিদিক পুষ্প পত্রে প্রজাপতিতে ঝলমল করছে। রাণী সখী-পরিবৃতা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন পর্বতের বাঁকে বাঁকে। মন তাঁর চঞ্চল হয়েছে। ওদিকে সুযামুনে বেড়াতে এসেছেন দানবরাজ দ্রুমিলও। সুশ্রী পরাক্রান্ত পুরুষ। তিনি তাঁর আকাশ যান সৌভবিমান থেকে পর্বতের এক উপত্যকায় অবতরণ করে দূরবর্তী পর্বতের কোলে স্বেচ্ছা-বিহারিণী সেই সুন্দরীদের দেখে মোহিত হলেন। সংবাদ নিয়ে জানলেন, উগ্রসেন মহিষী এসেছেন পর্বতভ্রমণে। রাজা দ্রুমিল ছিলেন ছদ্মবেশ ধারণে দানবদের মতোই দক্ষ। তিনি উগ্রসেনের ছদ্মবেশ ধারণ করে সখী-পরিবৃতা রাণীর কাছে উপস্থিত হলে রাণীর আর আনন্দের

সীমা রইল না। সখীরা রাজা এসেছেন ভেবে দূরে সরে গেল। ক্রমিল ও রাণী সেই মনোরম পর্বতে রমণে রত হলেন। আর তারই ফলে জন্ম হয়েছিল কংসের। সে উগ্রসেনের ঔরসজাত নয়। কিন্তু একথা রাণী ছাড়া আর কেউ জানল না।'

গর্গ মুখ তুলে নারদকে দেখলেন। মুখে তাঁর চতুর হাসি। গর্গ আবার মাথা নিচু করলেন। না, বিশ্বাস হয় না এ গল্প। যদি কেউ-ই তা জানল না, তবে নারদ সে খবর পেলেন কোত্থেকে। কংসমাতার পতিভক্তি যাদব সমাজে প্রখ্যাত। তবে কি এই গল্প বলে কংসকে তাঁর মাতার প্রতি বিদ্বিষ্ট করার চেষ্টা করেছেন নারদ? বন্ধু সেজে সর্বনাশ করে এসেছেন তাঁর? কংস তাঁর মা ও বাবার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিল। নারদ কি এভাবেই উগ্রসেন ও কংসমাতাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন তাঁদের আদরের পুত্রের কাছ থেকে। এটাই ধর্মসম্মত আচরণ? বস্তুতই ধর্মের গতি সূক্ষ্ম!

এই সময় বিষ্ণু প্রবেশ করে বললেন,—দেবর্ষি। নারায়ণী আপনার গান শোনার জন্য উন্মুখ হয়ে আছেন অন্তঃপুরে।

নারদ উঠে দাঁড়ালেন—স্বর্গলোকে দ্বিপ্রহরও এক রাগিণী। নিশ্চয় তাঁকে গান শোনাব,—বলে গর্গের দিকে তাকিয়ে একটু যেন ব্যঙ্গের সুরেই বলে গেলেন,—মহর্ষি। দেবতাদের তুষ্ট করুন। আত্মসিদ্ধিই সর্বোত্তম সিদ্ধি। দেখবেন, এর চেয়ে সুখ আর কিছুতে নেই। জয় বিষ্ণু। জয় লক্ষ্মী-নারায়ণ।

বিষ্ণু আসন গ্রহণ করে অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে গর্গকে পরীক্ষা করলেন কিছুক্ষণ, তারপর বললেন,—আপনাকে আমার বিশেষ প্রয়োজন, গর্গ। তাই আপনার কাছে অতঃপর আর কিছুই গোপন রাখব না। স্বেচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, দেব-উদ্দেশ্য সাধনই হবে আপনার ধর্ম। কংসের জন্ম বৃত্তান্ত শুনলেন। এবার শুনুন, কৃষ্ণ বলরামের আবির্ভাব রহস্য। এদের শৈশবকে গড়ে তোলার দায়িত্ব আমি আপনার ওপরেই অর্পণ করব। বিষ্ণুব্রত এবং যুদ্ধ বিশারদ দেবতারা শিক্ষা দেবেন এদের রণকৌশল।

গর্গ নীরব।

বিষ্ণু শুরু করলেন তাঁর রহস্য কাহিনী।

সহজেই দেবককে বশীভূত করা গেল। ভ্রাতৃপুত্রের বিরুদ্ধে, দেশবাসীর শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত বীর কংসের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার পক্ষে একটা যুক্তি খুঁজে পেলেন দেবক। উগ্রসেনের জারজ সন্তানকে উৎখাত করার অভিসন্ধি তাঁর মনে কোনো দ্বিধা ও অনুতাপের সৃষ্টি করল না।

দেবক বললেন,—আদেশ করুন মহাত্মন্! আমাদের কুল-কলঙ্ক এই প্রবল প্রতাপ কংসকে উৎখাত করার জন্য আমি আমার যথাসাধ্য করব।

বিষ্ণু বললেন,—দেবক। শূরসেনে বসুদেব তাঁর বুদ্ধি বিদ্যা এবং মধুর ব্যবহারের জন্য একজন জনপ্রিয় নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। স্বয়ং কংসও তাঁর প্রতি অত্যন্ত বন্ধু ভাবাপন্ন! তিনি আপনার জামাতা। আপনার ছয় কন্যাকেই আপনি এই নেতৃত্বাভিলাষী উচ্চাকাঙ্ক্ষী পুরুষের হাতে অর্পণ করেছেন। আপনার সপ্তম কন্যা দেবকী আমার স্নেহের পাত্রী। সে ধর্মপ্রাণা এবং আমার প্রতি বিশেষ অনুরক্তা। আপনি দেবকীর সঙ্গেও বসুদেবের বিবাহ দিন।

বিষ্ণুর দিকে হতভম্বের মতো কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে দেবক বললেন —বসুদেবের মত ধীর স্থির ব্যক্তিত্বসম্পন্ন উচ্চাভিলাষী এবং চতুর ও সুপণ্ডিত যাদবদের মধ্যে কমই আছেন। তরুণ যাদবেরা অল্পেই উত্তেজিত থাকেন। কংসের প্রতাপ তাঁদের মধ্যে দিন দিন আরও দুর্বিনয়ের প্রশ্রয় দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সুকুমার বসুদেব নম্র ও বিনয়ী। এমন লোকের হাতে দেবকীকে দান করতে আমার আপত্তির কোনো কারণই নেই। কিন্তু এর দ্বারা আমাদের কোন্ উদ্দেশ্য সাধিত হবে?

বিষ্ণু বললেন,—নিজের অভিপ্রায় গুপ্ত রেখে কার্যসাধনে বসুদেব সুপটু। কংসের মন্ত্রণা সভায় বসে তিনিই পারেন কংস-উৎখাতের আয়োজনকে সাফল্য মণ্ডিত করতে। মহাবল ভীষ্ম-রক্ষিত হস্তিনাপতি ধৃতরাষ্ট্রের সভায় এমনিই এক গুণবান পুরুষ, বিদুরকে আমরা নিযুক্ত করেছি। জরাসন্ধের পুরোহিতরাও আমাদের দলভুক্ত হয়েছেন।[৩] কংসের সভায়ও এমন একজনের সর্বদা উপস্থিতির প্রয়োজন।

—কিন্তু দেবকীর সঙ্গে বিবাহ কি প্রয়োজনে, তা যদি ব্যাখ্যা করেন!

হাসলেন বিষ্ণু। অল্পক্ষণ আত্মগত চিন্তার পর বললেন,—প্রথম কারণ, দেবকী কংসের অত্যন্ত প্রিয় ভগিনী। দেবকীর সঙ্গে বিবাহে কংস বসুদেবকে আরও ক্ষমতার অধীশ্বর করবে। তাছাড়া শূরসেনের মানুষও বসুদেবকে মান্য করবে আরও বেশি করে।

একটু নীরবতার পর বিষ্ণুর মুখে দেখা দিল অভিসন্ধিপরায়ণ এক টুকরো কুটিল হাসি। বললেন,—আর এই দেবকীর গর্ভেই জন্ম নেবে আমার দুই পুত্র, তারাই ধ্বংস করবে কংসকে।

—আপনার পুত্র? দেবক সবিস্ময়ে তাকালেন।

—দেবক? আপনার জামাতা কি পুত্রোৎপাদনে সক্ষম?[8]

দেবক মাথা নিচু করে বললেন,—হয়ত বা আমার কন্যারাই

-ন। এবং তা যে নয়, তা দেবকীই প্রমাণ করবে। তার গর্ভে আমিই পুত্রোৎপাদন করব। সে পুত্রের নাম হবে, কৃষ্ণ। কৃষ্ণ আমারই অংশজাত হয়ে আমার শত্রু কংসকে হত্যা করবে।

বিষ্ণুর উচ্চকণ্ঠ হাস্যে চমকিত হলেন দেবক। তারপর ধীরে ধীরে বললেন.

—দেবতা ও ব্রাহ্মণদের ঔরসে ক্ষত্রিয় নারীর গর্ভে সন্তান জন্ম হয়ে আসছে, সমাজও তাদের মেনে নিয়েছে। তবু আমার কন্যার যাতে এমন দুর্নাম না রটে তার জন্য আপনার কাছে আবেদন করছি আমি।

সন্তুষ্টভাবে বিষ্ণু বললেন,—এ সংবাদ আপনি, দেবকী ও বসুদেব ব্যতীত আর কেউ জানবে না। লোকে শুধু জানবে, কৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার। উত্তম প্রস্তাব। এতে আমাদের উদ্দেশ্য আরও ভালোভাবেই সিদ্ধ হবে। কৃষ্ণ পরিচিত হবে যাদব বলে।

দেবক এই ব্যবস্থায় সপ্রীত সম্মতি জানিয়ে বললেন,—এইবার বলুন, আপনি আপনার উদ্দেশ্য কী ভাবে সাধন করতে চান।

একটু চিন্তা করে বিষ্ণু বললেন— দক্ষিণ দিকে হিরণ্যকশিপু পরাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। তার ভাই কালনেমি। কালনেমির ছটি সদ্যোজাত ও অকালজাত শিশু মন্ত্রপুতঃ জলপাত্রে রক্ষিত আছে। দেবী যোগনিদ্রা ধাত্রীবিজ্ঞানে অতুলনীয়া। তিনি কৌশলে ঐ ছয় দৈত্যশিশুকে দেবকীর গর্ভে পর পর প্রবিষ্ট করাবেন। এই শিশুদের কংসের হাতে তুলে দেবেন বসুদেব। কংস একের পর একটি শিশু হত্যার পাপে নিমজ্জিত হতে থাকলে দেশে তাঁর কুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে। বিবেকবান অমাত্যেরা তাঁকে পরিত্যাগ করবেন। আর আপনি, বসুদেব ও দেবকী আপনাদের প্রতি কংসের অত্যাচারের কাহিনী সর্বত্র রাষ্ট্র করে দেবেন। ভেবে দেখুন, দানব শিশুকে কংসের হাতে তুলে দিতে আপনাদের বিন্দুমাত্র ত্যাগ স্বীকারও করতে হবে না।[5]

শুনতে শুনতে গর্গ ভয়ে বিস্ময়ে মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন। দেবতার অসাধ্য কিছুই নেই। দেবকীর ছয় সন্তানই তবে দানবরাজ হিরণ্যকশিপুর ভ্রাতুষ্পুত্র! শোনা যায়, অশ্বিনীকুমাররা মানুষের বিচ্ছিন্ন হাত পা জুড়ে দেন শল্যচিকিৎসা করে। এই চিকিৎসা প্রয়োগে বৃদ্ধের চেহারায় তাঁরা আনতে

পারেন যৌবনের দীপ্তি। ঋষিরাও তাঁদের কাছে এইসব বিজ্ঞানে শিক্ষা পাচ্ছেন এমনই অসাধ্য সাধন করেছেন দেবতাদের কাছের মানুষ কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন। তিনি গান্ধারীর গর্ভচ্যুত মাংসপিণ্ড একশ এক খণ্ডে বিভক্ত করে জলপাত্রে রক্ষা করেন, তারই ফলে ধৃতরাষ্ট্র মহিষী আজ শতপুত্র ও এক কন্যার জননী। শোনা যায়, দ্রোণের জন্মও এইভাবে। সুতরাং বিষ্ণুর কথায় অবিশ্বাসের কারণ নেই। তবে ভিন্নগর্ভে অন্য নারীর ভ্রূণ প্রবিষ্ট করিয়ে পুত্রোৎপাদনের ঘটনা কি আর কোথাও শুনেছেন গর্গ?[৬]

না, এমন কিছু মনে পড়ে না তাঁর।

বিষ্ণুই শোনালেন সেই কাহিনী। তিনি বলতে থাকেন: দেবককে আমি আরও বলেছিলাম, দেবকীর সপ্তম গর্ভে আমিই জন্ম গ্রহণ করব।[৭] যোগনিদ্রা সে গর্ভ আকর্ষণ করে নন্দালয়ে অবস্থানকারিণী রোহিণীর গর্ভে তাকে স্থানান্তরিত করবে। এই গর্ভাকর্ষণের জন্য তার নাম হবে সঙ্কর্ষণ। মহর্ষি, এই সঙ্কর্ষণেরই নামকরণ করে এসেছেন আপনি। ইনিই বলরাম।

গর্গ সবিস্ময়ে বললেন, বলরামও আপনার ঔরসে দেবকীর পুত্র?

—হ্যাঁ। দানবপুত্র[৮] আমার আপনার প্রিয়পাত্র নয়। তারা বিধর্মী দেবশত্রু। এদের নিধনে দেবকার্যই করা হয়। কংসের হাত থেকে আমার পুত্র বলরাম ও কৃষ্ণকে রক্ষার জন্যই আমি এই ব্যবস্থা করি।

—কৃষ্ণের অগ্রজ বলরাম জন্মগ্রহণ করে দেবকীর গর্ভে, তারপর গর্ভ স্থানান্তর করে রটনা করা হয় যে, দেবকীর সপ্তম গর্ভ পাতিত হয়েছে। এই রটনার উদ্দেশ্যও কি বলরামের নিরাপত্তা?—প্রশ্ন করেন গর্গ।

—আপনি ঠিকই ধরেছেন—। মাথা হেলিয়ে বিষ্ণু বলেন, —এরপর কৃষ্ণজন্ম। তার জন্ম হয় ভাদ্রমাসে কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে অর্ধরাত্রে।[৯] একই রাত্রে নবমী তিথিতে নন্দালয়ে একটি ফুটফুটে শিশুকন্যা প্রসব করেন নন্দজায়া যশোদা। এই প্রসবের মুহূর্ত যোগনিদ্রা আগেই গণনা করেছিলেন। তাই আমার নির্দেশে বসুদেবের মাধ্যমে এ সময় নন্দকে কংসের কর নিয়ে তার পুরুষ দলবলসহ মথুরায় আসতে বলা হয়। উদ্দেশ্য ছিল, ব্রজভূমিকে সে রাতে পুরুষশূন্য করা। তাতে কৃষ্ণের সঙ্গে যশোদার শিশুকন্যাকে অদল-বদল করে নেওয়ার সুবিধে। নন্দ যখন সদলে যমুনা পার হচ্ছেন, বসুদেব যোগনিদ্রার ইন্দ্রজালের সাহায্যে তখন গুপ্তচরদের নজর এড়িয়ে কৃষ্ণকে নিয়ে যমুনা পার হয়ে ব্রজভূমি নন্দালয়ে প্রবেশ করেন।[১০]

যোগনিদ্রার ইন্দ্রজালে[১১] যশোদা ছিলেন নিদ্রিত। যোগনিদ্রা তুলে আনেন সদ্যোজাত শিশুকন্যাকে আর কৃষ্ণকে রেখে আসেন বসুদেব। একাজ করতে হয়েছিল এজন্যই যে, সকলে জানবে, দেবকীর অষ্টম গর্ভে এক কন্যা জন্ম নিয়েছে এবং কৃষ্ণ নিরাপদে বর্ধিত হবে নন্দালয়ে। সময়কালে নন্দ-যশোদাকে কৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্ত জানানো হবে। এখনো সে সময় উপস্থিত হয় নি। মহর্ষি, দেবকার্যে কখনো কখনো আপনাকে নিষ্ঠুরও হতে হবে, কেননা এই নিষ্ঠুরতার পেছনে আছে দেবতাদের মহৎ উদ্দেশ্য। আমরা আপনাদের মতো দেবপূজারী পুরোহিত শ্রেণীর হাতেই ভারতবর্ষের ক্ষমতা তুলে দিতে চাই। ভারতবাসীকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চার শ্রেণীতে ভাগ করে আপনারা নিরাপদে ও সুখে ক্ষত্রিয়ের সাহায্যে এই সুফলা সাম্রাজ্য ভোগ ও শাসন করবেন। দেবতারা শুধু চাইবেন, আপনাদের বশ্যতা। ব্যস, এটাই ধর্ম। সেই এক ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করবে আমার পুত্র কৃষ্ণ। আর দেবকী হবেন 'দেবগভ্যা' নামে আপনাদের প্রণম্য।[১২]

বিষ্ণুর আদেশ স্বর্গলোক হিমবৎ পর্বতে তো বটেই, ব্রহ্মাবর্তেও যে শীঘ্রই অলঙ্ঘনীয় হবে, বদরিকাশ্রমে কয়েক দণ্ড অবস্থানের ফলে এই পরিণাম সম্পর্কে গর্গের মনে আর সন্দেহের অবকাশ রইল না।

নির্বোধে প্রশ্ন করে না, সে স্বভাববিশ্বাসী। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তার কৌতূহলও মহাজনের বেদবাক্যেই তৃপ্ত হয়। গর্গ বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী। তাঁর মনের দ্বন্দ্ব তাই একেবারে মুছে যায় না, কিন্তু বুদ্ধিমানরা বিশেষ পর্যায়ে এসে আত্মসমর্পণও করেন। এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে ব্যক্তিগত অথবা শ্রেণীগত লাভালাভের প্রশ্ন। গর্গের কাছে আরও বুদ্ধিমান দেবতারা সেই লাভালাভের চুলচেরা বিচার করে দিলে গর্গ অসহায় বোধ করতে থাকেন। বিষ্ণুকে আভূমি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানিয়ে আচ্ছন্নের মতো বেরিয়ে আসেন তিনি স্খলিত পদে।

বাইরে ঝলমল করছে এখন স্বর্গলোকের পার্বত্য প্রদেশ। শীতের প্রকোপ অনেকটা কম। হিমেল মিষ্টি বাতাসে অনেকটা সুস্থ বোধ করেন গর্গ। তাকিয়ে দেখেন, বিচিত্রবরণ বিষ্ণুবাগিচায় তাঁরই জন্য অপেক্ষা করছেন বিষ্ণুপাদ। গর্গকে দেখে স্মিতমুখে উঠে দাঁড়ান সেই আকাশরথ চালক। কাছে এসে বলেন,—ঋষি কি সব প্রশ্নের জবাব পেয়েছেন?

চমকে ওঠেন গর্গ। দেবতাদের বোঝা ভার। মনে হয়েছিল, বিষ্ণুপাদ বুঝি দেবশ্রেষ্ঠদের কার্যকলাপে কোথাও বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করেন, কিন্তু এখন

বোঝা গেল, গর্গের সঙ্গে আলাপ করে তাঁর মনের রহস্যলোকের সন্ধান নিয়ে কর্তব্যপরায়ণ বিষ্ণুপাদ তা বিষ্ণুকে জানিয়ে দেন। হয়ত বা বিষ্ণুপাদের পরামর্শেই অমন উচ্চ পদাধিকারী বিষ্ণু সামান্য ঋষি গর্গের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে রাজি হয়েছিলেন।

গর্গ এবার সাবধান হন। মৃদু হেসে বলেন,—আপনার উপকারের কথা কখনো ভুলব না। আপনার জন্যই আজ দেবদেব বিষ্ণুর পায়ের তলায় বসে জানলাম অনেক ঘুচিয়ে নিতে পারলাম আমার মনের দ্বন্দ্ব। হ্যাঁ, নিশ্চয় পেয়েছি আমার সব প্রশ্নের জবাব। অতঃপর যথানিযুক্ত তথা কর্ম।

বিষ্ণুপাদ গর্গকে নিয়ে অগ্রসর হলেন। আবার সেই অশান্ত ক্ষুব্ধ দুরন্ত অলকানন্দার পুল পেরিয়ে নির্বিঘ্ন নরপর্বতের প্রশস্ত এলাকায় এসে হালকা মনে হাঁটতে লাগলেন তাঁরা। পশুখাদ্যের জন্য পার্বত্য ঘাস পাতা বহন করে গন্ধর্বকন্যারা তাঁদের পাশ দিয়ে হাসিমুখে হেঁটে যায়। সেই তৃণঝাড়ের মধ্যে এক একটি ব্রহ্মকমলের মতো ফুটে আছে তাদের গোলাপী নিখুঁত মুখশ্রী। কেউ কেউ বিষ্ণুপাদকে দেখে হাসে। বিষ্ণুপাদ হাত তুলে প্রত্যুত্তর দেন।

গর্গ খুশি হয়ে বলেন,—সেই একই দৃশ্য। আমাদের শূরসেন সুজলা সুফলা কৃষিভূমি। মেয়েরা এমনি ঘাঘরা পরে কৃষিজাত পণ্য ঘরে আনে। নন্দব্রজের অধিকাংশই তৃণভূমি। গোপিনীরা সেখানে গোময়, দুগ্ধকলস আর বিচালি মাথায় পথ হাঁটে। জল ভরতে যায় যমুনা নদীতে। তবু এই স্বর্গে আর আমাদের মর্ত্যে কত প্রভেদ। এখানের নারীরা পর্বতকন্যা বলেই বুঝি এমন সুগঠনা ও সুন্দরী!

বিষ্ণুপাদ একদল গন্ধর্বকন্যার দিকে ফিরে তাকান। তারপর হেসে বলেন, —হ্যাঁ, ঋষি! আর্যাবর্ত-কন্যারা এমন তন্বী তড়িৎহরিণীর মতো নয়, গুরু নিতম্বের ভারে তাঁরা স্খলিতবসনা ও ধীরগামিনী। তা আপনারা তো নিতম্বিনীর প্রশংসায়ই পঞ্চমুখ।—বলে বিষ্ণুপাদ হাসেন।

গর্গ বিষ্ণুপাদের দিকে তাকিয়ে বলেন,—আপনি আত্মগোপনকারী বনবাসী। অথচ সব খবরই রাখেন দেখছি।

হাসেন বিষ্ণুপাদ।—সেটাই তো আমাদের ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব। আর্যাবর্তে কোথায় কে কেমনভাবে আছেন, কী করছেন, তার প্রতিটি খুঁটিনাটি সংবাদ এই স্বর্গলোকে প্রত্যহ নিয়মিত পৌঁছায়। ধর্মরাজ-যমদূতের প্রহরীদৃষ্টি স্বর্গমর্ত্য সর্বত্রই সমান সতর্ক।

—আপনারাও কি ধর্মরাজ যমের অধীন?— জানতে চান গর্গ।

—কতকাংশে তা তো বটেই। রক্ষীদল ধর্মরাজেরই অধীন। তবে শ্রেণীভেদে ও পদাধিকারবলে আমরা তাঁর কাছে বিশেষ ব্যবহার পেয়ে থাকি। দেবশ্রেষ্ঠদের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নিযুক্ত রক্ষীরা যমবাহিনীর অন্তর্গত হলেও আমরা নির্দেশ পাই নিজেদের নিয়োগকারী দেবপ্রধানদের কাছ থেকেই।

অবতরণ ক্ষেত্রে পৌঁছলে গর্গ দেখলেন অবতরণের সময় যে একাধিক দেবযান তিনি দেখে গেছলেন, তার কোনোটিই এখন নেই। বুঝলেন, সভায় আগত দেবপ্রধানরা আপনাপন শিবিরে প্রত্যাগমন করেছেন। দাঁড়িয়ে আছে শুধু দুএকটি ক্ষুদ্রকায় বিমান, যার একটিতে এবার তাঁরা আরোহণ করবেন।

আকাশযানে ওঠার আগে বিষ্ণুপাদ জানালেন, বর্তমানে তাঁদের গন্তব্য কনখল। সেখানে অবস্থানের পর রাত্রে ফিরে যাবেন শূরসেনে। কংসের চর-বাহিনী সতর্ক আছে। তাদের দৃষ্টি এড়ানোর জন্য রাত্রে সেখানে গুপ্তভাবে ফিরে যাওয়াই যুক্তিযুক্ত।

বিষ্ণুপাদ দেবযান চালু করলেন। পক্ষীযানের পক্ষতাড়নায় মেঘগর্জনের শব্দ এবং ঝটিকার সৃষ্টি হলে গর্গ বললেন,— আসার সময় আপনার রথে এমন শব্দ ও ঝড়ের সৃষ্টি হয়নি, অথচ মনে হচ্ছে না আমরা যান পরিবর্তন করেছি।

—আপনার নজরে কিছুই এড়িয়ে যায় না দেখছি! ঠিকই ধরেছেন। দেবযানের শব্দ প্রয়োজনে আমরা নিয়ন্ত্রিত করতে পারি। তবে এই ধাতব পক্ষীর পক্ষতাড়নায় বাতাসে তখনও যথারীতি আলোড়ন হয়েছিল, আপনি খেয়াল করেন নি। স্বর্গলোক আমাদেরই অধিকৃত অঞ্চল। তাই শব্দ সৃষ্টিতে ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। কিন্তু কংসের রাজ্যে শব্দ সৃষ্টি করে নিশুত রাতে অরণ্যবাসী জীবদের উচ্চকিত করে অসুবিধার কারণ ঘটাই না আমরা। তখন শব্দনিয়ন্ত্রণ যন্ত্র কাজ করে।

কথা বলতে বলতে বিষ্ণুপাদ তাঁর ধাতবপক্ষীকে কখন যে আকাশমার্গে উত্থিত করালেন, গর্গ তা টেরও পেলেন না। শুধু সামনে তাকিয়ে দেখলেন, রজতশুভ্র পর্বতের চূড়া এবং নিম্নপর্বতের তরঙ্গমালার ওপর তাঁরা এখন ভেসে চলেছেন। রাত্রে আসার সময় এমনভাবে নিচের দৃশ্য দেখার সুযোগ হয়নি তাঁর। তিনি বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে দুচোখ ভরে সেই দৃশ্যাবলী পান করতে লাগলেন।

কয়েকটা দিন চিন্তায় চিন্তায় কেটে গেল। নন্দ গোপ কোনো কাজেই মন বসাতে পারেন না। শকটচালক মথুরার পথ থেকে একাকী এসেছে। যেন একই দেহে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক মানুষ। নন্দের পায়ে মুখ থুবড়ে পড়ে কিছুক্ষণ কেঁদে ভাসালো। শেষে নন্দের উদ্বিগ্ন প্রশ্ন আর ধমকে যা বলল, সেটা এক অবিশ্বাস্য প্রেতে-পাওয়া কাহিনী।

গভীর অন্ধকার রাত্রে ঘন জঙ্গলের বুক চিরে একটি উড়ন্ত উজ্জ্বল বিন্দুকে গোশকটের দিকে এগিয়ে আসতে দেখে শকটচালক ভয়ে মূর্ছা যায়। যতদূর মনে পড়ে, জ্ঞান হারাবার আগে সে সওয়ারী ঠাকুরকে বলেছিল,—সাবধান ঠাকুর! শেরের চোখ জ্বলছে। তেনারা এদিকেই আসছেন। কিন্তু ঠাকুর তাতে ভয় না পেয়ে গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ালেন। তারপর ঘুমঘোর অবস্থায় গাড়োয়ান একটা ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখল। এখনো সেকথা ভাবলে গায়ের রোম খাড়া হয়ে ওঠে।

শকটচালক ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছিল। নন্দ ধমক দিয়ে বলেছেন,—আরে বুদ্ধু! তুই তো বেঁচে গেছিস। এখন ঠিক করে বল্, কী হয়েছিল।

—হামি কিছু জানি না সরকার! হামি তো আর আঁখ খুললাম না।

বস্তুত এরপর শকটচালক ভয়ে মুহ্যমান অবস্থায় স্বাভাবিক চৈতন্য হারিয়ে ফেলে। আধোঘুম আধোজাগ্রত অবস্থায় তার মনে হয়, সে যেন একটা দুঃস্বপ্ন দেখছে। শুনতে পায়, সেই নিশীথ রাতের প্রেতেরা ঠাকুরের সঙ্গে কোনো দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বলছিলেন।

নন্দ বুঝলেন, গর্গের সঙ্গে দেবতারা নিশ্চয় সংস্কৃতে বাক্যালাপ করছিলেন। বসুদেবের কাছে নন্দ শুনেছেন, দেবভাষার নাম সংস্কৃত।

রহস্যভেদী গোয়েন্দার মতো ভেদী হয়ে উঠলেন নন্দ। প্রচণ্ড এক ধমক দিয়ে গাড়োয়ানকে বললেন,—তারপর কী হল? ঠিক ঠিক ভেবেচিন্তে বল!

চালক কাঁদতে কাঁপতে পরবর্তী ঘটনা বলে গেল। তার মনে হয়েছিল, ঠাকুর সেই যমদূতের সঙ্গে জঙ্গলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন আর মশ্ মশ্ শব্দ তুলে কারা যেন আসছে গাড়ির কাছে। এরপর তার আর কিছু মনে নেই।

তারপর স্বপ্নে দেখল, অদ্ভুত দেখতে চারটে মানুষ তার মাথাটা একটা হাঁড়ি-কাঠে আটকে তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে ছায়ার মতো। চারদিকে চাপ চাপ অন্ধকার আর ঝিঁঝির ডাক।

একজন বলল,—আদেশ আসতে দেরি হচ্ছে কেন এতো? গাড়োয়ানের মনে হল, তার সম্বন্ধেই কথা হচ্ছিল।

এই সময় আর একজন এসে বললে,—আদেশ হয়েছে, ওকে ছেড়ে দাও। গাড়িতে তুলে ব্রজপুরের কাছে নিয়ে গিয়ে রেখে এসো।

ওরা তখন গাড়োয়ানের গর্দান থেকে কাঠের খিল সরিয়ে তাকে তুলে ধরল। বাপ্ স, তাদের হাত যেন বরফের মতো ঠাণ্ডা। গাড়োয়ানের মুখ দিয়ে তখন স্বর বের হয় না। দেহটা খসে পড়তে চায়।

একজন ঠাস করে তার গালে একটা চড় বসালো। মনে হল, কাঠের হাত দিয়ে কে যেন চোয়ালটা ভেঙে দিচ্ছে। তারপর গাড়োয়ান যে ভাষা বোঝে সেই ভাষায় লোকটা বললে, যা! তোর সওয়ারীর জন্যে বেঁচে গেলি আজ। কিন্তু যদি আজ রাতের কথা কারুকে কখনো বলিস তবে আর প্রাণ নিয়ে বাঁচতে পারবি না। তোকে যমের বাড়ি পাঠাবো। খবরদার, কোনো কথা কারোকে বলাব না। আমরা সব জানতে পারি। কারোকে দেখাবিও না কোথা-থেকে তোকে আমরা তুলে আনি। বুঝেছিস।

—সরকার! গাড়োয়ান আবার ঠক্ ঠক্ করে নন্দর পায়ে মাথা ঠোকে,—দয়া করো সরকার! ঠাকুরকে ওরা কোথায় নিয়ে গেল, আমি কিছু জানি না। শুধু তোমাকেই বলছি। আর কেউ টের পেলে মহা বিপদে পড়ব, আমি। আমার জ্ঞান হলে দেখলুম, আকাশে আলো ফুটেছে আর ব্রজের পথে আমি আমার গাড়িতে শুয়ে আছি।

সব শুনে নন্দ আসপাশে তাকিয়ে দেখে নিলেন, তাঁদের কথা আর কেউ শুনেছে কিনা। না কেউ সেদিকে নেই। গাড়োয়ানকে নিয়ে কারও কৌতূহলও নেই, কেননা গত রাত্রে সে যে ঋষিকে নিয়ে কোথাও গেছে, এ খবর নন্দ ব্যতীত দ্বিতীয় প্রাণী জানে না।

গাড়োয়ান কাঁপছিল হি হি করে। নন্দ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন,—কাঁদিস কেন? তোকে কি আমি দুষেছি। তুই যে ফিরে অসেতে পেরেছিস, এটাই ঠাকুরের দয়া। যা, ঘরে যা। এসব কথা তোর জাইয়াকেও কখনো বলিস না। মেয়ে মানুষের পেটে কথা থাকে না। তোর গাড়ির বলদেও যদি জানতে পারে, আমাকে যা বললি, তা অন্য কারুকে বলেছিস, তবে আর কেউ তোকে বাঁচাতে পারবে না। দেবতাদের কোপে পড়বি। তারা ঠাকুরকে নিয়ে গেছে। তোকেও নিয়ে যাবে। খুব সাবধান!

থর থর কম্পমান গাড়োয়ানটি পড়িমড়ি করে বিদায় নিয়েছিল। আর গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসেছিলেন গোপরাজ নন্দ।

ঋষি গর্গের কথা গোকুলে নন্দ ছাড়া আর কেউ জানে না। জানে না নন্দরাণী যশোদাও। এটাই ছিল বসুদেবের নির্দেশ। বসুদেবের সঙ্গে শেষ সাক্ষাতের কথা মনে পড়ে যায় নন্দর। মথুরার পথে যমুনাতীরে একান্ত সাক্ষাৎ।

কংসের কর নিয়ে সম্প্রতি তিনি যখন মথুরায় যান সেই তখনই বসুদেবের সঙ্গে তাঁর শেষ সাক্ষাৎকার ঘটে। কর চুকিয়ে লোকজন নিয়ে যমুনার তীরে ফিরে আসছেন নন্দ, ঠিক সেই সময় তাঁর গো-শকট থামিয়ে পাগড়ীপরা এক মথুরাবাসী এসে কানে কানে জানালো, দূরের ঐ সাধুর কুটীরে বসুদেব গোপরাজের জন্য অপেক্ষা করছেন, নন্দ যেন একাকী সেখানে যান।

গাড়ি থেকে নেমে নন্দ লোকটির সঙ্গে সাধুর কুটীরের দিকে পা বাড়ান। পথে ভাবেন, আশ্চর্য বসুদেবের সংবাদ সংগ্রহের ক্ষমতা। নন্দ কখন মথুরায় আসেন, কখন যান, সবই বসুদেব জানতে পারেন, আর দেখা করেন এসে তাঁর সঙ্গে।

কোন্ ছেলেবেলা দুজনে ছিলেন খেলার সাথী আর টোলের সহপাঠী। তা সে কথা কি কোনো রাজপুরুষ মনে রাখে? নন্দ তো সামান্য গোয়ালা। বাপের আমল থেকে নিজেদের গো-পাল আর গোপ সম্প্রদায় নিয়ে যাযাবরের মতো এ জায়গা সে জায়গায় কুটীর বানিয়ে থেকেছেন। সেই নন্দকে বসুদেবই একদিন খুঁজে বার করলেন ব্রজপুরের অরণ্যে। নন্দ তখন তাঁর দলবল নিয়ে কাঠ ও গবাদি পশুর খাদ্য সংগ্রহ করে বেড়াচ্ছিলেন।

হঠাৎ দুজন অশ্বারোহী এসে তাঁদের পথ আগলে দাঁড়াল। পরণে রাজবেশ। কংসের অনুচর ভেবে নন্দর সাথীরা ভয়ে গা ঢাকা দিল জঙ্গলের মধ্যে। নন্দ

তা পারলেন না। হয়ত রাজপুরুষরা এখনই পাকড়াও করে চালান দেবেন, ফাঁকি দিয়ে বনসম্পদ অপহরণের অভিযোগে।

নন্দ অপরাধীর মতো করজোড়ে দুই ঘোড়-সওয়ারের মাঝে আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলেন।

সাদা ঘোড়ার সওয়ার ঘোড়া থেকে নেমে নন্দর কাছে এগিয়ে এসেই এক অদ্ভুত কাণ্ড করল। সে আবেগভরে নন্দকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল,—আরে, আমাকে চিনতে পারছ না, নন্দ? আমি তোমার সেই ছেলেবেলার বন্ধু, বসুদেব!

নন্দ অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। শৈশবের সাথী, আর এই রাজপুরুষ বসুদেব, মাঝে কত পরিবর্তন ঘটে গেছে। কখনো বসুদেব তো তাঁর কোনো খবর নেননি। রাজসভায় কর দিতে গিয়ে এই রাজপুরুষকে নন্দ বহুবারই দেখেছেন, কিন্তু চিনতে পারেন নি। তিনিও নন্দকে চেনার লক্ষণ প্রকাশ করেন নি। আজ হঠাৎ একেবারে বুকে জড়িয়ে বন্ধু বলে পরিচয় দিচ্ছেন, এ যে বিশ্বাসই হয় না। নন্দ জানেন, কংসের বহু নিষ্ঠুর অনুচর অত্যাচারের আগে তার শিকারকে নিয়ে এইভাবেই খেলা করে। নন্দ ভয়ে কাঁপতে থাকেন।

রাজপুরুষটি বলেন,—বুঝেছি! অত্যাচারী কংসর সেপাই ভেবে ভয় পাচ্ছ তুমি। কিন্তু আমি সেই যদুনাথ শূরের ছেলে। আমার মা ছিলেন ভোজবংশের মেয়ে। তোমার মা আমাদের ঘরে দুধ বেচতে যেত; মনে পড়ে না?

মনে পড়ে বৈ কি। কিন্তু কথা সরে না দীন গোয়ালাপুত্র নন্দের মুখে। তিনি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন।

বসুদেব বিব্রত বোধ করেন।

বলেন,—সেই যে তোমার বাবা একবার উগ্রসেনের কর মিটিয়ে দিতে না পারায় রাজসভায় প্রহৃত হচ্ছিলেন, তখন তোমার মা তোমার হাত ধরে আমাদের প্রাসাদে ছুটে এলেন। তুমি কাঁদছিলে। আমি মা ও বাবাকে বলতে, বাবা গিয়ে তোমার বাবাকে ছাড়িয়ে আনলেন। তা এর মধ্যেই তুমি তোমার সেই উপকারী বন্ধুকে ভুলে গেলে!

নন্দ ধপ করে মাটিতে বসে বসুদেবের পা জড়িয়ে কেঁদে ফেলেন সেদিন বলেন,—আমি সামান্য গোয়ালা। আপনাকে বন্ধু ডাকার সাহস আমার নেই। আপনাদের কথা কি আমরা ভুলতে পারি। আপনি আমাকে লজ্জা দিচ্ছেন। বলুন, কি আদেশ আমার ওপর।

নন্দকে অবাক করে তাঁর দুই বাহু ধরে আবার তুলে নিলেন বসুদেব, বললেন,—বন্ধু চিরকালই বন্ধু থাকে। তার মধ্যে কি ছোটবড় প্রভেদ হয় ভাই। ভাই রাজা হলে কি ভাইকে ফেলে দেয়? ভয় কোরো না। আমাকে বন্ধুই ডেকো। আর আমাকে 'আপনি' 'আজ্ঞে' করারও কোনো কারণ নেই।—বলে সঙ্গীর দিকে হাত বাড়ালে বসুদেবের সঙ্গী একটা সুন্দর নক্সাকাটা থলি তাঁর হাতে এগিয়ে দেন। বসুদেব সেটা নন্দের হাতে দিয়ে বলেন,—এতে একশত স্বর্ণমুদ্রা আছে। তোমার বিবাহে তো বলোনি। আমারও কিছু দেওয়া হয়নি। এটা তুমি যশোরাণীকে আমার নাম করে দিও।

নন্দর হাত থরথর করে কাঁপে। একশ স্বর্ণমুদ্রা! সে কি এক রাতে রাজা হয়ে যাবে?

বলে,—না! না! আপনি···

এবার জোর ধমক দেন বসুদেব,– ফের আপনি? বুঝেছি, তুমি আমার বন্ধুত্ব চাও না। তুমি কংসের দাস।

নন্দ যেন নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। কংস রাজার সভাসদ্ তাঁকে কংসের দাস বলে গাল দিচ্ছেন! তবে কি বসুদেব কংসের দাসত্ব স্বীকার করেন না?

নন্দ তাঁর জাতসুলভ ব্যবহারই করেন। কাঁদতে কাঁদতে ও কাঁপতে কাঁপতে বলেন,—না! না! এই আমি তোমার উপহার নিলাম, বন্ধু। আমার অপরাধ নিও না।

বসুদেব খুশি হয়ে বললেন,— তবে এসো! আমরা ঐ কদম্ব বৃক্ষের তলায় গিয়ে বসি। এত কাল পরে দেখা। দুটো সুখদুঃখের কথা বলতে বড় সাধ হয়। —সঙ্গীর দিকে ফিরে বলেন,—তুমি এখানেই ঘোড়া দুটোকে বিশ্রাম করাও, সুরথ। আর দেখো, এদিকে যেন কেউ না এসে পড়ে। তেমন বুঝলে সঙ্কেত কোরো।

সুরথ মাথা নেড়ে সম্মতি জানালে বসুদেব নন্দের কাঁধে হাত দিয়ে তাঁকে অরণ্যের গভীরে টেনে নিয়ে যান।

সেদিন বসুদেবের সঙ্গে নন্দের খুবই গুরুত্বপূর্ণ গোপন কথোপকথন হয়েছিল। বসুদেব বুঝিয়ে বলেছিলেন মথুরার রাজনৈতিক অবস্থার কথা। বলেছিলেন, কংসের অত্যাচারে ছেলে বুড়ো সবাই বড় পীড়িত। তাদের উদ্ধার করতে হবে। মথুরার ভালো ভালো দয়ালু নেতারা বসুদেবকে

এই কাজে নিযুক্ত করেছেন'। একথা জানতে পেরে কংস রেগে গিয়ে বসুদেবের সদ্যোজাত শিশুদের অবাধে হত্যা করছেন। লোকটা নরাধম পাপিষ্ঠ পশু হয়ে গেছে।

নন্দ বোকাসোকা মানুষ। ফস্ করে প্রশ্ন করে বসে,—কিন্তু তুমি তো ভাই রাজসভাতেই বসো এখনো। রাজপুরুষের মতোই ক্ষমতা ধারণ করো! রাজা কংস তোমাকে কারাগারে বন্ধ করেন নি তো।

বসুদেব উত্তরে বলেন,—ওটা কংসব একটা চাল। আমার রাণী দেবকী তো তার খুড়তুতো বোন। আমাদের বন্দী করলে কংসর যে আরও নিন্দে হবে। তাছাড়া কংস ছিল আমার বন্ধু, দেবকীও ভালোবাসত তার ভাইকে। কংসর যাতে নিন্দে না হয়, আমাদেরও জীবন রক্ষা পায়, আমি তেমনি এক রফা করলাম তার সঙ্গে। কংসকে বললাম, আমি তোমার বন্ধু, দেবকী বোন। আমরা তো তোমার কোনো ক্ষতি করব না। দেবকী বা আমাকে মেরে কি করবে। তার চেয়ে তোমাব যা দুর্ভাবনা,—আমাদের সন্তান বড় হয়ে তোমার সিংহাসন দাবি করবে, সেই ভয় থেকে নিজেকে তুমি রক্ষা করো। কংসর কাছে প্রতিজ্ঞা করলাম, দেবকীর ছেলে জন্মালে কংসর হাতে তাদের তুলে দেব আমি নিজেই। তাই কংস খুশি হয়ে আমাকে আমার স্বপদেই বহাল রাখল। বন্দী করল না। কিন্তু আমাদের পেছনে সে গুপ্তচর লাগিয়ে রেখেছে। আর আমার পর পর ছটা ছেলেকেই হত্যা করেছে।

নন্দ গভীর দুঃখের সঙ্গে মাথায় হাত দিয়ে বসে বললেন,—হায়, রাজসুখে কত জ্বালা। বাপ মা হয়ে তোমরা শিশুদের তুলে দিলে কংসর হাতে! কী ভয়ঙ্কর কথা!

—রাজপুরুষ হলে অনেক ত্যাগ করতে হয়, নন্দ। আমাদের যে ভাবতে হয় সবার মঙ্গলের কথা। ছটা ছেলে গেছে, আবার হবে। কিন্তু কংসকে শেষ করতে না পারলে, শূরসেনের কত শিশুকে সে এমনিভাবে হত্যা করবে, তার কি ঠিক আছে। কে না কোন্ গণৎকার মুনি বলল, বসুদেবের ছেলে বড় হয়ে তোমাকে হত্যা করবে, তাই শুনে সে দেবকীকেই খুন করতে চাইল। এইভাবে যদি কোনোদিন কেউ বলে নন্দ গোপের ছেলে তোমাকে মারবে, তাহলে সে হয়ত তোমার সন্তানকেও বলি দেবে। আজ দেশের বড় দুর্দিন রে ভাই। আমাদের একসঙ্গে জোট বেঁধে রুখে দাঁড়াতে হবে অত্যাচারী কংসের বিরুদ্ধে। তোমার সাহায্য, ভেবে দেখলাম, অনেক কাজে লাগবে।

—আ—আমার সাহায্য ! নন্দ অবিশ্বাসী চোখে তাকায়।

মাথা নেড়ে বসুদেব বললেন,—হ্যাঁ নন্দ, তোমারই সাহায্য। তুমি কি শোননি, দৈত্যরাজ রাবণের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার সময় রঘুবীরের সেতু বেঁধে দেয় সামান্য বনচারীতে? নিজেকে কখনো সামান্য ভেবো না। তোমার একটি সুসংগঠিত মল্লবীরের দল আছে। তাছাড়া তুমি নিরীহ গোয়ালা দলপতি। তোমার সঙ্গে আমার গোপন যোগাযোগের ব্যাপারে কংসের বা তার চরেদের মনে সামান্য সন্দেহও জাগবে না। তাই তুমিই আমাকে আজ অপুত্রক হওয়ার যন্ত্রণা থেকে বাঁচাতে পারো।—নন্দর দুহাত জড়িয়ে ধরে সাশ্রু নেত্রে বসুদেব বললেন,—ভাই, তুমি তো জানো, নিঃসন্তানের নরকেও গতি হয় না। অন্তত আমার একটি সন্তানকে তোমার গোপালদের মধ্যে লুকিয়ে মানুষ করো। কোনদিন সুযোগ এলে তাকে ফিরিয়ে দিও আমার হাতে। আমার আর এক মহিষী আছেন, রোহিণী। সে অন্তঃসত্ত্বা। তাকে আমি তোমার গৃহে রেখে আসব। লোকে জানবে, সে তোমারই রক্ষিত রাণী। তার গর্ভের সন্তান তোমার সন্তান বলেই পরিচিত হবে। বেঁচে যাবে সে কংসের কোপ থেকে। এজন্য তোমাকে আমি অর্থ দেব। আর যদি কখনো আমার ছেলে রাজা হয়, তবে তুমিও তাদের পালক পিতা হিসেবে রাজপদ লাভ করবে। এখন থেকে তাই তোমাকে অনেক বুদ্ধি বিবেচনা ও সাহস নিয়ে ধীরভাবে কাজ করতে হবে। পারবে না? যখনই দরকার, আমি তোমার পাশে থাকব। আমার ছেলে যতদিন তোমার ঘরে থাকবে, জেনো, দেবতারা তোমার গো-কুল রক্ষা করবেন।

—দেবতারা !

—হ্যাঁ। তাঁরাও কংসকে চান না। তাঁরা আমাদেরই দলে।

নন্দ ভয়ে রাজি হচ্ছিলেন না। অবশেষে ক্ষুব্ধ হয়ে বসুদেব বলেছিলেন, —আমি আজ চললুম, নন্দ। গোপনে রোহিণীকে পাঠিয়ে দেব। কথামত কাজ কোরো, তুমিও একদিন রাজপুরুষ হবে। আর যদি ভয়ে সরে যাও, তবে কংসের হাত থেকে বাঁচতে পারবে না। আমিও বাঁচাতে পারব না। দেবতারাও ক্ষুব্ধ হবেন। এতোগুলি শত্রু রাখার চেয়ে বন্ধু বসুদেব ও দেবতাদের আশ্রয়ে থাকাই তোমার মঙ্গল।—এই বলে হাঁটতে লাগলেন তিনি।

কিছুক্ষণ হাঁটার পর নন্দ ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলে বলেছিলেন,—আমরা ভীতু বোকাসোকা মানুষ, দীন দরিদ্র। রাজার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সাহস

নেই। আজ আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে এসে তুমি আমাকে আরও বিপদগ্রস্ত করলে।

—বিপদের তো এই সবে শুরু।—এবার ক্রূর কণ্ঠে প্রত্যুত্তর দিলেন বসুদেব। —হয় বসুদেবের বন্ধুত্ব, নয়··তাছাড়া একটা শিশুর জীবনরক্ষা করা কি তোমার ধর্ম নয়? তুমিও তো পিতা।

—আমি এখনো নিঃসন্তান।

—তাহলে? তুমি একটা টাটকা ছেলের বাবা হবে।

নন্দ আর কিছুই ভাবতে পারেন নি, ভয় ও অর্থলাভের প্রলোভন, চাইকি ভবিষ্যতে রাজপদ লাভের দুর্লভ সৌভাগ্য—এইসব তাঁর মাথায় তালগোল পাকিয়ে গেল। তিনি বলে ফেললেন,—আমি রাজি, বসু···

বসুদেব আবার তাকে বুকে জড়িয়ে বললেন,—থামলে কেন, বলো।

—আমি রাজি বন্ধু, বসুদেব!

—ঠিক আছে নন্দ। স্বর্ণমুদ্রার অভাব হবে না তোমার। প্রয়োজন হলে রোহিণীর জন্য আর একটা ঘর বানিয়ে নিও। যশোদাকে আমাব কথা বেলো না। বলো, বিপদগ্রস্ত এক বন্ধু-পত্নীর দায়িত্ব নিয়েছ তুমি। লোকে জানুক, সে তোমার পত্নী।

—আমার পত্নী!

—আরে, তাতে কি। জীবন রক্ষার্থে মিথ্যে পরিচয় দেওয়ায় দোষ নেই। নগরের জন্য গ্রাম ছাড়বে, দেশের জন্যে নগর, নিজের জন্যে সবকিছু, এই তো শাস্ত্রের বচন। রোহিণী আমার সন্তানের জন্য সেটুকু মেনে নেবে। তুমি যেমন বিবেচনা করবে, তার সঙ্গে তেমনি ব্যবহার করলেই আমি খুশি। প্রয়োজনে সংবাদ দেব। আমাদের গোপনে সাক্ষাৎ হবে। মনে রেখো, তোমার কোনো কাজই আমার কাছে গোপন থাকবে না।

বসুদেব তাঁর সাদা ঘোড়ায় উঠে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলে পথের ধুলো লেগে নন্দের চোখে জল এলো। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি একাকী যমুনার তীর ধরে ব্রজের দিকে হাঁটতে লাগলেন। এতোকাল পর এক রাজপুরুষ বন্ধুর দর্শনে তাঁর জীবনটাই পাল্টে যেতে শুরু করল। কিন্তু তিনি তো শান্তিতেই থাকতে চেয়েছিলেন। রাজায় রাজায় যুদ্ধ, মাঝে উলুখড়ের মতো বে-ঘোরে প্রাণটাই না যায়।

সব কথা মনে পড়ে নন্দ গোপের।

সেই শুরু।

তারপর আরও কয়েকবার দেখা হয়েছে। সেবার সাক্ষাৎ কংসকে কর দিয়ে ফেরার পথে।

বসুদেবের দূত তাঁকে সেই সাধুর কুটীরে নিয়ে গেল।

সেখানে নন্দের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন এক সৌম্যদর্শন রক্তগেরুয়াধারী পুরুষ। নন্দ তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলে তিনি দুহাত তুলে হাসিমুখে আশীর্বাদ করলেন।

বসুদেব বললেন,—তোমার বহু সৌভাগ্য, নন্দ। আজ যদুকুল-পুরোহিত ঋষি গর্গ তোমাকে দর্শন দিলেন। কোনো গোপালকের ভাগ্যে এমন সুযোগ কদাচিৎ আসতে পারে।

নন্দ যুক্ত করে তাঁদের পায়ের কাছে উবু হয়ে বসলেন। আগের মত বসুদেব এখন আর নন্দকে বুকে টেনে নেন না। মুখে বন্ধু বললেও ব্যবহারে তাঁরা দুজনেই রাজা প্রজার সম্পর্ক নিখুঁত বজায় রেখেই চলেন। নন্দ এখন বরং বসুদেবের গোলামে পরিণত হয়েছেন।

বসুদেবই আবার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বলেন,—জরুরী দরকার তোমার সঙ্গে, নন্দ। যশোদাকে দেখার জন্য যে ধাত্রী প্রেরণ করেছিলাম তার কাছে সংবাদ পেলাম তোমার সন্তান হবে ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে।—বলে গর্গের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন,—গুরুদেব, আপনি তো রোহিণীপুত্রের বিষয় গণনা করেছেন, যশোদানন্দন সম্পর্কে কিছু বলবেন কি?

গর্গ চক্ষু নিমীলিত করে বললেন,—মহা ভাগ্যবান, বীর ও রাজচক্রবর্তী লক্ষণ নিয়ে একটি শিশুপুত্র জন্মগ্রহণ করবে। ইনি বহুজন্মের পুণ্যে স্বয়ং বিষ্ণুর অংশে জন্ম লাভ করবেন।

নন্দ কি বুঝলেন তিনিই জানেন। আনন্দে মুখ তাঁর আরক্ত হল। ঢিপ করে আরও একবার প্রণাম করে আবার করজোড়ে সেইভাবে বসে রইলেন বসুদেবের আদেশের অপেক্ষায়।

বসুদেব এদিনও এক থলি স্বর্ণমুদ্রা এগিয়ে দিয়ে বললেন,—শুনলাম, কংসের সম্পূর্ণ কর তুমি মিটিয়ে দিতে পারো নি। এর থেকে কর মিটিয়ে বাকি অর্থে রোহিণী ও যশোদার পুত্রদের জন্য উৎসব কোরো। হ্যাঁ, এই ভাদ্র মাসেই অষ্টমীর অর্ধরাত্রের মধ্যে যমুনা পার হয়ে মথুরায় আসবে, কেননা বকেয়া খাজনা গ্রহণের দিন নবমীর পরই স্থির হয়েছে। সুতরাং প্রাতঃকালে তোমাকে রাজদ্বারে উপস্থিত হতে হবে।

নন্দ অসহায়ের মত আবেদন করেছিলেন,—কিন্তু, ঠাকুর যে বললেন, ঐ রাতেই যশোদা প্রসব করবে। তাকে ফেলে আমি গাঁয়ের সব মানুষ নিয়ে চলে আসব? যদি কোনো দরকার হয়?

বসুদেব হেসে বললেন,—সেকথা আমিই কি না ভেবেছি। তবেআর ধাত্রীকে ডেকে, গুরুদেবকে ধরে এতো হিসেব গণনা করছি কেন? তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না। ধাত্রী যোগনিদ্রা যথাসময়ে উপস্থিত থাকবেন তোমার পত্নীর সূতিকাঘরে। সে সব দায়িত্ব আমার ওপর ছেড়ে দাও। তুমি কিন্তু অবশ্যই সন্ধ্যার আগে তোমার বলশালী অনুচরদের নিয়ে মধ্যরাতের মধ্যেই যমুনার তীরে হাজির হবে। পরদিন খাজনা জমা না পড়লে কংসের হাতে আর নিস্তার নেই। বুঝেছ।

নন্দ বসুদেবের সামনে বড় অসহায় আর দীন বোধ করেন। প্রতিবাদ করার সাহস হয় না। সম্মতি জানিয়ে ফিরে আসেন তিনি এবং অক্ষরে অক্ষরে বসুদেবের আদেশও পালন করেন।

বসুদেব অবশ্য মিথ্যে আশ্বাস দেন নি। ভাদ্রমাসে কংসের কর মিটিয়ে ব্রজে প্রত্যাবর্তন করতে ব্রজবাসী বালক ও গোপিনীরা দৌড়ে এসে তাঁদের ঘিরে ধরে সুর করে গান গাইতে শুরু করে। যেন এক মহোৎসব। বন্ধু সুনন্দের জায়া, নন্দ যাকে ভাবী বলে ডাকেন, স্থূলদেহী সেই গোপিনী বিভিন্ন বিভঙ্গ প্রদর্শন করে প্রথমে হর্ষ প্রকাশ করে তারপর নন্দর হাত ধরে তাঁকে একেবারে যশোদার আঁতুড়ে ঘরে টেনে এনে বলে,—আগে বকশিস দাও, তবে, ছেলের মুখ দেখতে দেব।

নন্দ আনন্দে আত্মহারা। একটা গোটা স্বর্ণমুদ্রা ছুঁড়ে দিয়ে বলেন,—তোমরা সবাই ভাগাভাগি করে নিও। কেমন ছেলে হয়েছে গো ভাবী?

সুনন্দজায়া চোখ মটকে ভ্রূ কাঁপিয়ে বলে,—আকাশপানা রঙ। ছেলে তোমার বাপু কালো হবে। গোরা গোপালদের মাঝে কালো পুত।

নন্দের বিশ্বাসই হয় না, বলেন,—পথটা ছাড়ো দিকি, নিজের চক্ষে দেখি।

—দেখো। তা হোলই বা কালা গোপাল, তুমি তো রাজা গো। তোমার এক ছেলে সোনার বরণ। অন্য ছেলে নীলা। গেঁজে মোহর। তোমাকে আর পায় কে।

সকলেই খুশি হয়ে হাসে। নন্দের বৃদ্ধি মানেই গোপকুলের শ্রীবৃদ্ধি।

গোপ-সমাজে, যাযাবর গোপেদের রাজত্বে, সব সম্পত্তিই সবাই প্রাপ্যমত ভাগ করে পায়। হিংসে, রেশারেশির বালাই নেই।

নন্দকে রেখে তারা কল্‌কল্‌ করতে করতে দূরে সরে যায়। নন্দ চটের পর্দা ঠেলে মাথা নিচু করে খড়ে-ছাওয়া আঁতুড় ঘরে প্রবেশ করেন।

—যশো! আমি এসেছি। কৈ, আমার ছেলে দেখা।

যশোদার ভারি স্তনের আড়ালে শিশুপুত্র তাঁর নজরে আসে না।

যশোদা স্তন সরিয়ে ছেলে দেখান। বস্তুতই তার গায়ের রঙ কালচে নীল। গোপকুলের দেবতা ইন্দ্রের গায়ের রঙও অনেকটা এই রকমই। ভারি আশ্চর্য হন নন্দ। মনে পড়ে, ঋষি গর্গ ঠাকুর বলেছিলেন, ছেলে হবে স্বয়ং বিষ্ণুর অংশ। এ যে দেখি, সত্যিই তাই।

যশোদাকে নন্দ বলেন,—ওগো, এ আমাদের ঘরে দেবতার ছেলে। একে কখনো অনাদর কোরোনি।

যশোদা ক্ষুব্ধ হয়ে বলেন,— আহা! ছেলে দেখে কি ভীমরতি হল নাকি তোমার। দেব্‌তার ছেলে আবার কি কথা। আমি কি তেমনি মেয়েমানুষ।

নন্দ তাঁর ভুল বুঝতে পেরে লজ্জিত হন। বস্তুত, এমন কথা বলা উচিত হয়নি। মুনি ঋষি আর দেবতারা বড় ঘরের আর রাজরাণীদের সঙ্গে মেশামেশি করে ছেলের জন্ম দেন। লোকে তাই নিয়ে বলাবলি করে। বড় ঘরে যাই হোক, গোপদের সমাজে এসব ভালো চোখে দেখে না কেউ। নিন্দে বান্দার গল্প চালু হয়। যা করবে করো, নিজের সম্প্রদায়ের মধ্যে করো, কেউ তো বাধা দিচ্ছে না। আন্‌জাতের পুরুষে নজর যে দল ভাঙায়, ঘর ভাঙায়।

যশোদা চু চু করে ছেলেকে ভোলান। চেষ্টা করেন মুখে দুধ ধরাতে। কপালের ঘাম কাঁধের গামছায় মুছতে মুছতে নন্দ তাঁর দালান বাড়ির দিকে এগোন। দেখেন, দালানের থাম ধরে উদাস নেত্রে দাঁড়িয়ে আছেন রোহিণী। বুকে সেই স্বর্ণকান্তি হৃষ্টপুষ্ট শিশু। মায়া হয় নন্দর। আহা, স্বামীকে ছেড়ে কোথায় পড়ে আছেন এই সুন্দরী রমণী। মনে মনে বলেন, সবই কপাল। তারপর মাথা নিচু করে রোহিণীর পাশ কাটিয়ে ভেতরে যান স্নান করতে। আঁতুড় না তুলে অন্দর-মহলে যশোদা ঢুকবেন না।

এর পরের সাক্ষাৎ-ই এ পর্যায়ের শেষ সাক্ষাৎ।

নতুন আদেশ আসে বসুদেবের কাছ থেকে। যদুকুল-পুরোহিত গর্গ যাবেন নন্দালয়ে। তাঁকে সাধারণ ব্রাহ্মণ বলে গোপেদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে

হবে নন্দকে। তিনি নন্দালয়ে গিয়ে রোহিণীপুত্র আর যশোদাপুত্রের নামকরণ করবেন। করবেন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। একটু বড় হয়ে ছেলেরা তাঁর কাছেই শিক্ষা লাভ করবে। তিনরাত্রি নন্দালয়ে কাটিয়ে রাতের অন্ধকারে ফিরে আসবেন গর্গ। তাঁর আদেশমত সব কিছু করতে হবে নন্দকে।

নন্দ মনে মনে ভেবে দেখেন, কোথাও কোনো ত্রুটি ঘটেছে কিনা। তারপর নিজের মনেই আশ্বস্তভাবে মাথা নাড়েন। না, যাবার সময় ঠাকুর তাঁকে ও যশোদাকে সস্নেহে আশীর্বাদই করে গেছেন। বলেছেন,—এবার তোর সাধ মিটিয়ে উৎসব আনন্দে যোগ দিতে পারলাম না বলে মনে দুঃখু রাখিস না, মা। নিশ্চয় পরে আবার তোদের সঙ্গে মিলব। তোর ছেলের জগতজোড়া নাম হবে। সবাই তাকে রাজার সমাদর করবে। তুই ভাগ্যবতী।

যশোদা সরল গ্রাম্য বধূ। বিদায়কালে বুকে তাঁর দরদ উছলে পড়ে। গর্গের চোখও ছলছল করে। মানুষগুলোকে ভারি ভালো লেগেছিল তাঁর। কারো প্রতি ক্রোধ হিংসা জিঘাংসা নেই। দুনিয়ার সব কিছুই এদের চোখে পবিত্র নির্মল। কেননা এরাও এক জাতের প্রকৃতিলালিত ডানাহীন পাখীর ঝাঁক। গোপ বালক বালিকারা কলকল করে বনবাদাড়ে ঘুরে বেড়ায়। মেয়েরা শুকনো গোবরে সর্বাঙ্গ অলঙ্কৃত করে দলবদ্ধভাবে ছেলেদের সঙ্গে বাস করে।[১]

আহা কি নিদারুণ স্নেহের সঙ্গে যশোদা শিশুটিকে তাঁর উদ্বেলিত স্তন্য পান করাচ্ছিলেন। চোখে তাঁর কী মধুর স্নেহাঞ্জন। সে দৃশ্য দেখে গর্গ দীর্ঘশ্বাস মোচন করে বলেছিলেন,—মানুষকে তার অজান্তে একটি শিশু দাও আর বলো, এই-ই তোমার নাড়িছেঁড়া ধন। সে সেই বিশ্বাসেই 'আমার সন্তান' ভেবে শিশুটিকে পালন করবে। আবার অজান্তে তার আপন গর্ভজাতকে অন্যের সন্তান বলে তারই রক্ষণাবেক্ষণে রেখে দেখো, অপরের সন্তান ভেবে সে সেই শিশুর প্রতি অবহেলা অযত্ন এমনকি অত্যাচারও করবে। 'আমার সন্তান', এই জানাটাই তার কাছে সর্বস্ব, এ-ও অহং-রতি। সন্তানস্নেহের অন্য অর্থ নেই। না জানা পর্যন্ত কাকের মত মানুষেও কোকিল পুষে থাকে।—যাবার সময় গর্গ হেঁয়ালির মতো এইসব কথা কেন যে নন্দ যশোদাকে বলে গেছলেন, আজও নন্দ তার রহস্য খুজে পান না গর্গ বলেছিলেন,—মনে রাখিস। দেখতে গেলে আমার তোমার বলে আলাদা ব্যাপার নেই। সন্তানস্নেহও এক ধরনের সম্পত্তি-চেতনা। সুতরাং বৃথা মনোকষ্ট পেয়ে দরকার কি। যা-ই ঘটুক, মনে স্ফূর্তি রাখিস। ঈশ্বর আনন্দময়, জীবনে কোনো দুঃখ রাখতে নেই।

গর্গ মন হাল্কা করেই বিদায় গ্রহণের চেষ্টা করে বলেছিলেন,—আজ থেকে তোদের ছেলেদুটি, কৃষ্ণ ও বলরামের ভার নিলাম আমি। ওরা বড় হোক। ওদের শিক্ষার ব্যবস্থাও আমিই করব। সুখে থাকো, মা।

গর্গের কথা মনে পড়ে নন্দর। বড় ভালো লোক ঐ সুপুরুষ ঠাকুর। বসুদেবের সঙ্গে দেখা হলে নিশ্চয় তিনি নন্দ যশোদার সম্বন্ধে ভালো ভালো কথাই বলবেন। নন্দ শুধুই অকারণে ভয় পাচ্ছে।

বেলা গড়িয়ে চলেছে। সূর্যের তাপ বাড়ছে। দূরে। গাছ-গাছালির মধ্য দিয়ে মাঠের ওপর হাজার হাজার সোনার বরণ রোদের চাকতি ঝিলমিল করছে। নন্দ বুঁদ হয়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকেন।

আহ্! এই পৃথিবীটা কত সুন্দর। কিন্তু মানুষের এমনই কপাল, সেই সুন্দর ভুবনকে সে চোখ মেলে দেখার সুযোগই পায় না।

৬

নন্দ বৃথাই ভয়ে আশঙ্কায় দিন কাটাচ্ছিলেন। ঠাকুরকে পাওয়া না গেলে বসুদেব তাঁর প্রতি ক্রুদ্ধ হবেন ভেবে রাতে ভালো করে ঘুমও হচ্ছিল না। অবশেষে বসুদেব তাঁকে ডেকে পাঠালেন যমুনা তীরে সেই জঙ্গলের মধ্যে, যেখানে বসুদেবের সঙ্গে তাঁর প্রথম দেখা হয়।

নন্দকে দেখে বসুদেব বললেন,—কী পুরস্কার চাও নন্দ! বলো, আমি তোমার জন্যে কী করতে পারি।

নন্দ তো অবাক। তিরস্কারের আশঙ্কায় দুরু দুরু বুকে সে এতোটা পথ এসেছে। দাঁড়িয়েছে হেঁট মুখে। কিন্তু বসুদেব বলছেন পুরস্কারের কথা। রাজার জাত বড় অদ্ভুত জীব। তাঁরা হাসতে হাসতে গর্দান নেন অপদার্থ প্রজার।

নন্দ ভয়ে ভয়ে বলেন,—ঠাকুর কোথায় গেলেন আমি কিছু জানি না। আমার গাড়োয়ানটাও কিছু জানে না।

বসুদেব খুশি হয়ে বললেন—সাবাস! ভেবেছিলাম তুমি হৈ চৈ করে একটা গণ্ডগোলই পাকিয়ে তুলবে। কিন্তু আশাতীত ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়েছ। তাই তো তোমাকে পুরস্কৃত করতে চাই। এই নাও, এতে আরও মোহর আছে। তোমাকে ব্রজভূমি ছেড়ে গোবর্ধন পর্বতের কোলে বৃন্দাবনে গিয়ে নোতুন সংসার পাততে হবে। এবার পাকা বাড়ি বানাও। আরাম করে থাকো আমাদের ছেলে নিয়ে! রোহিণীর যত্ন কোরো।

নির্বোধ দুটো চোখ তুলে অনুনয়ের স্বরে নন্দ বলেন,—কিন্তু বিশ্বাস করো ভাই, আমার কোনো অপরাধ নেই। আমাকে বনবাসে পাঠাচ্ছ কেন? সে জায়গায় যে গভীর বন। শের, সিংহী, হাতী, কিছুরই অভাব নেই।

—সেটাই তো দরকার। বন বাদাড়ে এতোকাল ঘুরছ, এখনো কি এসব জন্তু জানওয়ারের ভয় আছে? তোমার এলাকা ঘিরে ফেলবে। ওখানে পাবে বিস্তীর্ণ গো-চারণ ক্ষেত্র। মথুরার উত্তরে যমুনার কিনারে গোবর্ধন গিরি। এদিকটায় কংসের নজর কম। বিষাক্ত সাপের ভয়ে সেপাইরাও এপথ সাবধানে

এড়িয়ে চলে। কদম্ব বৃক্ষের অরণ্য গোপ-গোপিনীদের ভালো লাগবে। সুরক্ষিত করে একটা গ্রাম বসালে জন্তুর উৎপাত রুখতে পারবে।

একটু ভেবে বসুদেব আবার বললেন,—আসলে কংসর কানে কথা উঠেছে। সে জেনেছে, গোকুলে তোমার গোপসম্প্রদায়ের চালচলন ভালো নয়। দেবতারা তোমাদের ঘরে ঘরে লুকিয়ে আছেন। তাদের ছেলেরা তোমাদের মধ্যে মিশে আছেন।

—কিন্তু…

—আহ্! কথার মধ্যে কথা বলতে নেই। শোনো। একথায় ভালই বুদ্ধি এসেছে আমাদেরও মাথায়। এখনো দেবসন্তানরা তোমাদের মধ্যে নেই বটে, তবে বৃন্দাবনে গোপবেশে তারাও বেশ কিছু সংখ্যায় তোমাদের সঙ্গে থাকবেন। তাতে তোমাদের সুরক্ষারও ব্যবস্থা হবে।[১] কৃষ্ণ বলরাম এখন বেশ বড হয়ে উঠেছে। তাদের শিক্ষা দেবেন মহর্ষি গর্গ কাছেই কোনো কুটীরে। পরে জানাব। আর তরুণ গোপবেশী দেবতারা তাদের ও তোমার গোপ সম্প্রদায়কে যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী করে তুলবেন। বুঝতেই পারছ, তুমি গোপকুলের রাজা হতে চলেছ। এরপর তুমি হবে গোপরাজ নন্দ।

নন্দ খুশি হয়েই ফিরে এলেন। মনে যে ভয় না হচ্ছিল এমন নয়, কিন্তু বসুদেব আটঘাট বেঁধেই কাজ করছেন। গোকুলে প্রায়ই সেপাই সান্ত্রীরা এসে উৎপাত করে যেত। সুন্দরী গোপকন্যাদের ধরে নিয়ে যেত মাঝে মধ্যে। দাবি করত উৎকোচের। এবার তাদের অত্যাচার কমবে। দেবতারা স্বয়ং লুকিয়ে থাকবেন গোপকুলের সঙ্গে মিলে-মিশে। নন্দ হবেন গোপরাজা। পাকা দালান বাড়ি উঠবে।

ব্রজে ফিরে মনের আবেগে যশোদাকে সব কথা বলেন নন্দ। কেবল দেবতাদের কথা চেপে গিয়ে গোপনেতাদের জড়ো করে জানিয়ে দেন, কংসর অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য তিনি ভিনদেশী একদল শক্তিশালী গোয়ালাকে নিজেদের দলে নিচ্ছেন। সবাই যেন তাদের সঙ্গে আত্মীয়ের মতই ব্যবহার করে ঘরে রাখে। মেয়ে দেয়।

বৃন্দাবন বস্তুত ভারি সুন্দর জায়গা। তাকে বসবাসের উপযুক্ত করে নিতে গোপেদের পরিশ্রম করতে হলেও অসুবিধা হল না। গোপবেশী দেবতারাও হাত মেলালেন জঙ্গল সাফা করে গ্রাম বানাতে। বিস্তীর্ণ চারণক্ষেত্রে নন্দর ধেনুরাও মহানন্দে কচি ঘাস চিবিয়ে রসনা তৃপ্তিতে মেতে উঠল।

ব্রজপুর থেকে নন্দগোপ বসত ওঠাতেও কংসের কোটাল সন্দেহ করলে না কিছু। গোপেরা যাযাবর। গবাদি পশুর খাদ্যের প্রয়োজনে তারা এক জায়গ থেকে নতুন চারণভূমি বেছে নিয়ে নিজেদের বসত স্থানান্তরিত করে। সুতরা ব্যাপারটা সাধারণ স্বাভাবিক ঘটনা বলেই মেনে নিলেন তিনি।

কিশোর কৃষ্ণ-বলরাম এখন দুই রাখাল রাজা। দুজনে দুটো দুষ্টু কিশো বাহিনীর নেতা। তাদের দুরন্তপনায় গোপিনীরা অতিষ্ঠ। কিন্তু অখুশি নয় সস্নেহে তারা বালকবাহিনীর দুরন্তপনা নিয়ে পরস্পরের মধ্যে কৃত্রিম কো প্রকাশ করে নিজের নিজের ছেলের দোষের কাহিনী সমবয়সিনীদের সং আলাপ করে। নন্দের ছেলেদুটিকে অবশ্য সবাই বিশেষ চোখে দেখে। দলপতি ছেলে বলেই শুধু নয়, তাদের হাবভাব চালচলন বুদ্ধিমত্তা সাধারণ কিশোরদে থেকে তো বটেই, নির্বোধ মূর্খ গোপপুরুষদের থেকেও অন্যরকম বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

নন্দের ওপর দিয়ে কটা দিন কাজকর্মের ঝড় বহে গেছে। কোনো দিবে তাকাবার, কোনো কিছু ভাববার অবসর পান নি। নোতুন জায়গায় নোতু রাজত্ব মশগুল করে রেখেছিল তাঁকে। গতকাল থেকে কিন্তু কাজে তাঁর আর উৎসাহ নেই। সুন্দর নক্সাকাটা মসৃণ মাটির দাওয়ায় বসে দিগন্তের দিবে তাকিয়ে আছেন আজ। আকাশ নেমে গেছে গোবর্ধন পর্বতের রোমশ পিঠ বেয়ে।[২]

অন্দরমহল থেকে নন্দরাণী গরম দুধ, মোয়া আর সন্দেশ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। স্পর্শ করেন নি নন্দ। প্রাতরাশ ঘিরে একঝাঁক ইন্দ্রগোপ ওড়া-উড়ি করছে।[৩] উদাস নন্দের বুকে আজ দুরু দুরু আশঙ্কা। আবার দূত এসেছিল বসুদেবের কাছ থেকে। হুকুম হয়েছে, কৃষ্ণ বলরামকে পড়াশুনার জন্য পাঠাতে হবে কোনো অজ্ঞাত স্থানে। ছেলেদুটি শুধু রোহিণী যশোদারই নয়, নন্দেরও চোখের মণি। তাদের ছেড়ে দিতে হবে ভেবে গতকাল রাত থেকে কর্তাগিন্নী কারো চোখেই আর ঘুম নেই। কিন্তু উপায়ও যে নেই। কৃষ্ণ বলরাম তো সাধারণ রাখালের মতো ধেনু চরিয়ে জীবন কাটানোর জন্য জন্ম-গ্রহণ করেন নি, গর্গ আর বসুদেব বলেছেন, এই মহা পুণ্যবান দুই ছেলে একদিন মথুরাকে শাসন করবে। আর তখন নন্দও হবেন রাজপুরুষদের একজন।

নন্দর অবশ্য রাজপুরুষ হওয়ার শখ সাধ নেই। দেখছেন তো রাজপুরুষের চরিত্র। কেবল ফন্দিফিকির চক্রান্ত। একে মারো তাকে ধরো করতে করতেই

জীবন শেষ। না একবার তারা আকাশের গায়ে এক টুকরো ছেঁড়া মেঘে রামধনুর রঙ দেখার সুযোগ পায়, না দেখে বনাঞ্চল জুড়ে ভোর হওয়া অথবা সন্ধ্যা নামার ঘটাপটা। তার চেয়ে এই তো ছিল ভালো। নিরীহ ধেনুর পালকে ঘাস খাইয়ে আনা। শীতের দুপুরে মাঠে মাঠে বেণুধ্বনি তুলে ঘুরে বেড়ানো। গোপিনীদের সোহাগে শরীরে রোমাঞ্চ নিয়ে রাত্রি যাপন, আর পাতার ডোঙায় রস খেতে খেতে স্খলিতবসনা গোপিনীদের রাসনৃত্য দেখা। কোথাও অশান্তি নেই, মনে খচখচে কাঁটা নেই, হিংসেয় বুকে যন্ত্রণা নেই।

অন্দরে বসে যশোদাও বুঝি একই কথা ভাবেন। ছেলেদুটোর একটা রোহিণীর হলে কী হবে, বলরামও তাঁর কাছেই মানুষ। কী জানি কেন, রোহিণীর তেমন টান নেই বাছার ওপর। সে সদাই উদাস, চিরবিষণ্ণ। আর হবে নাই বা কেন। রাজা স্বামী থাকেন শহরে সতিন দেবকীর শয্যায়। মন কার বা ভালো থাকে। রোহিণীর জন্যেও তাই যশোদার স্নেহশীল মন বেদনা অনুভব করে। সকলের জন্য তাঁর মনের স্নেহরস দেহের লাবণ্য হয়ে সর্বাঙ্গে গড়ায়। কারো কষ্টের কথা শুনলেই বড় বড় চোখদুটি ছাপিয়ে জল আসে। এমন নির্ভেজাল একটি মাতৃমূর্তি সন্তান দূরে যাবে শুনে একরাতেই শুকিয়ে গেছে। মন ছটফট করে। তাই একসময় বাইরের দাওয়ায় স্বামীর পেছনে এসে নিঃশব্দে বসে পড়েন নন্দরাণী

নন্দ যশোরাণীর গায়ের গন্ধ পান। সব সময় দুধ ননী পাক করে করে যশোদার বসনে ঘিয়ে ঘিয়ে একটা বাস ছাড়ে, যেমন গোপ গোপিনীদের শরীর থেকে বাথানের বাস ছড়ায়।

নন্দের দৃষ্টি আজ নির্লিপ্ত ভাবলেশহীন। স্ত্রীর স্ফীতকায়া রাজেন্দ্রাণী মূর্তি ভোরের আলোয় স্নিগ্ধ হয়েছে যেন আরও বেশি। এমন ভাবে যশোকে একা পেলে নন্দর ইচ্ছে করে যশোদাকে বুকে চেপে চুপ করে শুয়ে থাকতে। এখনো যৌবনের তেজ বার্ধক্যের ঢালে গড়াতে দেরি আছে। এই সীমান্ত রেখায় পৌছানোর সময়টা আসক্তি বাড়ায়। কিন্তু আজ শুধু তিনি তাকিয়েই রইলেন, যেন চোখের সামনে কোনো ননীতে গড়া সুন্দরী রমণীপুতুল দেখছেন।

সেই গৌরী মূর্তির দুই নিটোল স্বর্ণকুম্ভের মতো ক্ষীরভার-স্তনে একছড়া রূপোর মালা সূক্ষ্ম ক্ষৌমবস্ত্রের স্বচ্ছতা ভেদ করে স্পষ্টত দোল খাচ্ছে। কুচাগ্র-ভাগের রক্তাভ চন্দ্রকলা এখন কৃষ্ণস্নেহে তার মণ্ডলাকৃতি আরও বিস্তৃত করেছে। স্তনবৃন্তটি পুষ্পাঙ্কুরের মতো স্ফুটনোন্মুখ। সর্বাঙ্গে স্বামীপুত্রসুখী যৌবন ভরন্ত যমুনার মতো টলটল করছে। স্থূল বাহুদুটি কামড়ে রূপোর বলয় ত্বকের মধ্যে

এঁটে বসেছে। কপালে গোলাকাব সিঁদুবেব টিপ। কয়েকফোঁটা ঝরে পড়েছে ঈষৎ মোটা নাকেব ওপব। পাযেব পাতায় আলতাব নকসা। ভাবি ভারি রূপোব মল। শ্রোণীদেশেব ওপবে ছড়িয়ে আছে মোটা একছড়া চন্দ্রহাব।

নন্দ চোখ ফিবিযে বলেন,—কৃষ্ণ কোথায় ?

—বলাইযেব সঙ্গে কুস্তি কবছে। পাবিনা আব দুবন্ত দুটোকে নিযে।

নন্দ হাসেন ম্লান মুখে,—আমাদেব ঘরে তো এটাই ছিল বীতি। বসুদেব আব গর্গমুনিব সইল না। ওদেব পণ্ডিত বানাতে হবে। আমাব ছেলেবা কি পাববে পুঁথিব পাতায় মন বসাতে।

যশোদা সবোষে ফুঁসে ওঠেন,—ঐসব মিনসেব কথায় তুমিও নাচছ। সোজা বলে দিলেই তো হত, আমরা মুখ্যসুখ্য গোয়ালার জাত। আমাদেব সংসারে পণ্ডিতেব দবকাব নেই। কি জানি বাপু, গেরুয়া পবা ঐ ঠাকুব বলতে বলতে যুক্তকব কপালে ঠেকান যশোদা) যখন তোমাব গোপ্ত ঘবে এসে উঠলেন, তখনই আমাব সন্দেহ হযেছিল। কানু নাকি বাজা হবে। তুমি বাজা হবে। দবকাব কি বাপু বাজা হওযাব। সে হলো বাজ্যেব ঝক্কি। দেখছো তো, এই বাজত্বি সামলাতে পাবো না। আজ ব্রজপুব কাল ব্রেন্দাবনে ছুটাছুটি। বাজা হলে পবজাদেব ধবে ধবে কাছাবি বাড়িতে পুবে বোজ ঠেঙাতে হবে তোমাদেব। গরু ঠেঙিয়ে বড হলে পাববে মানুষ ঠেঙাতে ?

নন্দ বিষণ্ণ মুখে বলেন,—কেন পাবব না, পশুপালন তো বাজাদেব গরু। ঘাস পানি দেয, দুধটুকু শুযে নেয, বেযাদপি দেখলে ঠেঙায়। এ কি আব শক্ত কাজ। চেহাবায যা তফাৎ গরু আব মানুষে। কানু হবে আমাদেব মতো এই মানুষ গরুদেব বাজা। এই জীবনেও কি সুখ আছে বে।

বসুদেবেব কাছে কাছে থেকে নন্দব ইদানীং বুদ্ধিতে শান পড়েছে। কথায় কথায় চমক বেবিয়ে পড়ে যে শোনে সে অবাক হয়। নন্দ নিজেও এক এক সময় বিস্মিত হয়ে ভাবেন, তাঁব মধ্যে নোতুন একটা মানুষ এসে বাসা বাঁধছে। ভয় কবে, আবাব বেশ গবও হয়। বস্তুত তাঁব তো দিন ফিবছে। কি ছিলেন আব দিনে দিনে কী হয়ে উঠছেন।

যশোদা এবাব আবও একটু ঘেঁষে বসেন। গলা খাটো করে ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করেন,—হ্যাগো, আমাদের সেই ঠাকুবই বুঝি গগ্গ ঠাকুব ? মানুষটা বড় ভালো ছিলেন, তা তাঁকেই একবার বলে দেখো না!

ধীরে ধীবে মাথা নাড়েন নন্দ। না। বলে কোনো ফল নেই। ছেলেরা তো তাঁব কাছেই শিখতে যাবে।

যশোদাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন,—ঠাকুর ভালো বলেই তো ভরসা। ছেলেরা তাঁর কুটিরে ভালই থাকবে। দুটো বছর বই তো নয়। ছেলের জন্যে, তার উন্নতির জন্যে সব সইতে হয়। দেখো গিয়ে রোহিণীর চোখে মুখে খুশি, তার ছেলে মানুষ হবে শুনে।

কানুকে পাঠাতে মন চায় না যশোদার। যদি গর্গের সঙ্গে তাঁর একবার দেখা হত। কেঁদে ভাসিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে রাখতেন। ঠাকুরকে বলতেন, আমি আপনার সেবা-দাসী থাকব ঠাকুর, আমার সোয়ামী নোকরের অধম হয়ে থাকবে আপনার পায়ের তলায়। আপনি বেন্দাবনে থেকে বলাই-কানুকে শিক্ষে দিন। কিন্তু নন্দ বলেন, তা হবার নয়। দেবতাদের পাঠশালা কি যেখেনে সেখেনে বসানো যায়। সেসব গোপ্য ব্যাপার। শিক্ষে নয়, ওসব হ'ল মন্তর। মন্তর সবার চোখের আড়ালে কানে কানে দিতে হয়।

অভিমানে ফর্সা মুখ টকটক করে নন্দরাণীর। বলেন,—তাই বলি, ঠাকুর অমন ভালো মানুষ হলেও মন আমার কু গাইত কেন? তখন লজ্জায় বলিনি, আজ বলছি, রাগ কোর না। ঠাকুর যখন আমার কানুর দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে কী যেন ভাবতেন, বুকের মধ্যে তখন আমার দুরদুর করত। বুঝতুম না কেন অমনটা হয়। রাতে অমঙ্গুলে স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেছে কতদিন। দেখতুম, ঠাকুর আমার বুক থেকে আমার মাণিককে তুলে নিয়ে চলে যাচ্ছেন। মাগো কী দিশ্যি! কানতে কানতে, কাঁপতে কাঁপতে কানুকে বুকে চেপে ওর ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছি। দুধ চেপে ধরেছি ওর মুখে। সে যে আমার বুকের কাছেই আছে, এইটে বোঝার জন্যে।...

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বলেন,—ভাবতুম, সবই আমার মনের পাপ। অমন একটা মানুষকে সন্দেহ। ছিঃ। কিন্তু এখন বোঝো, মন আমার যথার্থ্যই কু গাইত কিনা।

বেদনাবিদ্ধ চোখ পেতে শুনছিলেন নন্দ, চমক ভেঙে নড়ে চড়ে বসেন। শ্বাস ফেলে বলেন;—মায়ের মন। কিন্তু ছেলে কি চিরকাল মায়ের বুকের কাছে থাকে, যশো। বয়স হলে আপনি উড়ে বেড়াবে।

—আগে তো বয়স হোক। নিজেকে সামলাতে শিখুক।

নন্দ অসহায় ভাবে কাঁধের ওপর গামছা তুলে উঠে দাঁড়ান।

—বেলা বয়ে যাচ্ছে, একটু ক্ষেতিবাড়ি তদারক করে আসি। কপাল তো কারো হাতে নেই। মানতে হবে। আমরা হুকুমের দাস বৈ আর কিছু তো নয়!

শেষের কথায় মনের জ্বালা ঝাঁঝি মেরে বেরিয়ে আসে। হনহন করে দাওয়া থেকে ছিটকে নেমে পড়েন নন্দ। তারপর রোদ মাথায় নিয়ে হেঁটে যান।

যশোদা মূক বেদনাভরা চোখে স্বামীর এলোমেলো চলার পথে তাকিয়ে থাকেন। আহা, এ মানুষটাই বা করবে কি। ফেরে ফেরে জড়িয়ে গেছে। বন্ধু না ছাই, রাজারা সবাই সমান। যেমনি কংস, তেমনি বসুদেব। সব স্বাথ্য। স্বাথ্য ছাড়া তারা আর কিছুই বোঝে না।

ধীরে ধীরে আবার ফিরে যান যশোদা। বুকভরা কান্না দু চোখ চিবে বার হয়ে আসতে চায়।

ভেতরে এসে দেখেন, সর্বাঙ্গে মাটি আর গোময় মেখে দুরন্ত কানু আঙিনায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। গোপবালারা তাকে ধরবার জন্য দু তিন দিক থেকে আক্রমণ রচনা করেছে। উভয় পক্ষে হুটোপাটি আর হাসাহাসির খেলা হচ্ছে।

দৃশ্যটা যশোদার মনের ভাবনা দূর করে তিনিও হাসেন, বলেন,—দাঁড়া দস্যি ছেলে তোকে এবার দেখাচ্ছি মজা। রাতদিন ধুলোকাদা মেখে দুষ্টুমী করে বেড়াচ্ছিস।

কিন্তু মাকে তিলমাত্র ভয় করার কারণ নেই, একথা কৃষ্ণের চেয়ে ভালো করে আর কে-ই-বা জানে। সে দৌড়ে এসে বুড়ি-ছোঁয়া করে জড়িয়ে ধরে যশোদাকে। যশোদার সাধের সাজ পোষাক নোংরায় একাকার হয়ে যায়। সস্নেহে প্রশ্রয়ের সঙ্গে ভৎসনা করেন তিনি, এ্যাই, এ্যাই। দেখো, দেখো! দিলো আমার কাপড় চোপড় নোংরা করে! ও-মা আমার কি একটু সাজবারও উপায় নেই গো। তোরা কি করিস বলত। ছেলেকে পরিষ্কার রাখতে পারিস না!

কে যেন চোপা করে বলে ওঠে,—ভারি তো বাধ্য ছেলে তোমার। আদরে আদরে মাথায় তুলেছ। এখন বোঝো!

যশোদা বড় ভালো মানুষ। আত্মীয় পরিচারিকা কারকেই নিজে ধমক দিতে পারেন না। বরং উল্টে তাদেরই মুখ ঝামটা হাসিমুখে হজম করতে হয়। চাপা স্বরে বলেন,—তাই-ই তো। শুধু আমিই আদর দিই কিনা। তোরা পারিস কি শাসন করতে।

মেয়েরা একথায় সস্নেহে হাসে। বস্তুত কানুর মায়াবী শ্যামলা মুখ আর দীঘির মতো ছলছল টলটলে চোখ দেখে শাসন দূরের কথা, মেয়েদের বুকে অপত্য স্নেহই ঝরে। তারা গোপালকে সাজায় মোহনবেশে। মাথার পুষ্প মুকুটে

গুঁজে দেয় ময়ূরের পেখম। কোমরে বেঁধে দেয় রঙিন মেখলা। মুখে এঁকে দেয় চন্দনের টীকা। কিন্তু সে আর কতক্ষণ। সব নষ্ট করে ফেলে কৃষ্ণ।

জনৈকা কাছে এসে কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করে কৃষ্ণের পিঠে আদরের চাপড় মেরে বলে,—কাজ কি গো আমাদের রাজপুত্তুরকে শাসন করে। ও তো আমাদের শত্তুর। বড় হয়ে আমাদেরই শাসন করবে।

একথা শুনে আবার ছলাৎ করে ওঠে যশোদার বুকের রক্ত। মেয়েরা তো জানে না, যশোদার অন্তরে মস্ত পাথরের ভার চাপানো আছে। তাড়াতাড়ি কৃষ্ণের মুখখানা নিজের বুকে চেপে ধরে যশোদা বলেন,—আমার সোনা! আমাকে ছেড়ে কখনো কোথাও যাবি না তো! ওরে, তাহলে আমি আর বাঁচব না! বল্, এমনি করে চিরদিন তুই আমার বুকের মধ্যে থাকবি? ও আমার চাঁদ, ও আমার কানু! আমাকে কাঁদাবি না তো?

কৃষ্ণ এখন বেশ বড হয়েছে। মায়ের ব্যাকুলতা লক্ষ্য করে অবাক হয়। যশোদাকে দুহাতে বেষ্টন করে বলে,—মা, এই তো আমি। আমি তো তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাই না। গোঠে গিয়ে ফিরে আসি।

নবম হাতে যশোদার চোখ মুছিয়ে দেয় সে।

মা ও ছেলের এই স্নেহখেলা দেখে গোপিনীরা নিজের কাজে যায়। কেউ কেউ বলে, যশোদার অবার সব তাতেই বাড়াবাড়ি। ছেলে যেন আর কারো হয় না। বালাই ষাট। যাবে কোথায় অমন ছেলে।

যশোদার ব্যাকুল আর্তি শুনে দেবতারা বুঝি অলক্ষ্যে বসে হাসেন। তাই হঠাৎ একদিন গভীর রাতে নন্দালয়ের দ্বারে এসে দাঁড়ায় দুটি ছায়া মূর্তি। পরণে আঁটো সাঁটো পোষাক, পায়ে বৃষচর্মের পাদুকা। হাতে সরু সরু লম্বাটে হাতবাতি।

সময়টা হিসেব করেই বেছে নিয়েছে তারা। থমথমে নিশুত রাত্রি। পৃথিবীর মাথার ওপর জমকালো চুমকি বসানো সামিয়ানা। ঝোপঝাড় বনবাদাড়ে ফট ফট করে একটানা পাখা ঝাপটে ঝিঁ-ঝিঁরা শব্দের ঘূর্ণী সৃষ্টি করছে। মাঝে মধ্যে চারদিক উচ্চকিত করে 'হ্যা' হ্যা' ডাক ছাড়ছে হাড়গিলে হায়না, উত্তরে সতর্ক শেয়াল দলবদ্ধভাবে হৈ হৈ করে বলছে, ক্যা হা ক্যা হা। ক্যা হায়!

এসময় মানুষে ঘুমোয় ঘরে আগড় তুলে। তস্করে আর খুনীতে ঘুরে বেড়ায় ছায়ার মতো। প্রেতের সভা বসে বড় বড় গাছের ঝুপড়ি ঝুপড়ি মগডালে।

নন্দালয়ের দ্বারে দাঁড়িয়ে মূর্তি দুটি নিচু স্বরে পরামর্শ করে নেয়। বিষ্ণুব্রতের আদেশ, কাজ সারতে হবে সন্তর্পণে, নন্দারাণীর অগোচরে। মেয়ে মানুষকে বিশ্বাস নেই। জানতে পারলে সব সাবধানতা মাটি করে দিতে পারে সোরগোল আর কান্নাকাটি বাধিয়ে। এরা সুর করে কাঁদে। পড়শির ঘুম ভাঙায় সক্রন্দন ছড়া কেটে। তাই শুধু নন্দকে ডেকে তুলে কাজটা হাসিল করে ফিরে আসতে হবে।

ছায়া মূর্তি দুটি পেছনের বাগানে যায়। সেখান থেকে জানলা দিয়ে ঘরে ঘরে তাদের হাত বাতির আলো ফেলে নন্দকে খোঁজে।

চোখের ওপর আলো পড়তে ধড়মড় করে উঠে বসেন নন্দ,- কোন হ্যায়? হাঁক দিয়ে উঠে দাঁড়াতেই খসখসে গলায় ছায়ামূর্তি ধমক দিয়ে চীৎকার করতে মানা করে। ইঙ্গিতে জানলার ধারে ডেকে তাদের আগমনের উদ্দেশ্য জানায়। গর্গের দূত হিসেবে এসেছে তারা সবার অজ্ঞাতে রাম ও কৃষ্ণকে গর্গের আশ্রমে নিয়ে যাওয়ার জন্য। কাজটা নিঃশব্দে করতে হবে। নন্দরাণীরও ঘুম যেন না ভাঙে। পরদিন সকালে শুধু তাকে জানানো যেতে পারে। তবে অন্যান্যদের বলতে হবে, ছেলেদুটিকে নন্দ গুরুগৃহে রেখে এসেছেন আর তাই নিয়ে কেউ যেন হৈ চৈ না করে।

—কিন্তু যশোদার কাছ থেকে ছেলেদের উঠিয়ে আনলে তার ঘুম ভেঙে যাবেই।—অসহায়ভাবে নন্দ কৃতকার্য হওয়ার ক্ষেত্রে অসুবিধার কথা বলেন।

ছায়ামূর্তি একটা মুখোশ এগিয়ে দিয়ে নন্দকে তাঁর মুখ ঢেকে নিতে আদেশ দেয়। নিজেরাও অনুরূপ মুখোশ পরে নেয়। তারপর নন্দর সঙ্গে যশোদার ঘরের নিচে গিয়ে সুতোর মতো একটা কী যেন জানলায় বেঁধে সেটায় আগুন ধরিয়ে দেয়। সুতোটা পোড়ে। ঘরে ছড়িয়ে পড়ে একটা কটুগন্ধ আর ধোঁয়া। একটু অপেক্ষা করে মূর্তিটি বলে,—এইবার ঘরে গিয়ে কৃষ্ণ বলরামকে তুলে আনুন। ওদের কারোই ঘুম ভাঙবে না কাল সকালের আগে। সকালে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে যশোদাকে ব্যাপারটা জানিয়ে দেবেন। দেখবেন, উনি যেন গোলমাল না করেন।

প্রতিবাদ অথবা অনুনয় বিনয় নিষ্ফল। নন্দ নিঃশব্দে আদেশ পালন করেন। ছায়ামূর্তি বালকদুটিকে নিয়ে অন্ধকার পথে নেমে পড়ে।

—কবে এদের ফিরিয়ে দেবেন আপনারা?—নন্দের গলায় উৎকণ্ঠা প্রকাশ পায়।

ছায়া মূর্তির একজন কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে,—জানি না। পরে বসুদেব অথবা

ঋষি গর্গের কাছ থেকে সংবাদ পাবেন অপনি। এখন ঘরে গিয়ে অর্গল তুলে দিন। আমাদের অনুসরণ করবেন না।

নন্দ তবু দাঁড়িয়ে থাকেন। যতক্ষণ দেখা যায় তাকিয়ে থাকেন। অন্ধকার রাত্রেও আকাশের একটা অস্পষ্ট আলো আছে। সেই আলোয় দুটি ছায়া মূর্তিকে দূরে সরে যেতে দেখা যায়।

মূর্তিগুলি অন্ধকারে ক্রমশ মিলিয়ে গেলে অবসন্ন দেহ টেনে টেনে ভেতরে যান নন্দ। যশোদার ঘরের সেই গন্ধ ও ধোঁওয়া এখন মিলিয়ে গেছে। নন্দ গিয়ে যশোদার পাশে শুয়ে পড়েন। চোখে এক ফোঁটা ঘুম আসে না। সকালে যশোদাকে কেমন ভাবে শান্ত করবেন, তারই চিন্তা করতে থাকেন। ভালো কথায় না হলে ধমক দিতে হবে। ধমকেও কাজ না হলে প্রয়োজনে আঘাত করে শাসন করতে হবে। কি কঠিন কাজের দায়িত্বই না চাপিয়ে গেল ও-রা। নন্দর চোখ ফেটে জল আসে। হে ভগবান, এমন অলুক্ষণে বসুদেবের সঙ্গে এতকাল পরে কেন দেখা করিয়ে দিলে। নন্দ অভিমান ভরে তাঁর মনের ঠাকুরকে তিরস্কার করেন। গাল পাড়েন নিজের অদৃষ্টকে। আবার সান্ত্বনা খোঁজেন রামায়ণের কাহিনী স্মরণ করে। ভাবেন, একদিন রাজা দশরথ তরুণ রাম ও লক্ষ্মণকে অনিচ্ছা সত্বেও সঁপে দিয়েছিলেন বিশ্বামিত্রের হাতে। ব্রাহ্মণের দাবিকে অযোধ্যাপতিও অস্বীকার করার সাহস পাননি। নন্দ তো সামান্য মানুষ। তিনি আর কতটুকু ক্ষমতা রাখেন। যা হবার তাই হবে।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ করে বহে যায় দু দুটো মাস। একা একা গৃহাঙ্গনে বসে থাকেন যশোদা। শূন্য দৃষ্টি পরিত্যক্ত একলা তরীর মতো উদ্দেশ্যহীনভাবে ভেসে বেড়ায় উন্মুক্ত গোচারণভূমি পার হয়ে গোবর্ধনের গায়ে গড়িয়ে পড়া সুনীল দিগন্তের দিকে। রাখাল বালকেরা গোঠে যায় ধেনুর পাল চরাতে। আবার গোধূলি উড়িয়ে গো-কণ্ঠের ঘুঙুরে বোল ছড়িয়ে হৈ হৈ করে ফিরে আসে। আসেনা শুধু কৃষ্ণ আর বলরাম। আদিগন্ত শুধুই হা হা শূন্য। বিকেল গড়ায় এইভাবে। ঝুরো অন্ধকার গাছ গাছালির জটাজুটে ঝুলন্ত বাদুড়ের মতো বাসা বাঁধতে শুরু করে। যশোদার এই সময় হু হু করে কান্না পায়। প্রতিদিনই বড় আশা, এই বুঝি দেবতারা দিগন্ত ফুঁড়ে রাম ও কৃষ্ণকে নিয়ে নেমে আসবেন। দূর দিগন্ত রেখায় ফুটে উঠবে দুটি ধবল-কৃষ্ণ কিশোর মূর্তি। যশোদা দুহাত প্রসারিত করে পাগলিনীর মত ছুটে যাবেন, তারাও তেমনি ভাবেই ছুটে আসবে তাঁর বুকে। ভাবতে ভাবতে দুই বুক ভাসিয়ে স্নেহক্ষীর উথলে

পড়ে। উবছে পড়ে দুই নয়নের ধারা। কিন্তু কেউ আসে না। কৃষ্ণময় অন্ধকার চারিদিক পরিব্যাপ্ত করে।

কৃষ্ণ নেই। রাম নেই। কলরব নেই বৃন্দাবনে। গোপিনীরা যে যার সংসারের কাজে ব্যস্ত। কেউ আর যশোদার ধার কাছ মাড়ায় না। অমন নীরব যশোদার পাশে বসতে নিজেদেরই কেন যেন অপরাধী মনে হয় তাদের। তফাতে থাকে সবাই। তফাতে থাকেন নন্দ ঘোষ নিজেও। কাজ কর্মে মন বসে না তাঁরও। সারাদিনে কতবার যে ঘরবার করেন, সারা দুপুর গোবর্ধনের কোল পর্যন্ত হেঁটে আসেন। যমুনার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। কি দেখতে যান নন্দ? কৃষ্ণের খোঁজে যান কি তিনি ব্রজের সীমানায়? আশা কুহকিনী।

মানুষ তার শোক ভুলে যায়, কেননা প্রকৃতি বড় বুনো। মানুষের যেমন চার বেলা আহার, প্রকৃতির তেমনি ছয় ঋতুর আবর্তন। যেখানে যা-ই ঘটুক না কেন, তুমি সেই আহারে বিহারেই বাঁধা। দুদিন উপোষী থাকো, দুদণ্ড আগু পিছু করে আসা যাওয়া করুক ষড়-ঋতু কন্যা, তাতে কিছু এসে যায় না। বেমিল অঙ্ক আবার মিলে যায়। সব শূন্যতাই যে গোলাকার। তার আদিও নেই অন্তও নেই। আছে চক্রাকার আবর্ত। তাই, যা-ই কর বাপু, জীবনে যতক্ষণ জড়িয়ে আছ ততক্ষণ ঐ আবর্তের টানে তুমি কলুর বলদ। তোমার হাসি কান্নায় ঠুলি পরানো। দাম নেই, কোন দাম নেই।

দেখতে দেখতে তাই আকাশ ধুয়ে ঝক ঝকে নীলের সমারোহ ফুটে ওঠে। গোবর্ধনের কোলে পিঠে কাশের বনে শাদা মেঘেরা নেমে এসে সবুজ ক্ষেতে দোল খায় আর গাভীমুখে জাবর-কাটা ফেনা জমে জমে শরতের মেঘ হয়ে আকাশে ভাসে। রোদে ঝরে মিঠে আমেজ।

৭

গোকুলে এই সময় বড় হুড়ো তাড়া। সবার সঙ্গে গোপরাজ নন্দকে ব্যস্ত থাকতে হয় জাতীয় উৎসবের তোড়জোড়ে। সম্বৎসর শেষে গোপেদের এটাই বড় উৎসব। ইন্দ্রোৎসব।

মল্লযুদ্ধ, গো-শকট প্রতিযোগিতা, ইন্দ্রধ্বজা পুজো, ব্রতগান, নৃত্য, কথকতা। কাজ কি একটা? লতায় পাতায় কুটীরগুলি সাজিয়ে তোলা। গৃহ প্রাচীরে নতুন করে চিত্রাবলী আঁকা। মণ মণ দুধ দই ক্ষীর নবনী আখ গুড়ের ভিয়েন বসিয়ে পূজার উপাচার বানানো। বলির জন্য সবচেয়ে নধর গো মহিষ ছাগশিশু বাছাই করা। পুরুষ রমণী, ছেলে বুড়ো—এক দণ্ডের ফুরসুৎ নেই কারো। উৎসবের দিন এগিয়ে আসে হু হু করে।

ব্যস্ত নন্দকে ফাঁকায় পেয়ে এক সময় যশোদা এসে পাশে বসেন।

বলেন,—ইন্দ্রোৎসবের কতা বলে ছেলেদুটোকে এবার ফিরিয়ে আনো না ঠাকুরের আশ্রম থেকে! কত যুগ হয়ে গেল যেন, বাছারা যে কেমন আছে, তাও জানতে পারলুম না।

নন্দ পরিষ্কার আকাশে মুখ তোলেন। মনে মনে বলেন,—ঠাকুর! আর কেন, এইবার তো তোমার রাম কৃষ্ণকে বৃন্দাবনে ফিরিয়ে দিয়ে যাবার কথা। তুমি কি তোমার সেই পিতিজ্ঞে ভুলে বসে আছ?

মনে পড়ে। গর্গ বলেছিলেন—ভাবিস না নন্দ। ঠিক ইন্দ্রোৎসবের মুখে মুখে তোর ছেলেরা তৈরী হয়ে বৃন্দাবনে ফিরে যাবে। তখন দ্বিগুণ উৎসব করবি। তবে সেটা আর ইন্দ্রোৎসব হবে না। হবে গো-গুরু-গোবর্ধনের পুজো। এখন এসব কথা কারো কাছে ভাঙিস না। কৃষ্ণ গিয়ে সব কথা গুছিয়ে বলবে। যেমন বলবে ঠিক তেমনি করবি।

—কিন্তু প্রভু! সভয়ে নন্দ বলেছিলেন যুক্তকরে,—ইন্দ্র পূজা বন্ধ হলে আমরা যে দেবরাজের কোপে পড়ব।

গর্গ হেসেছেন,—সে কি কথা নন্দ! স্বয়ং বিষ্ণু যার সহায় তার আবার ভয় কাকে। বিষ্ণুর প্রতিনিধিই তো কৃষ্ণ। বিপদ হলে কৃষ্ণই রক্ষা করবে। আমার আশীর্বাদ নিয়ে নিশ্চিন্তে ফিরে যা।

ফিরে এসেছিলেন নন্দ। কিন্তু নিশ্চিন্ত মনে নয়, বুকে পাথর নিয়ে। গর্গ জ্যোতিষী। মানুষের ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান, তিন তিন কালের কথা খড়ি টেনে বলে দিতে পারেন। দেবতাদের বাসভূমি স্বর্গলোকে তাঁর হরদম যাতায়াত। তবু নন্দর সন্দেহ হয়, গর্গের গণনায় কোথাও ভুল আছে। আছে পাগলামি নয়ত একরত্তি ছেলে কৃষ্ণকে দেখিয়ে কেউ কি বলে, ঐ কৃষ্ণই রক্ষা করবে দেবরাজ ইন্দ্রও কৃষ্ণের তেজে হার স্বীকার করে ফিরে যাবেন। ভয় নেই!

মন থেকে ভয় যায় না দেখে গর্গ অসহিষ্ণু গলায় বলেছিলেন,—আমি বলছি, তবু ভয় তোর যায় না? তবে শোন্, যেখানে কৃষ্ণ, সেখানে অদৃশ্যভাবে থাকবেন বিষ্ণুর অনুচরেরা। আগেই সব কিছু ঠিক হয়ে গেছে স্বর্গলোকে। ইন্দ্রের সঙ্গে বিষ্ণুরও হয়েছে বোঝাপড়া। এর চেয়ে বেশি কিছু আর বুঝতে চাস না। যা বললাম তাই কর, নাহলে কোনো বিপদই এড়াতে পারবি না। ভীতচকিত নন্দ আর প্রশ্ন করেন নি। লাভ নেই। সব কথা মনে পড়ে নন্দর। তবু আশঙ্কা ঘোচে না। অসহায় চিন্তাক্লিষ্ট স্বরে যশোদাকে উত্তর দেন,—এই বোধহয় তাদের আসার সময় হল, যশো। বৃন্দাবনে উৎসবের আনন্দরোল উঠেছে। এইবার তারাও আসবে।

—আসবে, তাই না? আমারও মন বলছে, আজ তারা আসবেই। বুকের মধ্যে গুরু গুরু দুরু দুরু শুনতে পাচ্ছি যে আমি ওগো কখন আসবে আমার কানু!—ব্যগ্র নন্দরাণী আরও ব্যাকুল হয়ে ওঠেন।

নন্দ বিব্রত বোধ করেন,—এই দেখো দেখি, অমনি শুরু করলে। তা আমি কি দিব্যদৃষ্টির মালিক? মন বলছে আসবে। তুমি বরং কানুর জন্যে নাড়ু তোয়ের করো। সে তোমার হাতের পাক ছাড়া খায় না।

যশোদার হেঁসেলে ঢোকার ইচ্ছে নেই। এখান থেকে উন্মুক্ত চরাচরে চোখ রেখে প্রতীক্ষা করতে চান। ঐ দূরে কৃষ্ণের ছোট্ট মূর্তি ফুটে উঠবে, সবার আগে তিনিই তা দেখবেন।

বলেন,—আসুক না ছেলে। আগে আমার বুকে ঝাঁপিয়ে আসবে, তবে তো নাড়ু। আমি বরং এইখেনে বসি। সে এসে তো প্রথমে আমাকেই খুঁজবে।

যশোদাকে অন্যমনস্ক রাখার জন্য নন্দ বলেন,—ওহো, ছেলে বুঝি শুধু তোমার? কেন, আমি তার বাপ নই? সে আমার কাছেই আগে আসবে।

—কখ্খনো নয়।

—দেখে নিও।

—দেখতে হবে না। আমি চিনি না, চেনো তুমি? নিব্‌বুদ্ধি গোয়ালা রাজা!

—এই, তুমি কিন্তু আ ··

নন্দর মুখের কথা মুখেই থাকে দূরে কলরব করতে করতে রাখাল বালকেরা নন্দালয়ের দিকে দৌড়ে আসে। যশোদা ও নন্দ দুজনেই নেমে আসেন আঙিনায়।

ছেলের দল চিৎকার করে ছুটে আসে,—কানু এসলো, কানু। তোমরা এসো গো। কানু এসলো, কানু।

—কানু!

হুড়মুড় করে যশোদা ছোটেন ছোটেন নন্দ। আর তাঁদের পেছনে ছোটে গোপ গোপিনীর দল। দেখা যায়, দূর দৃশ্যপটে রাখাল বালকেরা কৃষ্ণ ও বলরামকে কাঁধে নিয়ে নৃত্য করতে করতে এগিয়ে আসছে।

দেখতে দেখতে আবালবৃদ্ধবণিতায় ছেয়ে যায় নন্দালয়ের বহির্বাটির প্রশস্ত আঙিনা। যশোদা ভাঁড়ার ঘর খুলে দিতে বলেন রোহিণীকে। দুধের মিষ্টি, নারকেলের নাড়ু, সরের খাবার, মুড়কী বাতাসা যা আছে নিয়ে এসো। কানুর আগমনে খুশি হয়ে যারা ছুটে এসেছে রাজবাড়ি, তাদের কেউ যেন মিষ্টিমুখ না করে না যায়। আজ বড় আনন্দের দিন, উৎসবের ক্ষণ।

গোপসখাদের কাঁধ থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়ে কৃষ্ণ। চোখ ঘুরিয়ে চারদিক দেখে। তারপর সোজা নন্দের পাশে এসে দাঁড়ায়। যশোদা যেন তার লক্ষ্যেও পড়েন না। নন্দ চকিতে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে একটু বিমর্ষ বোধ করেন। যশোর হর্ষোৎফুল্ল মুখখানি মলিন হয়ে গেছে কিশোর কৃষ্ণের অনাদরে। একটু আগেই স্ত্রীর সঙ্গে ছেলেকে নিয়ে ঝগড়া করেছিলেন নন্দ। ছেলে ফিরে এসে তাঁর কাছেই দাঁড়িয়েছে। জিত হয়েছে নিব্‌বুদ্ধি গোয়াল রাজার। কিন্তু নন্দ তাতে খুশি হন নি। বরং কৃষ্ণের নিষ্ঠুরতায় দুঃখই পেয়েছেন। কৃষ্ণ কি জানে না, এই দীর্ঘ সময় কত অসংখ্য যুগের মতো দীর্ঘায়িত হয়েছিল যশোদার কাছে। সন্তানের বিরহে তিনি প্রায় উপবাসেই দিন কাটিয়েছেন। বড় আশা ছিল, কৃষ্ণ এসেই তাঁর শূন্য বুকে ঝাঁপিয়ে পড়বে। তিনি তাকে বুকে চেপে ধরে জমানো অশ্রু অবাধে ঝরিয়ে দেবেন। কিন্তু তা তো হল না। কৃষ্ণ কি তবে গর্গালয় থেকে নোতুন মন মেজাজ নিয়ে ফিরল। যশোর ছেলে কি পাল্টে গেল? বেদনা ছাপিয়ে বিস্ময় বড় হয়ে ওঠে। নন্দ অবাক চোখে কৃষ্ণের দিকে তাকান।

কৃষ্ণও মুখ তুলে তাকায়। চোখে যেন কেমন এক জাতের অপরিচিত দৃষ্টি।

মনে হয়, কিশোর গোপাল বয়স্ক মানুষেব বিরক্তি নিয়ে নন্দকে ভর্ৎসনা করছে।

কৃষ্ণ ক্ষুব্ধ স্বরে মুখস্থ বক্তৃতা আবৃত্তি করে যেন। এক নিঃশ্বাসে বলে যায়, চারদিকে উৎসবের ধুম পড়ে গেছে। কিসের জন্য, কার জন্য এই উৎসব, বাবা ?

কৃষ্ণের প্রশ্ন শুনে সবাই তো অবাক। এ আবার কেমন কথা ? প্রতি বছরই তো গোপকুলে ইন্দ্রযজ্ঞ হয় এই সময়। গত সনও হয়েছে। হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন ?

জনৈক বৃদ্ধ গোপ বলেন,—এ কেমন কথা বলছ গো গোপাল ? বর্ষা শেষ হয়ে শরৎ এসে গেল। এ যে আমাদের ইন্দ পুজোর সময়। এই একটাই তো বড় পরব। গত সনও হয়েছে, ভুলে গেছ ?

কৃষ্ণ যেন সেসব কথা শুনতেই পায় না, বলে —কেন ? ইন্দ্র পুজোর দরকার কি ? ইন্দ্র কে ? আমাদের জন্য কী করেন তিনি ?

নন্দ তাঁর প্রজাকুলেব মুখের দিকে তাকান। সকলের মুখেই বিস্ময় ও বিরক্তি। তাদের মুখ দেখে তাদের মনের কথা পড়তে পারেন নন্দ। মনে হয়, সমবেত জনতা বলতে চাইছে, এত টুকুন ছেলের মুখে কী অলুক্ষণে কথা আর কী দুঃসাহস ? দেবরাজ ইন্দ্র কে, এ প্রশ্ন কি কেউ করে ? নন্দ কি কোনো শিক্ষাই দেন নি তাঁর আদুরে ছেলেকে। নেহাৎ মোড়লপো, নাহলে বডদের হাতে চড-চাপড় খেয়ে আজ তাকে শুধু চোখের জলেই ভাসতে হত। কিন্তু গোপরাজ নন্দের ছেলেকে তো কারো শাসন করার অধিকার নেই। তাই নিঃশ্বাস বন্ধ করে নির্বোধ কৌতূহলের সঙ্গে সমবেত জনতা শুধু ব্যাপারটি লক্ষ্য করে।

নন্দ বিচলিত হয়ে বলেন,—ছি, অমন কথা বলতে নেই। দেবরাজ ইন্দ্র আমাদের জল দান করেন। সেই জলে চাষাবাদ হয়, আমরা দুটো খেয়ে বাঁচি। তিনি যদি মুখ ফিরিয়ে নেন পুজো না পেয়ে, তবে পৃথিবীর মানুষ তেষ্টায় হাহাকার করবে। তাই তো অনেক দেশের রাজারাও ইন্দ্রযজ্ঞ করেন।

কৃষ্ণ প্রবলভাবে মাথা দুলিয়ে বলল,—মোটেও সব রাজ্যের রাজারা ইন্দ্রযজ্ঞ করেন না। আর আমাদের তো ইন্দ্রযজ্ঞ করার কোনো কারণই নেই। কেননা আমাদের জীবিকা কৃষি নয়। পশুচারণই গোপেদের প্রধান অবলম্বন। গাভীরাই আমাদের অন্নদাত্রী। তাই আর ইন্দ্র পুজো করব না আমরা। গাভীই আমাদের প্রধান সম্পদ, আর সেই গাভীদের বাঁচিয়ে রাখে যে তৃণভূমি, ঐ দেখুন, সেই বিস্তীর্ণ গোচারণক্ষেত্র গোবর্ধন পর্বতের আশ্রয়ে কী সুন্দর সবুজ ও সতেজ হয়ে আছে। গোবর্ধনের বনরাজিও আমাদের জীবন ধারণের উপায় স্বরূপ। জীবন-

দায়িনী সেই গো এবং গিরি গোবর্ধনই আমাদের একমাত্র পূজ্য। তাছাড়া পূজনীয় হলেন ব্রাহ্মণরাও। তাঁদেব আশীর্বাদেই আমাদের কল্যাণ।

—হে গোপগণ! দেখো, আমরা গো-গিরি ও ব্রাহ্মণের দ্বারাই উপকৃত, তাই আজ থেকে আমাদের তাঁদেরই পূজা করা উচিত। অকৃতজ্ঞ তারাই যারা যার দ্বারা উপকৃত, তার পূজা না করে অন্যের পুজো করে। আপনারা ইন্দ্রযজ্ঞের যে আয়োজন করেছেন সেই আয়োজনের দ্বারাই গো ব্রাহ্মণ ও গোবর্ধনের যজ্ঞ করুন। ইন্দ্রযজ্ঞ পরিত্যক্ত হোক![১]

কৃষ্ণের দীর্ঘ যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতায় চমৎকৃত গোপেরা নিজেদের মধ্যে বিতণ্ডা ও তর্কের গুঞ্জন তুলল। কিন্তু তারা নিজেদের মতামত প্রতিষ্ঠিত করতে পরস্পরে এমনি ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ল যে সব চেয়ে বড় প্রশ্নটাই ভুলে গেল। কেউ প্রশ্ন করল না, এমন ভাষা এমন যুক্তি কি বাল গোপালের নিজের কথা? একরত্তি ছেলে কৃষ্ণের পক্ষে এমন একটি গুরু গম্ভীর সারগর্ভ বক্তৃতা করা কী করে সম্ভব; আর অকস্মাৎ ইন্দ্রযজ্ঞ পরিত্যাগের উপদেশ ও প্রেরণাই'বা সে পেল কার কাছ থেকে?

কিন্তু কী আশ্চর্য, নন্দ গোপ মেনে নিলেন কৃষ্ণের প্রস্তাব। পরিত্যক্ত হল সুপ্রচলিত ইন্দ্রযজ্ঞ এবং আদেশ হল, ইন্দ্রযজ্ঞের বদলে গো গিরি-ব্রাহ্মণ পূজার।

গোপকুলেও দুএকজন চিন্তাশীল বৃদ্ধ না ছিল এমন নয়, কিন্তু তাদের ক্ষীণ প্রতিবাদে কেউ কান দিল না। গিরি যজ্ঞের ঘোষণা হতেই ভিড়ের মধ্যে কারা যেন কৃষ্ণের নামে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণসখা রাখাল বালকরাও মহা উল্লাসে কৃষ্ণকে কাঁধে তুলে কৃষ্ণনামে জয়ধ্বনির প্রতিধ্বনিতে নন্দালয় মুখরিত করে তুলল। শিশুর সারল্য নিয়ে উৎসবে মেতে উঠল অনেক নন্দস্তাবক বয়স্ক গোপপুরুষ। সুতরাং প্রতিবাদীদের কথা আর শোনা গেল না।

কৃষ্ণকে নিয়ে যখন নৃত্যোৎসব হচ্ছে, ব্যর্থ যশোদা অভিমানভরে সজল চোখে দাঁড়িয়ে আছেন এক পাশে, ব্রজবালারা বিভিন্ন মিষ্টান্ন বিতরণ করছেন জনতার মধ্যে, তখন সেই জনতার মধ্য থেকেই কয়েকটি বালক আকাশের দিকে আঙুল তুলে চিৎকার করতে শুরু করল—ঐ দেবতা, ঐ দেবতা!

সমবেত সকলে দূর দিগন্তে দৃষ্টিপাত করে দেখলেন, একলা পাখির মতো একটি অদ্ভুত ধাতব প্রাণী গোবর্ধন পর্বতের দিকে নিঃশব্দে উড়ে যাচ্ছে। এমন জিনিস মাঝে মধ্যে আকাশে দেখা গেলে মানুষ সেদিকে তাকিয়ে বলে, দেবতারা সগ্গে যাচ্ছেন। ঐ ভাবে অনেক রাজাও নাকি প্রায়ই স্বর্গে যান। লোকে শুনেছে, তাই বলে। সেদিকে তাকিয়ে বৃদ্ধ ও বৃদ্ধারা করজোড়ে কপালে

হাত ঠেকান। নিজেদের মধ্যে ফিস্ ফিস করে বলেন, দেবতারা আজকাল প্রায়ই বেন্দাবনের আকাশ দিয়ে আসা যাওয়া করেন।

কানে কানে কথা গড়ায়, তাকে বলে গুজব। গুজব কে ছড়ায় তা জানা যায় না; কিন্তু সবার অলক্ষ্যে সে জিনিস খুব তাড়াতাড়িই ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। এই ঘটনার পর এমনি একটা গুজব ছড়িয়ে পড়ল। লোকে বলাবলি করতে লাগল, দেবতারাই সেদিন কৃষ্ণ বলরামকে গোকুলে পৌঁছে দিয়ে গেছেন ব্রজবাসীদের রূপ ধরে ছদ্মবেশে। তাঁরা সেদিন নন্দালয়ের সভাতেও ছিলেন। তাঁরাই কৃষ্ণনামে জয়ধ্বনির সূত্রপাত করেন। নাহলে এমন সব ঘটনা সবাইকে হতচকিত করে হঠাৎ ঘটে গেলই বা কী করে। রাখাল বালকরা কি আপনা থেকে কৃষ্ণের নামে জয়ধ্বনি করে সভার কাজ মাঝ পথে ভণ্ডুল করে দিতে পারে? তারা কি কখনো এমন কাজ করেছে? একটা জিনিস নিয়ে বেশি দূর তলিয়ে ভাবার মত মনের পরিপক্কতাই নেই গোয়ালাদের।

তারা বলে,—কে জানে কী ঘটতে চলেছে বৃন্দাবনে। কে জানে, কৃষ্ণ কে। তার কাজ কর্ম কথাবার্তায় তাকে সাধারণ রাখাল ছেলে বলে তো মনেই হয় না। এ ছেলে হয় গোকুলকে রক্ষা করবে, নয় গোপেরা ধনেজনে ধ্বংস হয়ে যাবে ঐ কৃষ্ণেরই কাজ কর্মের ফলে।

গোপালকেরা ইন্দ্রযজ্ঞের বদলে গোবর্ধন গিরির পুজো করল মহা ধুমধাম করে। ব্রজাঙ্গনারা তাঁদের গৌরকান্তি মসৃণ অঙ্গে নানা বিচিত্র বর্ণের তিলক কাটলেন, সর্বাঙ্গে লেপন করলেন মাঙ্গলিক করীষচূর্ণ।[২] গোপযুবাদের সঙ্গে বৃত্তাকারে নাচ ও গান করলেন তাঁরা গোবর্ধনের সানুদেশে।

গোবর্ধন পর্বত আকারে প্রকারে কোনো বিশাল পর্বতমালা নয়। উচ্চতাও যেমন তার আকাশছোঁয়া নয়, পরিধিও তেমনি নয় সুবিস্তৃত। কোনো এক কালে প্রাকৃতিক কারণে ভূমি সংক্ষোভের ফলে এই ক্ষুদ্রকায় পাহাড়ের সৃষ্টি। পাহাড়কে প্রদক্ষিণ করাও অসম্ভব ব্যাপার ছিল না। অল্প বয়স্করা বিভিন্ন পুজোপচার মাথায় নিয়ে গোবর্ধনকে প্রদক্ষিণ করল।

যেমনটি আশঙ্কা করা গেছল, তেমন কিছুই ঘটল না। নির্বিঘ্নেই সমাপ্ত হল গো-গিরি-ব্রাহ্মণের উৎসব।

গরুগাড়ি বোঝাই প্রণামী, দক্ষিণা, দান নিয়ে উপবতীধারী ব্রাহ্মণরা পরিতৃপ্ত মুখে প্রত্যাবর্তন করলেন। ব্রাহ্মণকে যে যত দিতে পারল সে ততই নিজেকে পুণ্যবান ভেবে সুখী হল। সেই সেই মানুষের পরকালে স্বর্গবাস যে সুনিশ্চিত, ব্রাহ্মণ তার আশ্বাস দিয়ে নিজের ইহলোকের কাজ গুছিয়ে ঘরে ফিরলেন।

স্বর্গলাভ সম্পর্কে ব্রাহ্মণের বড় একটা মাথা ব্যথা নেই। সমাজের মাথা-ওয়ালা মানুষরা বলেই দিয়েছেন, স্বর্গলোকে ব্রাহ্মণদের জন্য আস্ত আস্ত বাগান বাড়ি মার্কা করা আছে। সেখানে গেলে নাম কুলজী মিলিয়ে স্বর্গীয় তত্ত্বাবধায়ক দ্বার খুলে দেবেন। কিন্তু বাদবাকি মানুষের জন্য এমন অগ্রিম সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেই। আজীবন পালে পার্বণে ব্রাহ্মণকে দান করলে ব্রাহ্মণ তার আবেদন যজ্ঞের ধোঁয়ার সঙ্গে স্বর্গে পাঠিয়ে দেন। এতে চিত্রগুপ্তের বাধানো খাতায় কারো কারো নাম উঠতে পারে। একটা কুটীর মিলে যেতে পারে আবার মৃত্যুর পর। এইসব পাওনার সম্ভাবনা আছে বলেই না ব্রাহ্মণকে দান করার সার্থকতা। ইহলোকের সঞ্চয় ব্রাহ্মণের পায়ে উজাড় করে না দিলে এই জীবনের দুঃখ কষ্ট পরলোকেও সঙ্গে যায়। ব্রাহ্মণ ঋষি তাই বলেন, প্রশ্ন কোরো না। আজ তুমি যা দিচ্ছ, মৃত্যুর পর তার সুফল ভোগ করবে। মানুষ ভাবে, তাই তো! জীবনটা ভোগের আগেই রোগে শোকে শেষ হয়ে যায়। আয়ু যেন বাহারী কচু পাতার ওপর একফোঁটা রামধনু রঙের জল। মন্দ বাতাসে টুপ করে কখন ঝরে যায় কে জানে। কিন্তু মৃত্যুর পর সময় অনন্ত অসীম। সেই পরকালের ব্যবস্থা ইহকালের সর্বস্ব দিয়েও গুছিয়ে রাখা উচিত। ব্রাহ্মণ দেবতার প্রতিনিধি। তিনিই ব্যবস্থা করবেন স্বর্গবাসের

মানুষের এই বিজ্ঞতায় অলক্ষ্যে বসে ঈশ্বর হাসেন। ভাবেন, দেখো বুদ্ধি! মৃত্যুর পর তুমি কি আর তুমি? তোমার সুখ দুঃখ সবই তো তোমার দেহের ভোগ দুর্ভোগ। মৃত্যুর পর তোমার দেহ কৈ? আর পরকালের তত্ত্ব দেবতারাই জানে না, ব্রাহ্মণে কী বোঝাবে তোমায়?

আসলে ঈশ্বরকে চিনতে চায় না কেউ। ভাবে, মস্ত বড় বড় কেতাবের মতই ঈশ্বর নামক বস্তুটিও দুর্বোধ্য। গুরু আর ব্রাহ্মণেই তাঁর তত্ত্ব বোঝে। ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁদেরই আলাপ সালাপ হয়। তাই তাঁরা ভগবান। ঈশ্বরকে যা দিতে হয়, তাঁরা হলেন তারই অংশীদার। ভগ মানে অংশ।

ঈশ্বর আরও একবার হাসেন। তবে সে হাসি বড় অসহায়। ভাবেন, যারা আমায় চিনতে চায় না, তাদের আমি চেনাবো কী করে! মনে করো, একটা জাহাজে তুমিও আছ, তোমার গুরু ব্রাহ্মণও আছে। হঠাৎ ঝড়ে জাহাজ গেল ডুবে। তুমিও ডুবলে, তোমার গুরু ব্রাহ্মণও ডুবল। দেখো, পাহাড়ে চলেছ সার বেঁধে। এলো তুষার ঝড়। তুমি বললে, হা ঈশ্বর! তোমার গুরু ব্রাহ্মণও বলল, হা ঈশ্বর! ঝড় যদি তোমাকে নেয় তবে তোমার গুরু ব্রাহ্মণকেও নেবে।

একটা কুটীরে গুরুকে খট্টাঙ্গে শুইয়ে তুমি ভক্তি ভরে মেঝেয় শুয়েছ। ঘরে লাগ
আগুন। তুমি পুড়লে, ব্রাহ্মণ দিব্যি নশ্বর শরীরে জীবিত রইল, এমনটা কি হয়
প্রকৃতিকে যদি ঈশ্বরের শক্তি ভাবো, তবে প্রকৃতির যে নিয়ম তোমাতে, সে
নিয়ম তোমার গুরু ব্রাহ্মণের ওপরেও। যেখানে নেই বাতাস, সেখানে শ্বাসরুদ্ধ
হলে দুজনেই মরবে। যে অন্ধকারে তুমি দেখতে পাও না, সে অন্ধকারে তিনি
কি পুঁথি পড়তে পারেন? যদি এসবই দেখছ, তবে ঈশ্বরের করুণায় উনিশ বিশ
আছে, এই ভেবে ঈশ্বরকে ছোট করছ কেন? যা কিছু বিরাট, তার মধ্যে
ঈশ্বরকে দেখো, তাহলেই বুঝবে, বিশাল অখণ্ডের কোলে তুমিও যা, তোমার গুরু
ব্রাহ্মণও তাই। ঈশ্বরের চোখে কেউ ছোট, কেউ বড় নয়। মানুষ ছোট আর
বড় তার জ্ঞানে। তোমাকে জ্ঞান থেকে যারা বঞ্চিত করে, তারা তোমার ঈশ্বর-
ভাবনাকে কেড়ে নিয়ে তোমার মাথার ওপর জাল ঈশ্বর হয়ে বসে থাকে। তুমি
যদি সাবধান হও, ঠকবে না।

কিন্তু এসব কথা ভাববে এমন মানুষ কোথায় গোকুলে? তারা
যেন শূন্যে ঝোলানো এক একটা দোলা। বুদ্ধিমানে যেমন দোলায় তেমনি
দোলে।

সেই দোলার এক ঠেলায় যারা আগে ইন্দ্রযজ্ঞে মেতেছিল, আর এক ঠেলায়
তারাই গো-গিরি-গোবর্ধনের পুজো করল পুণ্যলোভে। কটা দিন বেশ কেটে
গেল তরতর করে। কিন্তু তার পরেই হঠাৎ আকাশ থেকে শিলাবৃষ্টি শুরু হল।
ঝড় উঠল গম গম করে। কয়েকদিন প্রবল বর্ষণে ত্রাহিত্রাহি রব উঠল বৃন্দাবনের
গো-কুলে।

এই দুর্যোগ দর্শনে কয়েকজন বৃদ্ধ গোপ ব্রজবাসীর মনে আর এক উল্টো
ঠেল দিলেন।

জনে জনে ডেকে বললেন,—হ'ল তো সর্বনাশ? ইন্দ্রযজ্ঞ বন্ধ করতে তখন
আমরা পই পই করে মানা করেছিলাম নন্দগোপকে। মোড়ল আমাদের কথায়
কান দিল না। একরত্তি ছেলে কৃষ্ণের লম্বা চওড়া কথায় দেবরাজকে দিল
রাগিয়ে। আর দেখো, আমাদের গরীব গুবরো ছেলেগুলোও নেচে উঠল
রাজপুত্তুরের কথায়। জয় জয় করতে লাগল গোপাল কৃষ্ণের। এখন বোঝো।
কে সামলাবে গো-কুলকে?

সবাই নিজের নিজের ছেলেকে শাসন করে বলল,—বড়দের কথা শেষ হল
কি হলনা, তোরা কৃষ্ণর নামে জয় দিয়ে সেদিনের সভা পণ্ড করে দিলি? কে
তোদের কত্তাত্তি করতে বলেছিল।

প্রতি ঘরেই রাখাল ছেলেরা বললে—কৈ তারা তো 'জয়' দেয়নি। কারা যেন হৈ হৈ করে বলে উঠল,—জয় কৃষ্ণের জয়! জয় বিষ্ণুর জয়!

—কৃষ্ণকে কাঁধে তুলল কারা?

—তাদের আমরা চিনি না। কখনো দেখিনি। তারা প্রথমে তুলল। তাদের কাঁধ থেকে আমরা কানুকে কাঁধে নিলাম। ওরা বোধহয় নন্দাজীর নোতুন দলের মানুষ।

—ভারি আশ্চর্য কথা! গোলমালের মধ্যে কেউ এসব লক্ষ্যই করেনি সেদিন?

—তবে আব ছোটদেব দুষছ কেন? চলো, নন্দ গোপের আঙিনায় যাই। একটা ব্যবস্থা না হলে, গরু আর মানুষের শ্মশান হয়ে যাবে বৃন্দাবন।

হৈ হৈ কবে গোপালকরা ছুটে এলো নন্দালয়ে। যেন একটা মস্ত বাথান উঠে এলো নন্দ গোপের আঙিনায়, গোপালকদের দেহ আর বসনের বাসে নন্দের প্রাসাদ ভরে উঠল। নন্দ গোপ হুড়তে পুড়তে আঙিনায় এসে দুহাত তুলে বললেন,—শান্ত হও, সবাই শান্ত হও।

কিন্তু কপালে যাদের বজ্রাঘাত তাদের শান্ত হও বললেই কি কাজ হয়। আজ বুঝি কেউ আর নন্দকেও মানবে না। সবাই সমস্বরে বলল,—তুমি তোমার আদরের দুলালকে নেতা করে আমাদের ভাসিয়ে দিলে, নন্দ! এখন ইন্দ্রের কোপ থেকে বাঁচবে কেমন করে, বাঁচাবে কেমন করে। ছিঃ ছিঃ, সেদিন আমরা রাজি হই নি। তুমিই আদেশ দিয়েছিলে গিরিযজ্ঞের। এখন আশ্রয় দাও সকলকে, আর আমাদের গাভীগুলোর ব্যবস্থা করো! কোথায় তোমার আদরের কৃষ্ণ! এখন তাকে দেখছি না কেন? শোনো, ঐ বজ্রপাত হচ্ছে।

নন্দ কৃষ্ণের খোঁজে ভেতরে লোক পাঠালেন। কৃষ্ণকে পাওয়া যাচ্ছে না। যশোদা পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসেছেন। নন্দকে কিন্তু বিশেষ বিচলিত দেখালো না। তিনি জনতার দিকে তাকিয়ে বললেন,—ভয় পেও না। দেবরাজ ইন্দ্র যদি বিমুখ হয়ে থাকেন, তবু ভয় পেও না। এসো, আজ থেকে আমরা বিষ্ণুর শরণ নিই। তিনিই বৃন্দাবনকে রক্ষা করবেন। হ্যাঁ এই আমি, নন্দ গোপ, তোমাদের নিশ্চয় করে বলছি, যেখানে কৃষ্ণ, সেখানে কারো অমঙ্গল হতে পারে না। কৃষ্ণই আমাদের রক্ষা করবেন।

জনৈক বৃদ্ধ গোপ ক্ষুব্ধ স্বরে বললেন,—এখনো তুমি কৃষ্ণ কৃষ্ণ করছ! বুড়ো বয়সের ছেলে নিয়ে তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে নন্দ, তোমার সঙ্গে কি দেবতা বিষ্ণুর দেখা হয়েছে? তোমার কথায় বিশ্বাস কি?

নন্দ জনতার মধ্যে কি যেন, কাকে যেন খুঁজলেন। বাইরে ঝড়ের গর্জন বাড়ছে, তবে এখনো কোথাও কারো ঘরবাড়ি পড়ে যায় নি। হাওয়ার বেগে তেমন তীব্রতা নেই। মনে হচ্ছে, ঝড় বইছে পাতালে অথবা আকাশে। তারই গর্জন গোকুলবাসীকে উদ্বিগ্ন করেছে। অবশ্য বর্ষণের বেগ আছে। আকাশ কালো মেঘে আচ্ছন্ন, যদিও এখন সাধারণ ভাবে বর্ষার সময় নয়! এটা ঝকঝকে রোদ্দুর আর সাদা মেঘের ঋতু। শরৎ কাল। গোবর্ধনের গায়ে গুচ্ছ গুচ্ছ কাশফুলের সাদা চামর ভারি সুন্দর শোভা ধারণ করেছে। এই অকাল বর্ষণে তাই গোকুলবাসী ভীত। ইন্দ্রের ক্রোধের কথাই তাদের আরও আশঙ্কাতুর করেছে।[৩]

নন্দ বললেন,—সময় হলে সব কথাই তোমরা জানবে।

বোধহয় আরও কিছু বলতেন, কিন্তু গোবর্ধন পর্বতের ক্রোড়ভূমি থেকে এই সময় ভেসে এলো ভুবন কাঁপানো বজ্রনিনাদ। বজ্রপাতের ধ্বনির সঙ্গে এই শব্দের তফাৎ আছে। এ শব্দ যুদ্ধের তোপধ্বনির মতো ভারি এবং গুরু গম্ভীর। শব্দের সঙ্গে মিলিতভাবে মেদিনী বিদীর্ণ হওয়ার আওয়াজে কেঁপে উঠল চারদিক। ভয়ে বিবর্ণ গোপেরা নন্দের আঙিনা থেকে শব্দ লক্ষ্য করে গোবর্ধন পর্বতের দিকে তাকালো। আবছা অন্ধকারেও তাদের চোখে পড়ল এক অদ্ভুত দৃশ্য। ছায়ার মতো গোবর্ধন যেন বিদীর্ণ হয়ে ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে। পাথরের গোলা ছিটকে উঠছে আকাশের দিকে।[৪]

—কী হচ্ছে? ওখানে কী হচ্ছে, নন্দ? গোবর্ধন ফেটে গিয়ে এই গোকুলের ওপর হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে। এখনও সবাই ইন্দ্রর নামে জয় দাও। যদি বাঁচতে চাও····· সাবধান সবাই সাবধান!

চারদিকে হুড়োহুড়ি আর ছুটোছুটি পড়ে যায়।

—না! তোমরা স্থির হও। ঋষি গর্গ বলেছেন, আমাদের কোনো ক্ষতি হবে না।—গলা চড়িয়ে আদেশের স্বরে নন্দ চিৎকার করে উঠলেন।

দূরে তোপধ্বনির মতো সেই বিকট আওয়াজে পুনরায় হাহাকার উঠল গো এবং গোপালকদের মধ্যে।

আশ্বাস দিলেন বটে নন্দ, আদেশ করলেন সকলকে প্রভু বসুদেবের মতোই, কিন্তু গোবর্ধনের আকাশে বাজি ফাটার আগুন দেখে ভয়ে তিনিও বসে পড়লেন দাওয়ার ওপর।

বাইরে চলেছে শিলাপতন। টুকরো টুকরো পাথর বর্ষণ। মাথার ওপর

চক্রাকারে ঘুরছে একটা দেবযান। কারো মুখে কথা নেই। মৃত মানুষের মতো ঠক্-ঠক্ করে কাঁপছে সবাই।

আকাশের সেই উড়ন্ত যান যেদিকে যায় পাথর ছড়িয়ে পড়ে সেইদিকে।

নন্দর নেতৃত্বে আস্থা হারিয়ে ফেলে বন্ধু সুনন্দও।

সরোষে সুনন্দ বলে ওঠে,—ইন্দ্রই শিলা ছুঁড়ছেন আকাশ থেকে। নন্দর মাথা গোলমাল হয়েছে। তোমরা ইন্দ্রর নামে জয় দাও! বলো, জয় প্রভু ইন্দ্রের জয়!

কম্পিত বিকৃত কণ্ঠে মেয়ে পুরুষ একসঙ্গে চিৎকার করে,—জয়, প্রভু ইন্দ্রের জয়। হে ইন্দ্র, আমাদের বাঁচাও! আমরা তোমারই পুজো দেব।

ভিড়ের মধ্যে যশোদাকে উন্মাদিনীর মতো ছুটোছুটি করতে দেখা যায়। তিনি জনে জনে প্রশ্ন করেন,—হ্যাঁগো, তোমরা আমার কানুকে দেখেছ? আমাদের বলাই কোথায়? ওরে কেউ তাদের খুঁজে দেখ না।

কিন্তু আজ কেউ নন্দরাণীর হুকুম তামিল করতে গোবর্ধনের দিকে ছুটে যাওয়ার ভরসা পায় না। শ্রীদাম সুদামকেও দেখা যাচ্ছে না কাছে পিঠে। তাদের মায়েরাও কপাল চাপড়ে হাহাকার করে কাঁদে।

যশোদার আঁচল ধরে টানে সুনন্দর মেয়ে গোরী (গৌরী)।

—ও জেঠি, এদিকে এসো, রোহিণী জেঠি ডাকছে তোমায়।

যশোদা দাবড়ে ওঠেন,—ছাড় মুখপুড়ি! দিন নেই রাত নেই কানুর পেছনে ছুক ছুক করে ঘুরিস। এখন মেয়ে জানে না তার কানু কোথায়। দূর হ', সবাই দূর, হ'।

গোরী এমনিতেই কাঁদছিল, এবার হাউহাউ করে কেঁদে ওঠে,—জেঠি, উতলা হোসনা, নিশ্চয় কানু ফিরবে। আমি দেখেছি, কাল তার সঙ্গে গোবর্ধনের পায়ের তলায় দেবতারা কথা বলছিল। মনে হয়, সে দেবতাদের সঙ্গেই আছে। দেখছ না, পাহাড়ের কাছে কী সব হচ্ছে। আগুনে রঙে অন্ধকার আলো হয়েছে। যেন বাজি ফাটছে ওখানে। জন্তুরা ডাক ছেড়ে পালাচ্ছে, শুনতে পাও না!

—সে তো ইন্দ্রর রাগ বেড়েছে বলে।—যশোদা আশার কথা শুনতে চান।

গোরী মাথা নাড়ে,—না গো! কানু জানে, দেবতারা কি চান। তাকে তোমরাই জানো না।

—থাক, আর সেই পাজিটার হয়ে তোকেও পাকামি করতে হবে না।

—মাগো কী আওয়াজ!

গোরী তবু আঁচল ধরে টানে,—এদিকে এসোই না। রোহিণী জেঠিকে বলাইদা কী যেন বলে গেছে।

—বলাই! বিস্ফারিত চোখ ফেরান যশোদা। গোরী মাথা নাড়ে।

—চল্ দেখি!

রোহিণী সবার সামনে বার হন না। অন্দরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে তিনি গোবর্ধন পাহাড়ের দিকে বহ্ন্যুৎসব দেখছিলেন।

গোরী দৌড়ে আসে, পেছনে হাঁফাতে হাঁফাতে যশোদা.—হ্যাগা, দিদি, বলাই নাকি কী সব বলে গেছে?

রোহিণী শান্তভাবে মুখ ফেরান। এতো যে ভয় ভাবনা চাঞ্চল্য চারদিকে, রোহিণীর মধ্যে তার কোনো লক্ষণই নেই। তিনি শহরের মেয়ে। রাজপুরুষের মহিষী। কত জানেন, কত শিখেছেন।

রোহিণী যশোদার কাঁধে হাত রেখে বললেন,—উতলা হোস্ না বোন। কোনো ভয় নেই। বলাইয়ের সঙ্গে কানু গেছে পাহাড়ের কাছে। সঙ্গে শ্রীদাম সুদাম আর ঠাকুরপোর আনা নোতুন ছেলের দল। ওরা একটা ব্যবস্থা করছে। নন্দাজী সব জানেন। তিনি যা বলছেন, ঠিক কথা। আমরা ইন্দ্রের চেয়ে বড় দেবতা বিষ্ণুর আশ্রয়ে আছি। গোকুলের কোনো ক্ষতি হবে না। শান্ত হ'।

যশোদা হাঁ করে তাকিয়ে থাকেন বড় বড় চোখে।

গোরী রোহিণীর বুকে মুখ গুঁজে বলে,—বড় জেঠি। তুমি ঠিক জানো, ওদের কিছু হবে না?

—হ্যাঁ রে পাগলী। কোনো ভয় নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে।—রোহিণী সস্নেহে গোরীর মাথায় হাত বোলান আর তাঁর মুখে ফুটে ওঠে রহস্যময় হাসি। তিনি যেন কোনো উৎসবে বাজি ফোটানো দেখছেন, যে বাজির কথা এখানে কেউ জানে না। ভারি নিশ্চিন্ত আর নিরুদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে রোহিণী দেবীকে।

যশোদা ফিরে দাঁড়ান,—যাই তা হলে, কানুর বাপকে বলে আসি খবরটা।

রোহিণী বাধা দেন,—কিছু বলতে হবে না। বোস্ দেখি তুই এখানে চুপ করে। বাইরে তাকিয়ে দেখ, এমন দৃশ্য আর কখনো দেখতে পাবি না। আকাশে এক ফোঁটা মেঘ নেই, হুড়হুড় করে জল ঝরছে, পাথরের টুকরো পড়ছে, ইন্দ্রের রথ উড়ছে, সঙ্গে আরো কটা।

যশোদা রাগে মুখ ঘুরিয়ে নেন। মনে মনে বলেন, আ মরণ! এই নাকি আবার কাব্যি করার সময়। হবে না কেন, ও-তো কেবল ছেলে পেটেই

ধরেছে। বুকে এক ফোঁটা দুধও নেই। আমিই না দুটো ছেলেকে একসঙ্গে মানুষ করলুম। যার বাছা তারই বাজে, স্বামীতে তাড়ানো মেয়েমানুষের আবার মন। এতোই যদি রঙ্গ জানিস, তবে স্বামীকে ধরে রাখতে পারলি না কেন?

কিন্তু মন ফাটলেও মুখ ফোটে না নন্দরাণীর। কারো মনে কষ্ট দিয়ে কথা বলতে পারেন না তিনি। নীরবে ফিরে যান বাহিরবাটির দাওয়ায়।

যশোদা ফিরে এসে নন্দকে জনান্তিকে ডেকে রোহিণীর কথা বললেন, বলে অনুনয় করলেন,—গিয়ে দেখো না, ছেলেগুলো করছে কি? রোহিণী কী সাংঘাতিক মেয়েমানুষ! এই অবস্থায় দিব্যি নিশ্চিন্ত আছে, আবার হাসছে। তোমরা বুড়ো মদ্দরা শুধু জটলাই করছ। কাঁচ ছেলেগুলোর খপর করবে, না আমি ছুটব সেখানে?

নন্দ অবাক হন রোহিণীর কথা শুনে। তাঁর ধারণা ছিল ঋষি গর্গ শুধু তাঁকেই জানিয়েছেন, ইন্দ্র পুজো বন্ধ করার খেলা দেবতারা কী ভাবে খেলবেন! কিন্তু বসুদেব পত্নী রোহিণীও কি তা জানেন? বসুদেবের দূত যখন বৃন্দাবনে আসে তখন রোহিণীর জন্য একটি করে পত্র আনে বসুদেবের। নন্দ পড়তে জানেন না ভালোমত। রোহিণী জানেন। কিন্তু বসুদেব কী লেখেন এ বিষয়ে নন্দ কখনো কৌতুহল প্রকাশ করেন না। রোহিণীও পাবতপক্ষে তাঁর সামনে আসেন বা কথা বলেন। হয়ত ঐ পত্রে বসুদেবই রোহিণীকে জানিয়েছেন ইন্দ্রোৎসব বন্ধ হলে বৃন্দাবনে কী ঘটবে।

নন্দ মনে মনে আরও সাহস, আরও ভরসা পান। যশোদাকে আশ্বস্ত করে বলেন,—অত ভয় কি। রোহিণী রাজবাড়ির মেয়ে, যা বলেছেন, ঠিকই বলেছেন। সবুর করো, এখনই একটা কিছু হবে। আমাকে ওদের সামলাতে দাও আগে। বলতে বলতে জনতার মধ্যে আবার ফিরে এসে নোতুন উৎসাহে গলা চড়িয়ে নন্দ বলেন,—শোনো, তোমরা সবাই শোনো! কৃষ্ণ সম্বন্ধে কটু কথা বলে নিজেদের বিপদ ডেকে এনো না তোমরা।

একথা শুনে গোপেরা পরস্পরে মুখ চাওয়াচায়ি করে। একেই বলে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে। মৃত্যু যাদের শিয়রে দাপাদাপি করছে, দলপতি নন্দের কথা তাদের কাছে উন্মাদের প্রলাপ বলেই মনে হল।

অনেকে নন্দকে শুনিয়েই বলাবলি করতে লাগল,—নন্দতো কেবল গগ্‌গ গগ্‌গ করছে। কে সেই মানুষ, আমরা জানি না। সে কী ইন্দ্রের চেয়ে বড়ো? নন্দ তার বুড়ো বয়সের ছেলে নিয়ে পাগল হয়েছে।

এমনি যখন অবস্থা, ঠিক তখনই জনদুই অদ্ভুত দর্শন অপরিচিত ব্যক্তি এসে নন্দ এবং গোপদের উদ্দেশ্যে বলল,—গোপগণ ! না বুঝে বুদ্ধিমানের মতো তর্ক কোরো না। নন্দর কথায় অবিশ্বাস করার কারণ নেই। ঋষি গর্গ মহাপুরুষ। তিনি স্বর্গে গিয়ে দেবতাদের সঙ্গে দেখা করে এসেছেন। বিষ্ণুর আদেশ, কৃষ্ণকে মেনে চললেই তোমাদেব মঙ্গল। তিনিই তোমাদের ও তোমাদের পশুগুলিকে রক্ষা কববেন। যাদের গাভীগুলি উন্মুক্ত স্থানে নষ্ট হতে পারে বলে আশঙ্কা করো, তারা গাভীদের নিয়ে গোবর্ধন পর্বতের কাছে চলে এসো নির্ভয়ে। কৃষ্ণ সেখানে পর্বতকে ছাতার মতো সব বিপদ নিবারকরূপে নির্মাণ করেছেন। কৃষ্ণের নামে জয়ধ্বনি দিয়ে তোমরা আমাদের সঙ্গে এসো। দেখো, ইন্দ্র বড, নাকি কৃষ্ণের মহিমাই বেশি।

সবাই সবিস্ময়ে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল।

তারপর একজন ভজন করে উচ্চারণ করল,—জয় কান্হাইয়া কৃষ্ণের জয়।

সঙ্গে সঙ্গে মুখ থেকে মুখে সরব হয়ে উঠল জয় জয় রব।

এক জায়গায় থেমে-থাকা জলে আঙুল দিয়ে দাগ টানলে যেমন সেই রেখা ধরে জলধারা গড়িয়ে চলে, তেমনি সেই অপরিচিত ব্যক্তিদের আকর্ষণে গোপালকেরা দলবদ্ধ ভাবে এগিয়ে চলল গোবর্ধন পাহাড়ের দিকে।

তখনও মাথার উপর দেববিমান, বর্ষণ ও শিলাপতন চলছে সমানে। কিন্তু কী আশ্চর্য, আগন্তুককে অনুসবণ করে নন্দ-সুনন্দর নেতৃত্বে যারা এগিয়ে চলেছে তাদের ওপব এসব উৎপাত বর্ষিত হচ্ছে না। এই ঘটনায় নির্বোধ গোপ সম্প্রদায়ও বিস্মিত হয়ে নিচু স্বরে বলাবলি করতে লাগল,—কৃষ্ণের মহিমা সত্যই অদ্ভুত। দেখো, তার নামে জয় দিতে আমরা কেউই আর আহত হচ্ছি না। যে গরুগুলো এখানো বেঁচে আছে, তাদেব তাডিয়ে নিয়ে কৃষ্ণ নাম করতে করতে চলো সবাই কৃষ্ণের ছাতার তলায় আশ্রয় খুঁজি। মনে হয়, কৃষ্ণ সত্যই ইন্দ্রেব চেয়ে ক্ষমতাশালী।

৮

রাতের অন্ধকারে দুর্যোগ মাথায় গরু আর মানুষ সার বেঁধে বিস্তীর্ণ মাঠ পার হয়ে চলেছে। সে এক দৃশ্য। মানুষের মনে ভয় আর বিস্ময়। তরুণ সাহসীরা কৌতূহলী। তারাই যাচ্ছে আগে আগে। সেই ছেলের দলে এক ফাঁকে পা চালিয়ে ভিড়ে পড়েছে সুনন্দ-কন্যা গৌরীও।

কানুর জন্যে গৌরীর মন আশঙ্কায় বিচলিত ছিল। ইন্দ্রপুজো বন্ধ হওয়ার পর গোপকুলে দুর্যোগ ঘনিয়ে এলে সবাই যখন একজোটে কৃষ্ণ ও নন্দ গোপকে দুষছিল, গৌরী তখন তার অন্তরের দেবতাকে এক মনে ব্যাকুল হয়ে ডেকেছে : ওগো আমার দেবতা! দুরন্ত কানুকে রক্ষা করো তুমি। সে বড় একরোখা। নিজেকে মস্ত পণ্ডিত ভাবে। ভুল করেছে হয়ত। অপরাধ করেছে হয়ত তোমার পায়ে। তবু ও আর কতটুকুই বা বোঝে। দোষ তো বড়দের। তারাই বা এক ফোঁটা ছেলের কথায় নাচলো কেন?

কেঁদে কেঁদে চোখ ফোলালেও ইন্দ্রের দাপট কমল না। তখন ঘরের বাইরে এসে বৃষ্টির ঠাণ্ডা জলে সপসপে হয়ে ভিজেছে গৌরী। সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। কেউ তার খোঁজ করেনি। ভিজতে ভিজতে গৌরী তার শেষ প্রার্থনা জানিয়েছিল,—কানুর দোষ আমাকে দাও! তার শাস্তি আমি নেব। যদি তোমার পুজো করে থাকি। আমার কথা রাখো!

ঈশ্বর অন্তর্যামী। গৌরীর আবেদনে শেষ পর্যন্ত সাড়া দিয়েছেন তিনি। কোত্থেকে দুটো লোক এসে সবাইকে নিয়ে চলেছে এখন পাহাড়ের কোলে। মার মুখো মানুষগুলো কানুর নামে জয় দিচ্ছে। গৌরী তাই সবার আগে পা ফেলে হাঁটে। কৃষ্ণ ছাড়া তার আর কাকে ভয়।

দূর থেকে গোবর্ধন যেন আকাশপটে জমে থাকা এক খণ্ড কালো মেঘ। ওদিকের আকাশ এখনো লাল। তোপধ্বনি থেমে গেছে বটে, কিন্তু পাহাড়ের গা বেয়ে পাথর গড়িয়ে পড়ার আওয়াজ তখনও শোনা যাচ্ছে।

দলটা কাছে এগুতে বিধ্বস্ত গোবর্ধনের চেহারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পাহাড়ের নিচে একদল মানুষের ছায়া নড়চড়া করছে। কয়েক জনের হাতে মশাল। কেউ

কেউ পাহাড়ের গা থেকে খসে-পড়া গাছ পাতা জড়ো করে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। সেই লালচে আগুনের আভাই আকাশ লালচে করে তুলেছিল। দূর থেকে মনে হচ্ছিল, গোবর্ধন বাজির মতো ফাটছে। অন্ধকার পাহাড়ে আগুন জ্বাললে দূর থেকে মনে হয়, পাহাড় জ্বলছে।

আরো কাছে এলে ছায়া মূর্তিগুলিকে ব্যস্ত হয়ে যে কাজ করতে দেখা গেল, তাতে স্তম্ভিত আর বিস্মিত হয় সবাই। পাহাড়ের গা ফেটে গড়িয়ে পড়া পাথর পরিষ্কার করছে তারা। কারো কারো হাতে বড় বড় ধুলো-সাফ-করা চামচে। তারা পাহাড়ের একটা জায়গা থেকে পাথর কুচি তুলে ছুঁড়ে দিচ্ছে আর এক দিকে। আশ্চর্য, সমান ঢালু গোবর্ধনের পেটের কাছে কারা যেন মস্ত মস্ত কোদালের ঘা মেরে প্রকাণ্ড একটা গর্ত বানিয়ে দিয়েছে। এমনটি আজ বিকালেও কেউ দেখেনি। সকলে ফিস-ফিস করে গোবর্ধনের পরিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করে। সহকর্মীরা ছুটে এগোতে চায়। একটা গুঞ্জন আর হুড়োহুড়ি পড়ে সেই গহ্বরটা দেখার জন্য। গহ্বরটার মুখ থেকে তখন বাসুকি সাপের নিঃশ্বাসের মতো গলগল করে ধোঁয়া বের হচ্ছিল।

অচেনা লোক দুটো সবার পথ আগলে দাঁড়িয়ে বলে,--সাবধান, কেউ এক পা-ও এগোবে না। কৃষ্ণের কাজ শেষ হয়নি এখনো। দেখো, তিনি পাহাড়কে এমন ভাবে দুলিয়েছেন যে তার গা থেকে এখনো পাথর ঝরছে। তাকিয়ে দেখো, ঐ তিনি এক হাতে গোবর্ধনকে তুলে ধরে আছেন ছাতার মতো। ব্যবস্থা করেছেন তোমাদের গরুগুলোর জন্য একটা শক্ত আশ্রয়ের। ইন্দ্রের সাধ্য নেই ঐ ছাতার তলায় তার আক্রমণ চালায়। কৃষ্ণের কাছে হেরে গেছেন দেবরাজ। বলো সবাই, জয়! কৃষ্ণ বিষ্ণো বাসুদেবায় নমঃ!

গগন বিদীর্ণ করে সমস্বরে আর অকুতোভয়ে জয়ধ্বনি করে গোপালকেরা।

এই সময় মশালের আলো তুলে ধরা হয় সেই সদ্য নির্মিত পার্বত্য গুহার মুখে। স্পষ্ট হয়ে ওঠে কৃষ্ণের মূর্তি স্থির ছবির মতো। সকলে দেখে, সেই আশ্চর্য গুহার একটা ঢালু কিনারে বাঁ হাত রেখে হাসি মুখে দাঁড়িয়ে আছে বালক কৃষ্ণ। তার ওপর মশালের আলো পড়ায় তার মুখ ঝলসানো বেগুনের রঙ্ ধারণ করেছে। গোটা মূর্তিটাকে কেমন যেন অপার্থিব আর অচেনা মনে হচ্ছে।

—কানু! ঐ কী আমার কানু! ও বাছা! মাথার ওপর গোবধ্ধন ভেঙে পড়বে সোনা। আয় চলে আয়।

বলতে বলতে অজ্ঞান হয়ে যান নন্দরাণী। রোহিণীর দিকে তাকিয়ে নন্দ বলেন,—যশোকে দেখো তোমরা!

সবার সামনে রোহিণীকে ভাবী সম্বোধন করেন না তিনি। লোকে জানে, রোহিণী নন্দের রক্ষিতা।

এবার লোকদুটো পথ ছেড়ে দেয়। নন্দ সবার আগে এগিয়ে যান, পাশে সেই ফুটফুটে গোরী। পেছনে দলবদ্ধ ভাবে অন্যান্যরা এগোয়। ভয় বিস্ময় আর সমীহ ভরা চোখে এক ধরনের আতঙ্কও ফুটে ওঠে। মশালের আবছা আলো, ধুলো, স্তূপীকৃত পাথরের টুকরো— সব মিলিয়ে জায়গাটা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে! আবছায়ায় সত্যিই যেন মনে হয়, কৃষ্ণই গোবর্ধনকে একহাতে তুলে ধরে আছেন। সামান্য সময়ে অমন নিরেট পাথরের পাহাড়ে অত বড় গহ্বরের সৃষ্টি আর কী করেই বা সম্ভব। গোপেরা এমন অদ্ভুত কাণ্ড পিতৃ-পিতামহের মুখেও শোনেনি কোনদিন, নিজেদের চোখে এই প্রথম দেখল!

সবাই কাছে আসতে কৃষ্ণের কানে কানে আর এক অপরিচিত ব্যক্তি কি যেন বললেন।

এক হাত পাহাড়ের ঢালে রেখে বঙ্কিম বিভঙ্গে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণ স্মিতমুখে অপর হাত তুলে বললেন,—তোমরা সবাই দেখো! "আমি দিব্য বিধির দ্বারা এই পর্বতের গৃহ নির্মাণ করেছি। এর মধ্যে বর্ষার জল ও বায়ু প্রবেশ করতে পারবে না। এই গুহা গো-সকলের উত্তম আশ্রয়।"[১]

কিন্তু সদ্য-নির্মিত ঐ অন্ধকার গুহায় সাহস করে ঢুকতে চায় না কেউ। কৃষ্ণ ও বলরামের আদেশে রাখাল বালকেরা ছোটে গরুর পাল তাড়িয়ে নিয়ে সেই গুহায় পোরার জন্য। গুহা যখন তৈরী হয়েইছে তখন তার ব্যবহারও যে সম্ভব এটা প্রমাণ করার দরকার আছে বৈকি। কিন্তু অল্পে ভীতু ও নির্বোধ বয়স্ক গোপেদের গুহার মধ্যে পাঠানো অসম্ভব। খোলা আকাশের নিচে বৃষ্টি ও পাথরের আঘাতে প্রাণ যায় যাবে, কিন্তু ঐ মায়াময় ভয়ঙ্কর গুহাটা যে আরও ভয়াবহ। তাছাড়া সকলেই তো নিরাশ্রয় নয়। কুটীর বাথান সবারই আছে। গরু মোষ ছাগল, যেগুলি ঘেরা বাথানে জায়গা পায় না, বাইরে পড়ে থাকে আর মাঝে মধ্যে বাঘের পেটে যায়, আসন্ন মৃত্যুর কোপ থেকে তাদের বাঁচাতে তৎপর হয়ে ওঠে মালিকেরা। কৃষ্ণ ও বলরামের কিশোর বাহিনী তাদের নেতার ওপর অগাধ আস্থা রাখে। কাজটা হুড়োহুড়ি করে গুছিয়ে তোলে তারাই। নিক্ষিপ্ত পাথর সরিয়ে জায়গাটা পরিষ্কার করতেও হাত লাগায়। ওদিকে

কৃষ্ণের সাফল্যে মুহুর্মুহুঃ জয়ধ্বনি ওঠে। আকাশে দেখা দেয় দেবতাদের উড়ন্ত রথ। রথ থেকে পাথরের বদলে এবার পড়ে মুঠো মুঠো ফুল।

বয়স্ক গোপেরা দুহাত সোজাভাবে পেতে উবুড় হয়ে শুয়ে পড়ে সেই জলকাদার মধ্যে। নাক ঘষে ক্ষমা চায় নন্দগোপ ও কৃষ্ণের কাছে। সবাই কৃষ্ণ কৃষ্ণ করে। বলরামের কথা মনেই থাকে না কারো। কেউ লক্ষ্যও করে না, এই সোরগোলের মধ্যে নিজের দলবল নিয়ে বলরাম নীরবে প্রস্থান করছে।

কৃষ্ণ-বাহিনীর উচ্ছ্বাসে মনে হয়, যমুনা যেন কলকল করে গোবর্ধনের পায়ের কাছে এসে আছড়ে পড়েছে।

বৃন্দাবনের আকাশে কয়েকবার চক্কর দিয়ে ইন্দ্রের রথ ফিরে যায় উত্তর দিগন্তের কোলে। সবাই দেখে, ইন্দ্র রথের গায়ে জলন্ত তারা দুটি ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে। ইন্দ্র পরাস্ত হয়েছেন বালক কৃষ্ণের কাছে।

অন্ধকার কাঁপিয়ে আবার জয়ধ্বনি করেন সেই অপরিচিত ব্যক্তিরা।

—জয়! কৃষ্ণবিষ্ণোবাসুদেব গোবর্ধনধারী গোবিন্দের জয়!

তার পর তাঁরাও পাহাড়ের পেছনে অদৃশ্য হয়ে যান।

দুর্যোগের পর মহাশান্তি নেমে আসে বিধ্বস্ত গো-কুলে।

বলরাম বাহিনী গাঁয়ে ফিরে এক বর্ধিষ্ণু গোপের দাওয়ায় ধপ্ ধপ্ করে বসে পড়ল। কম ধকল যায়নি তাদের। বলতে কি পাহাড় ফাটার পর পাথর সরানোর কাজে তাদেরই হাত লাগাতে হয়েছিল। বলরামের দলে পেশল বলবানের সংখ্যা বেশি। কৃষ্ণ দল গড়ে দেহে কমজোরী কিন্তু অপেক্ষাকৃত চতুর রাখাল বালকদের নিয়ে। ভালো তীর ধনুক চালায়, লাঠি খেলে, যুদ্ধের বিভিন্ন কৌশল চটপট আয়ত্ত করতে পারে তারা। কৃষ্ণ ও বলরাম এদের নিয়ে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলাই খেলে। এ খেলা তারা শিখে এসেছে ঋষি গর্গের আশ্রমে।

বলরামের আখড়ায় কুস্তী আর গদাযুদ্ধের তালিম নেয় সবাই। এ খেলায় বলাইয়ের সমকক্ষ কেউ নেই। কৃষ্ণ যদি তীর ছুঁড়ে লক্ষ্যভেদ করে তো বলরাম গাছের গুড়ি দিয়ে তৈরী ভারি গদার ঘায়ে সে লক্ষ্যকে চুরমার করে দেয়। অবাধ্য ষাঁড় মহিষকে বাগে আনতে হলে ডাক পড়ে বলাইয়ের। আর এইসব মল্লবীরের দল যুদ্ধ যুদ্ধ খেলার শেষে ক্লান্ত হয়ে মণ্ডলাকারে বসে বড় বড় পাত্রে পেস্তা কিসমিস বাদাম দিয়ে সিদ্ধি বানিয়ে খায়। তারপর ঢুলু ঢুলু চোখে খোল করতাল নাকাড়া বাজিয়ে গান গায়, ফুর্তি করে।

গা এলিয়ে বলরাম বলে,—জুৎ করে সিদ্ধি বানা দেখি। তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে।—বলেই একটা পাখোয়াজ টেনে নিয়ে তার ওপর চপেটাঘাতের বোল ফোটায়।

উৎসাহীরা আগেই কাজ গুছিয়ে রেখেছিল। পাথরের চোভায় সিদ্ধি ঢেলে সাকরেদ পালোয়ান মল্ল এসে পাশে বসল।

বললে,—গুরু! তোমাকে কিন্তু কেউ পুছলো না। কানুকে নিয়েই উৎসব হচ্ছে, আমরা কেউ না —বলে হা হা করে হাসল। সঙ্গে সে হাসিতে যোগ দিল অন্যান্যরাও।

পুরো পাত্রটা এক চুমুকে শেষ করে চোখ লাল করে তুলেছিল বলরাম। পাত্রটা বাড়িয়ে দিয়ে বললে,—ভর্তি কর!—ব্যস্, ঐ পর্যন্তই। অন্য কোনো মন্তব্যে তার আসক্তি নেই।

মন বড় খাঁটি এই সোনার-বরণ বলরামের। কৃষ্ণের বুদ্ধির তারিফ করে অকপটে। কৃষ্ণর খ্যাতিতে বুক ভরে ওঠে স্নেহে।

আর এক পাত্র নিঃশেষ করে বলরাম বলে,--কানুর বুদ্ধিটা দেখেছিস! সাবাস!

তারপর জড়িয়ে জড়িয়ে স্বগতোক্তি করে সে এলোমেলো, যা ঝেড়ে বেছে সাজালে এমনি দাঁড়ায়: গো-কুলে মানুষ নেই, দুপেয়ে মানুষগুলোও চারপেয়ে গরুর মতো। কৃষ্ণ একটাই জন্মেছে। ভাঙ্ খায় না, গাঁজা টানে না। খালি ফন্দি আঁটে। চমকদার সব ফন্দি। তোদের মাথায় পাথর মারলে সে পাথর টুকরো হয়ে ভেঙে যাবে, কিন্তু এক ফোঁটা ঘিলু বের হবে না। কানুর মগজে ঠাসা ঘিলু আছে। বুদ্ধি আছে। কানুকে ছেড়ে আমাকে কাঁধে তুলতে যাবে কোন্ মুখ্যু। খবরদার, কানুর নিন্দে শুনলে পিষে ফেলব আমি।

বক্তৃতা শেষ করে আবার পাত্র বাড়ায় বলরাম, বলে,—গানা শুরু কর!

দ্রুম দ্রুম করে ঢোল মাদল বাজে। সিদ্ধিতে চুর চুর পালোয়ান ছেলেরা মোটা গলায় গান গায়, কেউ কেউ নাচে। বলরাম সেই শব্দের মধ্যে চোখমুদে সমস্ত চিন্তাকে তলিয়ে দেয়। কিছু একটা নিয়ে বেশিক্ষণ ভাবনা চিন্তা করতে তার ভালো লাগে না। কিন্তু এই মুহূর্তে কেউ যদি এসে বলে, গুরু! অমুকে বহুত বেয়াদবি করছে। বলরাম তড়াক করে উঠে গিয়ে তাকে সায়েস্তা করে আসতে পারে। ভাবনা চিন্তার দায়-দায়িত্ব সে ফন্দিবাজ কানুর ওপর ছেড়ে দিয়ে শুধু যুদ্ধের ডাকে সাড়া দিতেই অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে।

বলরামের এই মতিগতি দেখে গর্গ বলেছিলেন,—বলাই বড় সরল, কিন্
তেমনিই আবার সবল। কৃষ্ণ, তুই দাদাকে আগলাবি, যেন কোনো দুষ্ট লোকে
তাকে ঠকাতে না পারে। আর বলাই, তুই ছোটভায়ের পাশে সব সময় দাঁড়াবি
যেন কোনো মল্লবীরে ওকে কাবু করতে না পারে। পড়াশুনো নিয়ে তোর আ
বিশেষ মাথা ঘামিয়ে দরকার নেই। সে দরকার তোর হয়ে কৃষ্ণই সামলাবে
তোদের দুটি ভায়ে যেন কখনো ছাড়াছাড়ি না হয়। দুজনে একসঙ্গে থাকলে
পৃথিবী জয় করতে পারবি তোরা।

কথাটা খুব মনে ধরেছে বলরামের। বিদ্যেবুদ্ধি নিয়ে মাথা ঘামনোর চেয়ে
একটা বুনো হাতীকে বশ করায় অনেক বেশি মজা। আর সিদ্ধির মতো বলকারক
জিনিসের জোড়া নেই কোথাও, ঝক্কিঝামেলা পোষায় না। অবাধ্যদের বশ করে
বাহুবলে। বুঝিয়ে সুঝিয়ে কারোকে বশে আনায় বীরত্ব নেই, শুধু সময় নষ্ট।
কানুর মতো অত ধৈর্যও নেই তার। অতএব কানু তার মতোই থাক, বলরাম
থাকবে নিজের মতো।

কৃষ্ণকে কাঁধে নিয়ে আবার সকলে ফিরে এসেছে নন্দ গোপের আঙিনায়।
মশালের বিধ্বস্ত আলোয় এলাকাটি আরও ভয়াবহ দেখাচ্ছে। আকাশের গায়ে
তারাগুলোও অবাক হয়ে চোখ পিট-পিট করে গো-কুলের রকম সকম দেখছে।
দূর আকাশে একফালি চাঁদ উঠছে এখন ধীরে ধীরে। বাইরে সেই চন্দ্রালোকের
সঙ্গে অন্ধকারের জায়গা দখল নিয়ে নিঃশব্দ কাড়াকাড়ি শুরু হয়ে
গেছে।

কৃষ্ণ নন্দর দাওয়ায় উঠে দাঁড়ায় যাতে প্রত্যেকেই গো-কুলের নায়ককে
ভালো করে দেখতে পায়। কৃষ্ণের দল তার সামনে ঘুরে ঘুরে বৃত্তাকারে বাঁশি
বাজায়। জ্ঞান ফিরে যশোদা ছোটেন ভাঁড়ারে। এখন মিঠাই বিতরিত হবে
সমবেত জনতার মধ্যে।

নন্দ এসে কৃষ্ণের পাশে দাওয়ার নিচে দাঁড়ান। হাত তুলে মুরলীধরদের
বাদন থামাতে ইঙ্গিত করে বলেন,—এইবার তোমাদের কিছু বলবার থাকলে
তা কানুকে বলতে পারো। তোমরা দেখেছ, স্বয়ং ইন্দ্রই তার মাথায় পুষ্পবৃষ্টি
করে গেলেন। এখন বলো, কানুকে কি এখনো তোমাদের অবিশ্বাস।

জনতা ভয়ে নীল হয়ে আছে। বয়স্করাও বিস্ময়ের ধাক্কা সামাল দিয়ে উঠতে
পারে নি। নন্দের কথায় তারা আরও ভীত হয়ে পড়ে। এইবার কি তাদের

অপরাধের বিচার হবে। সকলেই ক্ষমাপ্রার্থীর মতো করজোড়ে দাঁড়ায়। পরস্পরে অন্যকে ঠেলা দিয়ে বলে—তু বোল্।

শেষে সুনন্দ এগিয়ে আসে। সে নন্দর ঘনিষ্ঠ। তার মেয়ে গোরী কৃষ্ণের প্রিয় সহচরী। সুতরাং তারই ভরসা সর্বাধিক। প্রথমে কাঁপা কাঁপা গলায় সে তার বক্তব্য শুরু করে,—আমরা মুখ্যু গোয়ালা। আমরা সকলকেই ভয় করি। যে আমাদের রক্ষা করে আমরা তাকেই জানি। নন্দ, তুমি চিরদিন আমাদের ভালোমন্দ দেখে আসছ। আমাদের মধ্যে তোমারই বুদ্ধি বেশি। তাই আমরা তোমাকেই দলপতি করেছি।

সবাই সমর্থন জানায় হাঁ। হাঁ করে।

সুনন্দ এবার আরও একটু আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বলে,—আমরা কানুকে ঘরের ছেলে ভেবেছিলুম। আমাদের অপরাধ হয়েছে। এখন থেকে আমরা তাকেই দলপতি করব যদি নন্দাজীরও মত থাকে।

নন্দ পুলকিত হন। বংশানুক্রমে দলপতি হওয়ার নিয়ম নেই। যে যেমন নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারে দলে সে-হ প্রাধান্য পায়। এ তো না চাইতেই জল। কৃষ্ণ এই বয়সেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছে।

নন্দ বলেন,—কানু ইন্দ্রকে হারিয়ে দিয়েছে—, সে-ই আজ থেকে গোলকপতি। এতে আমার মতামতের কী আছে। আমার চেয়ে সুখী আর কে?

তখন সুনন্দ যুক্তকরে কৃষ্ণ বন্দনা করে বলে,—হে কৃষ্ণ! আপনি দেবতাই হোন, চাই দানবই হোন, যক্ষ হোন চাই গন্ধর্ব হোন, আমরা তার বিচার করি না। আপনি আমাদের রক্ষা করুন! আমরা আপনাকে প্রণাম করি।[২]

কৃষ্ণ এই স্তব স্তুতিতে খুশি হয়ে হাসছিল। সুনন্দের বন্দনা শেষ হলে কৃষ্ণ তার পার্শ্বচরের দিকে মাথা হেলিয়ে কী যেন জেনে নিল। সকলে দেখল কৃষ্ণের পাশে শ্রীদাম সুদামের জায়গায় এখন সেই তরুণ রাখালদের দলপতি দাঁড়িয়ে আছে, যে—দলটি কোনো এক জায়গা থেকে বৃন্দাবনে এলে নন্দ তাদের জন্য কুটীর বানিয়ে বসবাসের ব্যবস্থা করে দেন ও গোপসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। এই দলবলই কৃষ্ণ ও বলরামের আখড়ায় গোপবালকদের যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা শেখায়।[৩] দলপতিটির নাম, শাম্ব।

শাম্ব নিচু স্বরে কৃষ্ণকে কিছু বললে কৃষ্ণ জনতার দিকে ফিরে হাত তুলে বলল,—শোনো! আমি দেবতা, গন্ধর্ব, যক্ষ বা দানব নই। আমি তোমাদের বান্ধব রূপেই জন্মেছি। এছাড়া অন্য কোনোভাবে আমাকে প্রচার কোরো না।[৪]

কৃষ্ণর দ্বারা কেউ তিরস্কৃত হল না দেখে জনতার মধ্যে একটা স্বস্তির ভাব ফিরে এলো। শ্রীদাম সুদামকে এইবার দেখা গেল বেণু খোল খঞ্জীরা কাঁসর ও পাখোয়াজ বাজিয়ে আবার গানের আসর জমিয়ে তুলতে।

সুদাম গান বাঁধতে পারে। সে গাইতে লাগল :

গোকুল চমকিল গোবিন্দ লালা।
যশোদানন্দন নন্দদুলালা॥
জয় জয় গিরিধারী কান্হাইয়া কালা।
হরষিত গোপকুল সব গোপবালা॥

সঙ্গে সঙ্গে করতালি সহযোগে জনতাও গাইতে শুরু করল :

কান্হাইয়া কালা কৃষ্ণ গোপালা।
কৃষ্ণ গোপালা গোবিন্দ লালা।

কৃষ্ণকে মণ্ডলাকারে ঘিরে চলল সারারাত্রি উৎসব, সিদ্ধিপান ও শ্রীখোল বাদ্য।

৯

সাতদিন প্রবল বর্ষণের পর গোবর্ধন পর্বতের পিঠের ওপর নীলকান্ত নির্মল আকাশ ফুটে উঠতেই নদ-নদীর ঘোলা জলেও নীলাভা ছড়িয়ে পড়ল। আকাশে দেখা দিল সাদা সাদা কুঁচো মেঘ। বাতাসে ভেসে এলো উজ্জ্বল অভ্রচূর্ণ দুপুর। এখন ব্রজের বিস্তীর্ণ চারণভূমির দিকে তাকিয়ে দুর্যোগের রাত্রিগুলি যেন একটা দুঃস্বপ্ন বলেই মনে হয়। ব্রজগোপালরা হয়ত ভুলে গেছে সেই ভয়াবহ বর্ষণ আর শিলাবৃষ্টির তাণ্ডব। কেননা বর্তমানে ওদের ভারি নিশ্চিন্ত দেখাচ্ছে। এক একটি ধেনুযূথের প্রহরায় নিযুক্ত বংশীধারী গোপবালকরা আকাশপটে আঁকা ছবির মতো ইতি উতি ছড়িয়ে আছে।

দূর থেকে সে দৃশ্যের দিকে আনমনে তাকিয়ে ছিল কৃষ্ণ।

গোপকুলে যশোদানন্দন কৃষ্ণ সদাই স্বতন্ত্র। কিন্তু আজকের মতো এমন একাকী ও নির্জনতাপ্রিয় হতে ইতিপূর্বে তাকে আর কখনো দেখা যায় নি। আজ সে সম্পূর্ণ দলছাড়া। হাত থেকে কখন যে খসে পড়েছে রঙিন সুতলির ঝুমকো ঝুলানো বাঁশের বাঁশি, শ্যামল বরণ সুশ্রী মুখের কিশোর গোপালটির তা খেয়ালও নেই। গোবর্ধনের একটি শিলাখণ্ডে বরতনুটি আলস্যে ঢেলে দিয়ে আত্মমগ্ন চোখে বসে আছে কৃষ্ণ। চোখ দুটি তার বিশাল পার্বত্য গুহা মুখে নিবদ্ধ। সদ্য নির্মিত গুহার ভেতরে ও বাহিরে এখনো বিস্তর প্রস্তরচূর্ণ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত আছে। ভীত গাভীদের নিক্ষিপ্ত গোময় প্রস্তরের গায়ে গায়ে শুকিয়ে আছে। সর্বত্রই একটি বিপর্যস্ত চেহারা।

গুহার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কৃষ্ণ আবিষ্ট ও সম্মোহিত হয়ে পড়ে। অতিকায় প্রাগৈতিহাসিক জীবের মতো হাঁ করে আছে গোবর্ধন। গুহামুখে যে শিলাখণ্ড ছত্রাকারে বিস্তৃত, তার ওপর গুচ্ছ গুচ্ছ কাশ ফুলের ছড় দোল খাচ্ছে, মনে হয়, প্রশস্ত চঞ্চু কোনো দানব পাখী মাথার ওপর সাদা পালকের ঝুঁটি দোলাচ্ছে। সমস্ত প্রকৃতি মূক ইঙ্গিতে কী যেন বলতে চাইছে কৃষ্ণকে। আর গভীর মনোযোগে কান পেতে তাদের ভাষা বুঝতে চাইছে কৃষ্ণ।

কৃষ্ণের মনে হয়, প্রস্তরীভূত রোমশ জীবটি যেন বলছে, কৃষ্ণ ! তুমিই কি আমাকে এমনভাবে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলে ? আশ্চর্য, তোমার শৈশব, তোমার কৈশোর আমার ছায়ায় গান গেয়ে কেটেছে। আমার বনাঞ্চল থেকে কত ফল ফুল চয়ন করে নিয়ে গেছ তুমি। কত প্রজাপতি আর হরেক বরণ পাখীর পেছনে ছুটে বেড়িয়েছ। আমার কূর্মপৃষ্ঠের ওপর খেলেছ লুকোচুরি খেলা। সেই তুমি পারলে আমাকে এমন ভাবে আঘাত করতে ? যখন আমার দেহ খণ্ড খণ্ড হয়ে ফেটে পড়ছিল তখন তুমি কয়েকটি ছায়ামূর্তির সঙ্গে শলা-পরামর্শে ব্যস্ত ছিলে। আমার ব্যথা বেদনার কথা তোমার মন স্পর্শ করেনি। অবশ্য এটাই জগতের নিয়ম। মানুষ তার নিজের প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি ও আর্থিক উন্নতির জন্য ক'‧ নিষ্ঠুর কাজই না করে। তোমার মনে রাজা-সাজার বাসনা।……

না ! না !! না !!!

কৃষ্ণের অন্তর মথিত হয়ে অস্ফুট আর্তনাদ বেরিয়ে আসে। কৃষ্ণগোলাপের মতো মুখখানিতে ফুটে ওঠে বিন্দু বিন্দু স্বেদ কণা।

গোবর্ধন যেন আবারও বলল, কৃষ্ণ ! তুমি নিজের উন্নতির জন্য একটা মস্ত মিথ্যার প্রতিবাদ করলে না। ওরা বলল, তুমি এক হাতে গোবর্ধন ধারণ করেছ। তুমি নীরবে সে কথা সমর্থন করলে। অথচ দেখো, তুমিই বললে যে আমার গর্ভে তুমি গৃহ নির্মাণ করেছ। আরও বললে, "বায়ু রহিত স্থান সমূহে" তোমরা সুখে বাস কর। বললে, "গোপগণ ! আমি দিব্য বিধির দ্বারা এই পর্বতের গৃহ নির্মাণ করিয়াছি। ইহার মধ্যে বর্ষার জল ও বায়ু প্রবেশ করিতে পারিবে না।" এই কথার দ্বারা তুমি নিজেই প্রকৃত সত্যের স্বীকৃতি দিয়েছ নিজের অগোচরে। গোবর্ধনকে হাতে করে তুলে ধরলে পর্বতের নীচের অংশে বায়ু তো রুদ্ধ হওয়ার কথা নয়। যেহেতু তুমি বিস্ফোরকের সাহায্যে আমার গর্ভে গহ্বর সৃষ্টি করেছিলে তাই সে স্থানকে 'বায়ু রহিত' বলেছ। তাছাড়া 'পর্বতের গৃহ' বলতেও গুহার কথাই স্বীকার করেছ। তবু বললে, বাম হাতে তুমি আমাকে ধারণ করেছ। নেহাৎ ব্রজবাসীরা গুহা নির্মাণের চমৎকারিত্বে এতই বিস্মিত হয়েছিল যে গুহা ও পর্বত ধারণের বিষয়টি নিয়ে কখনো তর্ক করেনি ; যেমন প্রচার, তেমনি ভাবে সরল মনে মেনে নিয়েছে, তুমি গোবর্ধন ধারণ করেছ। কিন্তু এই মিথ্যাভাষণের প্রতিবাদ একদিন কেউ না কেউ করবেই, একথা তুমি জেনে রাখো।

কৃষ্ণ দুহাতে কান চাপা দিল। কিন্তু তখনি সে বুঝতে পারল, এতোক্ষণে

যা কিছু সে শুনেছে সেসব কথা তারই অন্তর থেকেউৎসারিত আত্মসমালোচনা। গোবর্ধনের মুখে ভাষা নেই। গোবর্ধন শুধু মূক বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

শরতের উজ্জ্বল দুপুর বড় নির্জন। আদিগন্ত নির্জনতার একটি অশরীরী কণ্ঠস্বব আছে। হঠাৎ সেই স্বর কানে গেলে সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ জাগে। মনে একটা অহেতুক ভয়ের সৃষ্টি হয়। কিশোর কৃষ্ণকে এমনি এক ধরনের ভয় বিহ্বল করে তুলল।

সে আরও শুনতে পেল, বুকের মধ্যে গুরু গুরু ধ্বনি সৃষ্টি করে কে যেন বলছে, কৃষ্ণ! গোবর্ধনের সঙ্গে যেমন, ব্রজবাসীদের সঙ্গেও তেমনি তুমি প্রতারণার খেলায় মেতেছ। দেখো, তারা আজ তোমাকে সমীহ করে তফাতে সরে গেছে। এমনকি তোমার পিতা নন্দ গোপ, যিনি তোমার জন্মদিনে গোপগণেব সঙ্গে নৃত্য করেছেন আনন্দে, তিনিও আর গোপাল বলে তোমাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন না। যশোদা বিমর্ষ মুখে সমীহের সঙ্গে তোমার দিকে তাকান। কানু, বুকে আয়! বলে ছুটে এসে তিনি তো আর হাত বাড়ান না, শাসন করা দূরের কথা।

ভাবতে ভাবতে কৃষ্ণের দু চোখ ব্যথায় টনটন করে। চোখ ফেটে জল আসে। ঝাপসা হয়ে যায় দৃষ্টি। চোখের পাতা বন্ধ করে দুই তর্জনী দিয়ে চোখ দলতে শুরু করে কৃষ্ণগোপাল।

ঠিক এমনই সময় সে শুনতে পায় তার পেছন থেকে কেউ মেঘগম্ভীর স্বরে তাকে ডেকে বলছেন, কৃষ্ণ! দেখো! আমি দেবরাজ ইন্দ্র, স্বয়ং তোমার কাছে এসেছি।

বিদ্যুৎপৃষ্ঠের মতো উঠে ঘুরে দাঁড়ায়, কৃষ্ণ।

দেবরাজ ইন্দ্র? তবে কি আজ একা পেয়ে তিনি তাঁর অবমাননার প্রতিশোধ গ্রহণ করতে এসেছেন? কিন্তু ইন্দ্রযজ্ঞ বন্ধে স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রের সম্মতি ছিল বলেই তো ঋষি গর্গ আশ্বস্ত করেছিলেন।

বলেছিলেন, কোনো ভয় নেই। ইন্দ্রের নিকট থেকে ব্রজের বিপদের সম্ভাবনা নেই। মথুরা বৃন্দাবন শূরসেনে ইন্দ্র তাঁর প্রতাপ প্রদর্শনে আসবেন না। এই অঞ্চল দেবতা বিষ্ণুর অধিকারভুক্ত। ইন্দ্র যা করবেন তা বিষ্ণু ও কৃষ্ণের প্রতিষ্ঠার জন্যই করবেন। সেই সামান্য নষ্টকর্মে ভয়ের কারণ নেই। সে শুধু লোকমনে ভয় সৃষ্টির জন্যই অনুষ্ঠিত হবে।

নন্দ গোপকে কৃষ্ণের সামনেই গর্গ বলেন, কৃষ্ণকে বিষ্ণুর অংশ বলেই মান্য করবে।[১] শতশৃঙ্গ পর্বতে যেমন দেবতাদের ঔরসে পঞ্চ পাণ্ডবের জন্ম হয়েছে, শূরসেনে তেমনি বিষ্ণুর অংশে আবির্ভূত হয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ।

গর্গের কথাগুলি এখনও স্পষ্ট কানে লেগে আছে। তবে দেবরাজ ইন্দ্র কেন? কী চান তিনি?

কিংকর্তব্যবিমূঢ় কৃষ্ণের প্রতি সপ্রীত হাস্যমুখে ইন্দ্র আবার বললেন,—কৃষ্ণ! আমাকে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। আমি দেবমন্ত্রী ব্রহ্মার আদেশে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছি। তুমি নিতান্তই কিশোর। এই বয়সে যথানির্দিষ্ট কর্ম করে তুমি দেবতাদেরও বিস্মিত করেছ। হয়েছ তাঁদের প্রীতির কারণ, কেন না, তোমার কর্মের দ্বারা এটা সবিশেষ উপলব্ধ হয়েছে যে, তুমি দেবকর্ম সাধনের উপযুক্ত এবং গর্গ তোমায় যথার্থই শিক্ষিত করেছেন।

ইন্দ্রের বাক্যে রোষের লেশমাত্র নেই, এটা সম্যক বুঝে কৃষ্ণ আশ্বস্ত ও পুলকিত হয়ে দেবরাজের প্রতি আনত অভিবাদন জানিয়ে বলল,—আপনি জানেন, আমি নিজে কিছুই করি নি। স্বয়ং বিষ্ণু তাঁর অনুচরবর্গের মাধ্যমে এই পর্বত বিদীর্ণ করিয়ে গোপগণকে বিস্মিত করেছেন। নচেৎ আমার সাধ্য কি আপনার বিরুদ্ধে কোনো কাজের অনুষ্ঠান করি।

নীলোৎপল-সদৃশ বহু রত্নাভরণধারী ইন্দ্র কৃষ্ণের কাঁধে একটি হাত রেখে বললেন,—আমার বিরুদ্ধাচরণের কোনো প্রশ্নই ওঠে না, কেন না ইন্দ্রযজ্ঞ বন্ধ করে গিরিযজ্ঞ প্রবর্তনের প্রস্তাব আমার উপস্থিতি ও সম্মতিক্রমেই দেবসভায় গৃহীত হয়। তুমি শীঘ্র সেই উত্তম সভামণ্ডল পরিদর্শনে যাবে। যাই হোক, আমি সমগ্র হিমাচল স্বর্গের রাজা। আজ আমি তোমাকে, দেবমন্ত্রী ব্রহ্মার অনুমত্যানুসারে, গো-গণের অধিপতি ইন্দ্র-পদে অভিষিক্ত করলাম। আজ থেকে তুমি গো-গণের ইন্দ্র, 'গোবিন্দ' অভিধায় ভূষিত হলে। হে গোবিন্দ, আমি যেমন ভৌমস্বর্গ হিমালয়ের রাজা, তুমি তেমনি ভূলোকে গো-গণের অধিপতি এবং সেজন্য উপ-ইন্দ্র বা উপেন্দ্র পদবীতে দেবগণের দ্বারা অভিষিক্ত হয়েছ।[২]

বয়সে কিশোর হলেও কৃষ্ণ এক অদ্ভুত পরিণত বুদ্ধির অধিকারী। তবু বিনয় প্রকাশ করে বললেন,—হে দেবেন্দ্র! গোকুলে বয়োবৃদ্ধগণ বর্তমান থাকতে দেবতারা আমার ওপর প্রসন্ন হয়ে আমাকে গোবিন্দ পদে নিযুক্ত করছেন, বস্তুত এজন্য আমি দেবলোকের প্রতি কৃতজ্ঞ। কিন্তু এই ব্যতিক্রমের কারণ যদি আপনি আমাকে বিস্তারিত বুঝিয়ে দেন....

—হে উপেন্দ্র ! তুমি কিশোর হয়েও সকলের জ্যেষ্ঠ, কেন না তোমার বুদ্ধি ও মনোবল অতি-লৌকিক। তুমি গোবিন্দ হয়েও গোপগণের বংশোদ্ভূত নও। অথবা ভবিষ্যতে যাদব রূপে পরিচিত হলেও একথা মনে রেখো যে তুমি যাদব নও।

—তবে আমার সত্য স্বরূপ কি ?

—হে বার্ষ্ণেয় ! তুমি বৃষ্ণি হলেও যথার্থ বৃষ্ণি কুলোদ্ভব নও। তোমার সত্য স্বরূপ, তুমি স্বয়ং বিষ্ণুর অংশজ। নীলকান্ত, তুমি দেব-ঔরসজাত। মর্ত্য রাজনীতির স্বার্থে মর্ত্যে তোমার পরিচয় অবশ্যই, বাসুদেব ; কেননা, লোকে জানুক, তুমি বসুদেবের সন্তান। কিন্তু যে কারণে তোমার মাতা দেবকী দেবগর্ভা নামে প্রখ্যাত হবেন, সেই কারণেই তুমি মর্ত্য নারীর গর্ভে জাত দেবপুত্র।[৩]

নিজের এই অদ্ভুত পরিচয় শুনে কৃষ্ণ কিছুক্ষণ বিহ্বল হয়ে পড়লেন। তাঁর মনে হল, ইন্দ্রের কথায় মনুষ্যকুলের সঙ্গে তাঁর আত্মিক বন্ধন যেন শিথিল হয়ে পড়ছে। তিনি দেবজন গোষ্ঠীভুক্ত এ সংবাদ পাওয়ার পর নন্দ অথবা যশোদার মুখগুলি তাঁর চোখের সামনে ঝাপসা হয়ে আসছে। গর্গের কাছে তিনি একান্তে শুনেছেন যে, তিনি কংস ভাগীনেয় এবং বসুদেবের পুত্র। অতঃপর ইন্দ্রের কথায় শূরসেনের অধিবাসীবৃন্দকেও যথার্থ আত্মীয় বলে আর মনে হচ্ছে না তাঁর। সকলের মধ্যে তিনি নিজের বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করছেন। এই মুহূর্তে এমন চিন্তা তাঁকে কিছু অহংকারেও উৎফুল্ল করছে।

কৃষ্ণের ভাববৈচিত্র্য লক্ষ্য করে হৃষ্ট মনে স্মিতমুখে ইন্দ্র বললেন,—উপেন্দ্র ! ব্রহ্মার পরিকল্পনার কথা নিশ্চয় গর্গ তোমাকে বলেছেন। দেবতাদের দ্বেষ করে এমন নৃপতির সংখ্যাবৃদ্ধিতে আর্যাবর্ত আজ ভারাক্রান্ত। পৃথিবীর সেই ভারাবতরণের জন্য শূরসেনে বিষ্ণুর তেজে তোমার আবির্ভাব, যেমন শতশৃঙ্গ পর্বতে ধর্ম পবন অশ্বিনীকুমার এবং আমার অংশে পাণ্ডুপুত্রদের জন্ম। তোমরা একত্রে এই পৃথিবীতে দেবস্বার্থের সংরক্ষণ করে স্বর্গলোকের অনুশাসন প্রতিষ্ঠা করবে। তোমার স্বপ্ন ও সাধনা হবে, পৃথ্বীলোকে এক ধর্মরাজ্য স্থাপন। সে রাজ্যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই বিভাগ থাকবে। ব্রাহ্মণ হবে দেবতাদের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি। অপরে দেবতা ও ব্রাহ্মণের সেবা করবে।

সামান্য বিরতির পর সেই রত্নাভরণভূষিত নীলকান্তমণিবৎ উজ্জ্বল দীর্ঘকায় পুরুষ আপন কণ্ঠহার কৃষ্ণের গলায় পরিয়ে দিয়ে পুনরায় জলদগম্ভীর স্বরে বললেন,—"অর্জুন নামে প্রসিদ্ধ আমার পুত্র তোমার পিতার (বসুদেবের)

ভগিনী কুন্তীদেবীর পুত্র। সে এ জগতে তোমার সহচর (রূপে) তোমার (সঙ্গে) পূর্ণ সৌহার্দ্য স্থাপিত (করবে)।"[8]

শতশৃঙ্গ পর্বতে পাণ্ডবদের জন্মকথা ইতিপূর্বে কৃষ্ণ শুনেছেন ঋষি গর্গের কাছে। এখন ইন্দ্রের মুখেও একই কথা শুনে পাণ্ডবদের প্রতি অন্তরের আকর্ষণ অনুভব করলেন। এই পৃথিবীতে তাহলে তিনি একান্তই একাকী নন। দেব-ঔরসে জাত পৃথ্বীপুত্র পাণ্ডবরাই তাঁর যথার্থ আত্মীয়। আর একথা ভেবে কৃষ্ণের মনের শূন্যতা অনেকাংশে পূর্ণ হয়ে গেল।

কৃষ্ণ তাঁর বিমর্ষ ভাব কাটিয়ে প্রসন্ন মুখ তুললেন। বললেন,—দেবেন্দ্র ! আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য। মনে হচ্ছে, পৃথ্বীলোকের সঙ্গে আমার সমস্ত আত্মিক বন্ধন বিচ্ছিন্ন হয়ে আসছে। হে দেব, অতঃপর দেবস্বার্থ রক্ষাই আমার অরব্ধ কর্ম। আমি দেবী কুন্তী এবং দেবপুত্র পাণ্ডবদের কথা শুনেছি। এই মর্ত্যধামে অতঃপর তাঁরাই আমার নিকটাত্মীয়।[5]

ইন্দ্র পরম প্রীত মুখে কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করে বিদায়কালীন সম্ভাষণ জানিয়ে বললেন,—তুমি প্রখর প্রত্যুৎপন্নমতির অধিকারী, তাই জগতে শ্রেষ্ঠ রাজনীতিকের সম্মানে অবশ্যই অধিষ্ঠিত হবে। দেবেন্দ্র, তুমি যথার্থই বলেছ যে, মর্ত্যজনের মধ্যে তুমি একাকীত্ব অনুভব করছ। দেখো, তোমাকে যে গোবিন্দ পদ প্রদান করা হল তার বিশিষ্টার্থ তুমি আগেই বুঝে ফেলেছ। বস্তুত এমন বুদ্ধির প্রাখর্য আমার পুত্র অর্জুন বা অন্যান্য দেবপুত্র পাণ্ডবদের মধ্যেও দেখা যায় না।

অহংকারদীপ্ত কৃষ্ণ আত্মমদে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছিলেন। তিনি স্তাত শ্রবণের আশায় গদ্‌গদ কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন,—প্রভু, আপনার কথা আরও একটু স্পষ্ট করে ব্যক্ত করুন !

ইন্দ্র বললেন,—বুদ্ধি প্রাখর্যে তুমি অনায়াসেই আত্মীয় অনাত্মীয় ভেদজ্ঞান অর্জন করেছ। বস্তুত, এই গোপগণ কোনোক্রমেই তোমার আত্মীয় হতে পারে না। তুমি জন্মমাত্রেই যে বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারী, গোপগণ অশীতি বর্ষ পূর্ণ করলেও তার শতাংশেরও অধিকারিত্ব লাভ করে না। আর এই সমগ্র মানব-কুলে মনুষ্যরা অধিকাংশই সরল ও অজ্ঞান। কতিপয় ব্রাহ্মণ নেতা দেবতাদের শিক্ষায় স্নাত হয়ে পৃথ্বীলোকে বুদ্ধিমান বিজ্ঞানী হয়েছেন। রাজপুরুষেরাও জ্ঞানী ও গুণী। কিন্তু সাধারণের মধ্যে শিক্ষার আলোক কিছুমাত্র নেই। সূর্যহীন জগতের মতই তারা অজ্ঞানের অন্ধকারে নিমজ্জিত। সুতরাং গোপগণের সঙ্গে তাদেরও পার্থক্য নেই। সমগ্র আর্যাবর্তকে তাই তুমি গোকুল জ্ঞানে

গ্রহণ করবে। দেবতারা এই বিষয় সম্যক বিবেচনা করে তোমাকে গোবিন্দ পদ প্রদান করেছেন। তুমি গো পতি এবং অজ্ঞান মনুষ্যলোকের অধীশ্বর গোবিন্দ। দেবস্বার্থই অতঃপর তোমার স্বার্থ। দেবতারাই তোমার আত্মীয়। তুমি এই পৃথ্বীলোক সম্পর্কে নির্মোহ হও; কেননা দেবস্বার্থে, হে গোবিন্দ, তোমাকে বহুতর নির্মম ও নিষ্ঠুর কর্তব্য পালন করতে হবে। সবই তোমাকে জানালাম। অতঃপর দেবতাদের প্রীতি ও হর্ষের কারণ হও!

আভূমি নত হয়ে কৃষ্ণ ইন্দ্রকে অভিবাদন জানালে সেই রত্নকবচধারী (বর্ম) নীলবর্ণধর ইন্দ্র অগ্রসর হয়ে গোবর্ধনের পৃষ্ঠদেশে অপেক্ষারত তাঁর শুভ্রহস্তী চিহ্নিত ঐরাবৎ নামীয় যানে আরোহণ করলেন। কৃষ্ণের বিস্ময় উৎপাদন করে সেই যান চক্ষের নিমেষে আকাশপথে উত্থিত হল। কৃষ্ণ দেখলেন একটি শ্বেত পক্ষীর ন্যায় ইন্দ্রযান নভোনীল আকাশে ভাসতে ভাসতে অদৃশ্য হয়ে গেল। পড়ে রইল তার যাত্রাপথের চিহ্নস্বরূপ দুটি লম্বমান মেঘরেখা। কৃষ্ণ ইতিপূর্বে বহু দূর আকাশপথে উড়ন্ত বস্তু দেখেছেন। অভিজ্ঞ গোপবৃদ্ধরা বলেছেন, ঐ দেবতা যাচ্ছেন স্বর্গলোকে। আজ তিনি স্বচক্ষে সেই যান প্রত্যক্ষ করলেন। দেখলেন, পশ্চাদ্ভাগে ধূমরেখা নির্গত করতে করতে সে যান কেমন-ভাবে আকাশমার্গে উত্থিত হয়[৬]

আকাশের শূন্যতায় বিন্দুবৎ ইন্দ্রযানটি স্ফুটিত বুদ্‌বুদের মতো হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেলে কৃষ্ণ সেই আদিগন্ত তৃণক্ষেত্রের মাঝে একাকী দাঁড়িয়ে সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ অনুভব করলেন। এ কী স্বপ্ন, নাকি জাদু! সে কি জাগ্রত, না কি, নিদ্রিত!

কৃষ্ণ চারিদিকে তাকালেন। না, গোবর্ধন ছাড়া এখানে সাক্ষী হিসেবে আর কেউ উপস্থিত নেই। কৃষ্ণ পায়ে পায়ে ফিরে আসেন তাঁর পরিত্যক্ত শিলাসনে। রোদ হেলে পড়েছে। গোধূলি নামছে সারা গোষ্ঠ জুড়ে।

হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো কৃষ্ণ।

গোবর্ধনের গা বেয়ে পায়ে-চলা গড়ান পথে নেমে আসছে এক গোপ-কিশোরী। মাথায় ঘাসের বোঝা দুই কাঁধের ওপর ঝুলে পড়েছে। এক হাতে একটি অর্ধচন্দ্রাকার কাস্তে, অপর হাত ঘাসের বোঝা ধরে আছে। পরণে লাল ঘাঘরা। পায়ে রুপোর সিঞ্জিনী। বুকের ওপর যৌবনোদ্গমের ইঙ্গিতটুকু এক টুকরো রঙিন ওড়নায় ঢাকা। সবুজ ঘাসের ফাঁকে একখানি রাঙা মুখ কুন্দ কুসুমের মতো ফুটে আছে।

বাঁশিটা কুড়িয়ে নিয়ে তাতে সুর তুলল কৃষ্ণ, কৈ যাওত ব্রজবালা, থমকি দাঁড়াও…

ঘাসের বোঝা পাক খেয়ে ঘুরে গেল। রাঙা কুসুমটি যেন দুষ্টু সমীরণ-স্পর্শে আন্দোলিত হল খুশির আবেশে। এক লাফে কৃষ্ণ এসে দাঁড়ালো মেয়েটির অবতরণ পথ আগলে।

মুখ তুলে পাহাড়ী বাঁকে দৃষ্টি ছড়িয়ে কৃষ্ণ আর এক কলি সুর তুললো তার মোহন বেণুতে, · ···তুঁহু মম প্রাণ সখি! না যাও, আড় নয়নে দেখি ··

মেয়েটি কিন্তু আগের মতো ঝরণা হয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে গড়িয়ে নেমে এলো না। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, যেন ভীতা হরিণী পথে তার প্রাণঘাতককে দেখছে।

মুখ থেকে বাঁশি সরিয়ে দুই হাত প্রসারিত করে কৃষ্ণ বললে—এতো দেরি করে একা একা কী করছিলি পাহাড়ের ওপর? আয় আমার হাত ধর্!

—নেহি! তু পথ ছোড়্ কানু!

গোঁয়ারের মতো বলল সেই ফুটফুটে মেয়েটি।

কৃষ্ণ বুঝল, সারাদিন দেখা না হওয়ায় অভিমান হয়েছে গোরীর।

হেসে বললে,—পথ তো তোর সামনে খোলাই আছে। একটা নয়, অনেক পথ। যা না কোন্ পথে যাবি!

এরপর অপ্রস্তুত হওয়ার পালা সুনন্দ কন্যা গৌরীর। পাহাড়ের এই বাঁকে পায়েভাঙা পথ তিন ফ্যাকড়া হয়ে ঘোরানো সিঁড়ির মতো তিন দিকে নেমে গেছে। সোজা পথটি কৃষ্ণের রাতুল চরণপ্রান্তে এসে শেষ হয়েছে। বাকি দুটি চারণক্ষেত্রের দিকে প্রসারিত। গাঁয়ে ফিরতে হলে সোজা পথটিই সবচেয়ে স্বল্প দূরত্বের পথ।

গোরী গলা চড়িয়ে বলল,—সিধা পথকে তুই বাঁকা করছিস কানু! পথ ছোড়্! বেলা যায়! ঘরে সব্বাই ভাববে।

কৃষ্ণও শ্রুতিযোগ্য উচ্চগ্রামে গলা তুলে বলল,—তা, এতো দেরি বা করলি কেন? অন্য মেয়েরা তো চলে গেছে।

বৃথা বাক্য নিষ্ফল বুঝে দুদিকে ভারসাম্য বজায় রেখে দুলতে দুলতে নেমে এলো গোরী, বললে,—আমার খবরে তোর দরকার কি? তুই যা না কেন ঐ দেব্তার সঙ্গে, যে তোকে মালা পরিয়ে গেল। তুই রাজা হয়েছিস্ আমাদের কথায় আর কী কাজ!

কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল বোধহয়। কণ্ঠস্বর বুজে আসছিল অভিমানে। কিন্তু গোবর্ধনের পিঠে সূর্য নেমে যাওয়ায় এদিকটা আবছায়ায় ঢাকা পড়েছে, তাই তার ক্লিষ্ট মুখখানি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না।

কৃষ্ণ সতর্ক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো। গৌরীর অভিমান-অবরুদ্ধ কণ্ঠস্বর তাকে স্পর্শও করল না। দুশ্চিন্তার রেখা ফুটে উঠল কানুর নবদূর্বাদল-শ্যাম ললাট জুড়ে। ভেবেছিল, ইন্দ্রের সঙ্গে এই সাক্ষাৎকারের কোনো সাক্ষী নেই মূক বধির গোবর্ধন ছাড়া। এখন গৌরীর কথায় বুঝল, পাহাড়ের ওপর থেকে তাদের লক্ষ্য করেছে সে, আর সেজন্যই আজ সে সহচরীদের থেকে স্বতন্ত্র হয়ে একা। দেরি হয়ে গেছে তার প্রত্যাবর্তনে।

এক ঝটকায় গৌরীর বাহুমূল চেপে ধরে নিজের দিকে তাকে ঘুরিয়ে ধরল কৃষ্ণ। এই প্রবল আকর্ষণে গৌরীর মাথা থেকে ঘাসের বোঝা পড়ে গেল। যন্ত্রণায় ডুকরে কেঁদে উঠল গোপবালা। এমন কঠিন হাতে কৃষ্ণ তাকে আর কখনো ধরে নি। কৃষ্ণের করতলে যে এতো শক্তি, তাও সে জানত না। জানত, সেই করস্পর্শ শুধু সর্বাঙ্গ পুলকিত করে। একথা যেমন জানে গৌরী তেমনি জানে তার অন্যান্য অনেক সহচরী। সবার সঙ্গেই কৃষ্ণের ইতি উতি আসঙ্গ ঘটে থাকে। গোপীজনের মধ্যে এমন ব্যবহার দূষণীয় নয়। তাদের শরীর কোনো ব্যক্তি-বিশেষে উৎসর্গীকৃত সম্পদরূপে গহনার বাক্সে তোলা থাকে না। কৃষ্ণ গোপরাজ নন্দের ছেলে, রাজ্ঞী যশোদার আদরের গোপাল। ব্রজবালারা তাই তার স্পর্শে নিজেদের ধন্য জ্ঞান করে। কৃষ্ণের মাথা বুকে নিয়ে যেদিন যে কন্যা দ্বিপ্রহর অতিবাহিত করার সুযোগ পায়, তার দিকে সকলে সমীহের চোখে তাকায়। তবে গৌরীর কথা আলাদা। সঙ্গসুখ, রঙ্গসুখ এক জিনিস, আর মনের টান আর কথা। গৌরীর সঙ্গে কৃষ্ণের সেই মনের টান। গৌরীরও বুঝি তাই। সে অন্যান্য গোপিনীদের মতো লাস্যময়ী নয়। বিনে কৃষ্ণ তার মনে ভিন্ পুরুষে ঢেউ তুলতে পারে না। গুহা গোবর্ধন ধরে কৃষ্ণের বঙ্কিম মূর্তিতে দাঁড়ানোর পর গোপবালারা রঙ্গ করে গৌরীকে তাই বলেছে,—আহ, মেরে গিরিধারী গোপাল! দোসরা না কই! বলেছে, কানু বই গৌরী আর কাকেও জানে না। সেই গৌরী আজ তার কানুর স্পর্শে ব্যথা পেয়ে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল।

অনুরাগহীন কঠিন কণ্ঠে কৃষ্ণ ধমক দিয়ে বলল,—চুরি করে তুই এইসব দেখছিলি? তাই তোর এতো দেরি!

গৌরী দুটি পেলব করে চক্ষু মুছে বললে,—বেশ করেছি! ঠিক করেছি।

তুই ঐ দেবতার সঙ্গে আমাদের ছেড়ে চলে যাবি! আমি সব্বাইকে বলে দেব সব্বাইকে। ছাড়্ কানু, আমি আর কভ্ভি তোর কাছে আসব না।

গৌরী কাঁদে! এবার সে ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে কচি মেয়ের মতো।

কৃষ্ণ উদ্বিগ্ন চিত্তে এই গ্রাম্য গোপবালাকে দেখে। বুঝে পায় না কেমন করে শান্ত করবে তাকে। বোঝাবে, এ কথা কারুকে বলবার নয়। বললে বিপদ। বিপদ কৃষ্ণের। বিপদ সমস্ত ব্রজবাসীর। কেননা কংসের কানে ইন্দ্র-আগমনের ঘটনা পৌছালে কারও আর রক্ষা নেই।

গৌরীর চোখের দিকে তাকিয়ে কৃষ্ণ বোঝে, এ মেয়েকে ভয় দেখিয়ে বা শাসন করে চুপ করানো যাবে না। কৃষ্ণ ব্রজাঙ্গনাদের প্রতি বিমুখ হয়ে দেবতাদের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠবে, গৌরী তা প্রাণ থাকতেও সহ্য করবে না। প্রাণের বিনিময়েও কানুকে সে অপরের হাতে তুলে দিতে পারে না। তাই গৌরীর মতো মেয়েকে শান্ত করতে হলে প্রাণঘাতীর ভূমিকা নিলে সে চেষ্টা নিষ্ফল হবে তাকে ভোলাতে হবে প্রণয় সম্ভাষণে। মুহূর্তের বিবেচনায় কৃষ্ণ তার ইতিকর্তব্য স্থির করে ফেলে।

গাঢ় কোমল স্বরে বলে,—গৌরী। আমাকে তুই ভালোবাসিস?

কৃষ্ণের চোখের তারায় চোখ পাতে সবল গোপকন্যা। তার বিদ্রোহিণী দৃষ্টি নরম হয়ে আবেশে মুদে আসতে চায়। ধীরে ধীরে মাথা নামিয়ে ধরে নিজের বুকের ওপর। তার কবরীতে গোঁজা কয়েকটি পার্বত্যকুসুম কৃষ্ণের চোখের সামনে সমস্ত চরাচরকে রঙিন করে তোলার কামনায় আন্দোলিত হতে থাকে।

কৃষ্ণ এবার কিশোরী গৌরীকে বুকে টেনে নেয়। তার কানের কাছে ওষ্ঠ রেখে বলে,—আমার যদি বিপদ হয়, তোর কষ্ট হবে, নারে?

গৌরী বিস্ফারিত ডাগর চোখে তাকায়,—বিপদ! কিসের বিপদ!! তুই তো ইন্দ্রর তেজ ভেঙেছিস। গোবর্ধনের পেটে ঘর গড়েছিস। দেবতা এসে তোকে মালা পরিয়ে গেল।

কৃষ্ণ গৌরীর কপোল থেকে জল মুছিয়ে দিতে দিতে বলে,—কিন্তু কংস দেবতাদের ডরায় না। জানিস তো, সে দেবকীর ছেলেদের একটা একটা করে মেরেছে।

—মেরেছে তো মেরেছে। তাতে আমাদের কী? আমরা তো রাজার জাত নয় যে রাজ্য নিয়ে খুন খারাপি করব। আমরা তো ধেনু চরাই। তুই তো গোয়ালা। রাজা কংসের কথায় তোর কী কাজ?

এবার বিরক্ত হয় কৃষ্ণ। এ্যাতটুকুন মেয়ে, তার আবার বড় বড় কথার মুখ ঝামটা। বাপ মায়ের আদরে মেয়েটা সব সময়ই ঝামরে আছে। অবশ্য এটাই তার সৌন্দর্য। সে যখন চোখ পাকিয়ে, নাকের কচিপাটা স্ফুরিত কোরে মুখ ঝামটায়, তখন তার রূপ খোলে বড় চমৎকার। কৃষ্ণ তাই তাকে রাগিয়ে আনন্দ পায়। কিন্তু এই মুহূর্তে গৌরীর পাকামি অসহ্য বোধ হয়। রাজা রাজড়ার কথা তাকে বোঝানো মুস্কিল। কৃষ্ণ ও ব্রজের বিপদের কথা বলতে হলে যে সব গোপন তথ্য ফাঁস করতে হয়, তা বলা যায় না। এ মেয়েকে নিয়ে বস্তুত ঝকমারি।

একটু ভেবে কৃষ্ণ বলে,—রাজাদের তুই বুঝবি না। ওরা যে কি জন্যে কাকে মারে আর কাকে রাখে তা গয়লাবুদ্ধিতে কি বোঝা যায়। কিন্তু এটা তো বুঝিস, কংস দেবতাদের শত্রু, তাই দেবতারাও তার শত্রু. আবার দেবতারা কংসের শত্রু, তাই কংসও দেবতাদের শত্রু কি, বুঝিস কিনা?

বোঝে কি বোঝে না তা ভালো করে বোঝার আগেই সম্মতিসূচক মাথা হেলায় গোচারিণী। মুখে মিষ্টি দুষ্টু হাসি। কৃষ্ণ যখন মহা পণ্ডিতের মতো কথা বলে তখন তা উপভোগ করতে ভালো লাগে তার।

—তাহলেই বোঝ, দেবতারা এখানে আসে, আমার সঙ্গে দেখা করে জানলে, কংস আমাকে হাতী দিয়ে মাড়িয়ে মারবে।

—ওমা! তাহলে কী হবে গো!

গৌরী অকস্মাৎ গোপবালাদের মতো কপালে করাঘাত করে ডুকরে কেঁদে ওঠে। কৃষ্ণের যুক্তিতে এতোক্ষণে তার প্রাণে ভয়ের সঞ্চার হয়।

তাড়াতাড়ি তার ব্যাকুল মুখখানিতে হাত চাপা দিয়ে কৃষ্ণ বলে,—এই, এই চুপ কর। কী মুখ্যু মেয়ে। কেঁদে কেটে আমাকে কংসের হাতে ধরিয়ে দিবি নাকি।

এমন বোকা মেয়েদের বোঝানো সত্যিই কষ্টকর। মনে মনে বিরক্ত হয়ে ওঠে কৃষ্ণ। ব্রজের মানুষগুলির প্রতিই বিরক্তিতে মন ভরে যায়। বৃন্দাবনের ধেনুগুলির সঙ্গে এই দুপেয়ে মানুষগুলির তফাৎ খুঁজে পায় না। মহর্ষি গর্গের কাছে কৃষ্ণ জ্ঞানের আলো পেয়েছে। আকাশের দিকে তাকালে পুঞ্জ পুঞ্জ গ্রহ-রাজির দিকে দৃষ্টিপাত করলে, সে এখন আর শুধু অবাক হয় না। ঝড় বৃষ্টির মানে বোঝে। দেশ দুনিয়ার কথা জানে। কংস ছাড়াও রাজা আছে। আছেন হস্তিনাপুরের বীর সেনাপতি ভীষ্ম। আছেন উগ্রসেন, কুন্তিভোজ, বিরাট ও

দ্রুপদের মতো রাজা। আছেন জরাসন্ধ, ধৃতরাষ্ট্রের মতো রাজচক্রবর্তীরা। এই পৃথিবীর মাথার মুকুটের মতো আছে সুমেরু পর্বত। হিমাচল। সেখানে দেবতারা থাকেন তাঁদের স্বর্গরাজ্য আলো করে। এইসব ইতিহাস ভূগোল কৃষ্ণের দৃষ্টিকে দূর দূরান্তে প্রসারিত করেছে। মানসচক্ষে সে দেশ ও মানুষকে বুঝতে শিখেছে। তার তাই ধেনু ও গোষ্ঠসর্বস্ব এই ঘোষপল্লীকে এখন ভারি নির্বোধ এক মনুষ্যবসতি বলে মনে হয়। ক্রমশই সে হাঁপিয়ে উঠছে এদের মধ্যে।

মনে বিরক্তি চেপে গৌরীকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে কৃষ্ণ বলে,—তাহলে তুই কাঁদ! তুই চিৎকার করে সকলকে সব কথা বলে দে। দেখবি কংসের সেপাই এসে আমাকে শেকলে বেঁধে নিয়ে গিয়ে মাতাল হাতীর পায়ের তলায় ফেলে দেবে। আর কখনো এবং কোনোদিন তুই আমাকে দেখতে পাবি না।

—না। না! দীর্ঘশ্বাস মোচন করতে করতে কৃষ্ণের বাহুবন্ধ খুলে ছটফট করে উঠে বসে গৌরী, বলে,—এই তোর গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি কানু, কাকপক্ষীতেও কিছু জানবে না. আমি কারকে কিছু বলব না।

খুশি হয়ে কৃষ্ণ তাকে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দেয়।

পরিতৃপ্ত গোরী উঠে দাঁড়িয়ে বলে,—আমি যাই, বোঝাটা আমার মাথায় তুলে দে।

কৃষ্ণ ঘাসের বোঝা তার মাথায় তুলে দেয়।

দুপা এগিয়ে আবার ফিরে দাঁড়ায় গৌরী, বলে,—তুইও কথা দে কানু, আমাদের ছেড়ে কোথাও যাবি না!

কৃষ্ণ মোহন হাসিতে মুখ ভরিয়ে বলে,—আমি তো তোদের জন্যই. স্পষ্ট করে উত্তর দেয় না। জানে, সে আজ কথা দিলেও সেকথা কদিন পরেই মিথ্যে হয়ে যাবে। ইন্দ্র তাকে 'উপেন্দ্র' পদে অভিষিক্ত করে গেলেন। এরপর 'গোবিন্দ' কৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা ব্রজলোক ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়বে সমগ্র আর্যাবর্তে। আত্মীয় বলতে তখন তাকে বেছে নিতে হবে মথুরাবাসী এবং ইন্দ্রপুত্র পার্থকে।

১০

গৌরী তার প্রতিশ্রুতি রেখেছিল। ব্রজে দেবতার আগমনের সংবাদ প্রচারিত হওয়া যে বিপদজনক, বিশেষত তাতে কৃষ্ণের জীবন-সংশয়, এ কথাটা সে সহজ ভাবেই বুঝে নিয়েছে। রাজনীতির ঘোর-প্যাচ বোঝে না গোপকিশোরী, কিন্তু কংস ও দেবতাদের শত্রুতার কথা গোপীজনেরও অজ্ঞাত নেই। দেবতার পক্ষে কৃষ্ণ, সুতরাং কংসের রোষ অবধারিত, একথা সরল ভাবে বুঝতে অসুবিধা হয় নি।

কিন্তু খবরের গতি বাতাসের আগে ছোটে। গাঁয়ে ফিরে গৌরী দেখল, জায়গায় জায়গায় ছোট ছোট জটলা হচ্ছে ব্রজবালকদের ঘিরে গোপবৃদ্ধরা কি যেন সব গুরুতর পরামর্শ করছেন। কৌতূহলী গৌরী এমনি একটি জটলার মধ্যে এসে দাঁড়ায়। ভুলে যায় তার মাথায় তখনও ঘাসের আঁটি, যার মানে সবেমাত্র সে গোষ্ঠ থেকে প্রত্যোবর্তন করেছে।

বৃদ্ধরা গৌরীর দিকে সন্দিগ্ধ চোখে তাকালেন

জনৈক বৃদ্ধ ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে বললেন,—গোঠে গিয়েছিলি?

জিভের ডগায় মিথ্যে নিয়ে গাঁয়ে প্রবেশ করতে হবে, মনে মনে এই প্রতিজ্ঞা এঁটে এসেছে গৌরী। মাথার বোঝা দুপাশে নাচিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সে তাই উত্তর দিল,—কৈ, না তো।

গৌরীর এই সরল মিথ্যাভাষণে ছোট ছেলেমেয়েরা কলকলিয়ে হেসে উঠল। আঙুল তুলে ঘাসের বোঝা দেখিয়ে হাততালি দিয়ে তারা বললে,—মিথ্যেবাদী, মিথ্যেবাদী!

বৃদ্ধেরা মুখ চাওয়াচায়ি করলেন। একমাত্র বিপদের আশঙ্কা ছাড়া ব্রজে কেউ মিথ্যে বলে না। বাচ্চারা মারধোরের আশঙ্কায় মিথ্যে বলে, আবার তখনই তা কবুল করে। গৌরী তার গোঠে যাওয়ার জলজ্যান্ত প্রমাণ মাথায় নিয়ে তবে মিথ্যে বলছে কেন?

বৃদ্ধ ধমক দিয়ে বললেন,—সাচ বাত বোল্ গৌরী! কানুয়া কোথায়?

—আমি জানি না। না! হম্ নহি জানে!

শক্ত করে গৌরীর বাজু ধরে ঝাঁকি দিলেন বৃদ্ধ গোপ। কড়া গলায় ধমক দিয়ে আবার বললেন,—সত্যি কথা বল্, কানুর সঙ্গে কে দেখা করতে এসেছিল?

—ছোড়ো না চাচা। হম্ নহি জানে!

কান্নাভেজা কণ্ঠে মিনতির স্বরে গৌরী বলে আর বৃদ্ধের মুঠি ছাড়িয়ে পালাতে চায়। তার চোখে জল আসে। হাতের ওপর আজ বড় পরীক্ষা চলছে!

—কই নহি আয়া?

—হম্ নহি জানে!

—তু নহি দেখা?

—হম্ নহি জানে! বলতে বলতে ভ্যাঁ করে সশব্দে কেঁদে ফেলে গৌরী।

অপর এক বৃদ্ধ বলেন,—ওকে ছেড়ে দাও। চলো, আমরা নন্দ গোপের বাড়ি যাই।

—তাই চলো! এ মেয়ে কথা বলবে না। নিশ্চয় কানুই তাকে মানা করেছে।

জটলা চলতে থাকে। সেই মিছিলে অন্যান্যরাও যোগ দেয়। গৌরীর বুকের মধ্যে উথালপাথাল ঢেউ আছড়ে পড়ে দমাস করে। সর্বনাশ, সব যে জানাজানি হয়ে গেছে। কানু শুনলে ভাববে, সেই বলে দিয়েছে। তখন সে আর কথা বলবে না, কাছে ডাকবে না! হায়। গৌরী তাহলে কী নিয়ে বাঁচবে! গোপাল ছাড়া সে যে দোসরা কারোকে আর জানে না।

জটলা এগিয়ে গেলে মাথা থেকে ঘাসের বোঝা ফেলে দিয়ে ভিন্ পথে পাগলিনীর মতো দৌড়ায় গৌরী। কানুকে আগেই সব খবর জানাতে হবে। বলবে,—হে কান্হাইয়া! বিশোয়াস কর্, হম নহি বোলা!

ব্রজপুরে যে খবর ছড়িয়ে পড়েছে, গোপরাজ নন্দের কাছেও তা আগেভাগেই পৌছাবে এতে আর সন্দেহ কি। নন্দের অনুচরের সংখ্যাও তো কম নয়। সংবাদ তারাই এনেছে। সংবাদ পৌছেছে অন্তঃপুরেও। শুনে দুপা ছড়িয়ে কাঁদতে বসেছেন নন্দরাণী যশোদা। কপালে করাঘাত করে রোহিণীকে বলছেন তিনি,—কী হবে গো দিদি! ছেলেকে যে আমার দেবতায় ধরেছে গো। এ ছেলে কি আর আমার বুকে থাকবে?

রোহিণী শোনেন। জবাব দেন না। উদাস চোখে তাকিয়ে থাকেন আকাশের দিকে। যশোদা কেঁদে তাঁর বুকের ভার হাল্কা করতে পারেন। স্বামীর কাছে বসে বলতে পারেন নিজের এই দুঃখ আশঙ্কার কথা। কিন্তু রোহিণী? মথুরার রাজনীতি তাঁকে নিঃস্ব করেছে। স্বামী বসুদেব দেবকীকে নিয়ে শূরসেনের রাজধানীতে বসে আছেন। রোহিণীর চলছে নন্দালয়ে বনবাস। বলরাম তাঁর চোখের সামনে বড় হচ্ছে বটে, কিন্তু রোহিণী জানেন ও ছেলে তাঁর নয়। বসুদেবের ঔরসে এপুত্র তিনি লাভ করেন নি। কোনো গর্ভ যাতনা অনুভব করতে হয়নি তাঁকে মায়ের মতো। বুক ভরে দুধও আসেনি রাম জন্মের পর। কৃষ্ণের মতো বলরামও নন্দরাণীর দুধ খেয়ে বড় হয়েছে।

এক গভীর নিশুত রাত্রে কয়েকটি ছায়ামূর্তি এসে প্রবেশ করে রোহিণীর কুটীরে। তাদের মধ্যে একজন দিব্যকান্তি নারীও ছিলেন। পরে তাঁর নাম শুনেছেন রোহিণী, যোগমায়া। ছায়ামূর্তিরা খসখসে গলায় সদ্যজাগ্রতা রোহিণীকে শব্দ করতে মানা করেছিল। যোগমায়া এগিয়ে এসে রোহিণীর বাহুতে কী যেন একটা সূচের মত বস্তু বিদ্ধ করেছিলেন। তারপর গাঢ় নিদ্রায় ঢলে পড়লেন রোহিণী। এইভাবেই নাকি বলরাম তাঁর গর্ভে এলেন। বলরামও দেবকী পুত্র। দেবকীর সপ্তম গর্ভের সন্তান। রোহিণী শুধু তার গর্ভধারিণী

কৃষ্ণ রামের নামকরণ করতে এসে ঋষি গর্গ বলেছিলেন,—রামের আর এক নাম থাক, সঙ্কর্ষণ! গর্ভাকর্ষণের ফলেই তার জন্ম।

রোহিণী জনান্তিকে এই নামের অর্থ জানতে চেয়েছিলেন। গর্গ বলেন—দুঃখ কোর না মা, তুমিও যে বিষ্ণুপুত্রের জননী দেবধাত্রী যোগমায়া দেবপুত্র বলরামকে দেবকী গর্ভ থেকে আকর্ষণ করে এনে তোমার গর্ভে প্রোথিত করে গেছলেন। এ সেই ছেলে। একে অযত্ন কোর না।

চোখের জল মুছে রোহিণী বলেছিলেন,—আমি কী পেলাম ঠাকুর। না স্বামীর সহবাস, নাপুত্র?

আশীর্বাদ করে গর্গ বলেছেন,—দেশ জাতির জন্য কত আত্মত্যাগ করতে হয় মানুষকে। এই তো ইতিহাস মা। একের আত্মত্যাগে অপরের প্রতিষ্ঠা। তুমি সাধারণ গোপবালা তো নও। তুমি বসুদেবজায়া। ইতিহাস তোমার কথা স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখবে। আর স্বামী সহবাসের কথা? দেবকীর এই সন্তান, কৃষ্ণ ও বলরাম, এঁরাও বসুদেবের ঔরসজাত নয়। সুতরাং সে দুঃখও মনে রেখো না।

উপদেশ সবাই দিতে পারে। গর্গও দিয়েছেন। শুনিয়েছেন দেবতাদের

মাহাত্ম্য কথা। কিন্তু সেসব শুনে রোহিণীর কি লাভ ? তিনি তো নারী। দেবকী স্বামীর পাশে আছেন। সব যাতনা তাঁর তাই সহ্য হয়ে যায়। সহবাসও তার একবার নয়, একাধিকবার হয়েছে। হোক তা বসুদেব বা অপর কারও সঙ্গে। দেবকী পূর্ণ হয়েছেন। কৃষ্ণ তাঁর অষ্টম গর্ভের সন্তান। আর রোহিণীর ? বৃথা হতে চলেছে তাঁর নারীজন্ম। গর্গ বলেন, দেবতার পুজোয় উৎসর্গ করো নিজেকে। কেন, দেবতাদের তো ভোগসুখের অন্ত নেই। সব ত্যাগ কি শুধু মর্ত্যজনের জন্য ?

এ সব কথা ভাবতে বসলে সব ভুলে যান রোহিণী। আকাশে ভাবলেশহীন দৃষ্টি তুলে উদাসিনী শুধু বসে থাকেন। কারা-যন্ত্রণার চেয়েও এ যাতনা আরও তীব্র। যে তা না ভুগেছে, সে জানবে কী করে। অথচ এসব কথা মনেই চেপে রাখতে হয়। গর্গের নিষেধ, বসুদেবের মঙ্গলের জন্য একথা যেন রোহিণী পাঁচকান না করেন।

রোহিণীর ভাব দেখে এক এক সময় দয়াময়ী যশোদার বুকেও রক্ত গরম হয়ে ওঠে, কণ্ঠে বিষ ঢেলে তিনি বলেন,—মা না রাক্ষুসী ! রোহিণীর প্রাণে ছেলের জন্য একরত্তি দরদ নেই গা ! বাছা রাম আমার যেন শুধু গড়িয়ে গড়িয়েই মানুষ হচ্ছে।

যশোদার সখীরা কোন্দলের গন্ধ পেয়ে নন্দরাণীকে ওস্কায়,—ওর কথা আর বোলনি, ওকে ডাইনে পেয়েছে। দেখো না, রাতদিন পথ পানে চেয়ে বসে থাকে, যেন মহারাণীর জন্যে সগ্‌গের রথ আসবে। তোমার বুকে দুধ না থাকলে বলাই কি বাঁচত ?

যশোদা নিজে যদি বা দু একটা কটু কথা রোহিণীর অসাক্ষাতে বলেই ফেলেন, অপরের মুখে তার নিন্দাবাদ কিন্তু সহ্য হয় না।

নরম গলায় বলেন,—আহা ! বড় দুখিনী রে ! ওকে দেখলেও কষ্ট হয়। যেন বনবাসের সীতা।

আসর জমে না দেখে পড়শি বধূরা ক্ষুব্ধ হয়ে বলে,—অতই যদি দরদ তবে আর ঝামরাও কেন ?

সুন্দর গৌরকান্তি মুখে বিষাদের ছায়া ঘনিয়ে আসে। যশোদা বলেন—রোহিণীর দিকে তাকিয়ে মনে হয়, তার মনটাও আমার মতই তোলপাড় করে। তাই যখন গালমন্দ করি, সে তো আমি নিজেকেই করি। দেখতো, একা একা দিদি আমার কী করছে। যদি পারতাম, আমি ওর চোখের জল মুছিয়ে দিতে !

নন্দালয়ের বহির্বাটী সরগরম হয়ে ওঠে ব্রজবাসীদের মিছিলকণ্ঠের উত্তেজিত গুঞ্জনে। গায়ে উড়ুনি জড়াতে জড়াতে হন্তদন্ত হয়ে নন্দ এসে আঙিনায় দাঁড়ান।

—কী, কী ব্যাপার, সুনন্দ ভাই ?

—সেই ব্যাপারের কথাই তো জানতে এলাম আমরা। বলি, তুমিই না আমাদের মঙ্গল অমঙ্গলের নেতা। আমরা তোমাকেই মোড়ল মেনেছি। এখন তোমার ঘর থেকে যা সব ঘটছে তাতে ব্রজের মানুষ ভয়ে আশঙ্কায় মুষড়ে পড়ছে। এসবের মানে কি, আমরা জানতে চাই।

—হ্যাঁ, আমরা শুনতে চাই। আমাদের সব কথা বলতে হবে!

দাবি ওঠে সমস্বরে।

ব্রজবাসীরা কথা গুছিয়ে বলতে পারে না। অভিযোগটা কি সেটা উহ্য থেকে যায়, প্রকাশ পায় উষ্মা ও উদ্বেগ। কিন্তু এদের হাঁ করতে দেখলেও মনের কথা বুঝতে পারেন নন্দ। তাছাড়া আগেই তিনি কৃষ্ণকে নিয়ে গাঁয়ে জটলার কথা শুনেছেন। তাই দু হাত তুলে সকলকে শান্ত হতে বলে তিনি ঠিক মোড়লের মতই জনতার মনে বল ও সাহস যোগান দিয়ে বক্তৃতা শুরু করেন। ঠিক এইভাবে কিছুদিন আগে জনতাকে শান্ত করতে হয়েছিল। সেটা ছিল ইন্দ্রযজ্ঞ বন্ধের পর প্রবল বর্ষণের ও শিলাপাতের ফলে ভীত মানুষের জমায়েত। আজ কৃষ্ণের সঠিক পরিচয় দাবি করতে এসেছে ব্রজবাসীরা। তাদের মন সন্দেহের দোলায় বিক্ষিপ্ত বিপর্যস্ত হয়ে আছে।

জনৈক বৃদ্ধ বলেন,—বলো, কৃষ্ণ কে ? অতটুকুন ছেলে গোবর্ধনের বুকে গর্ত খুঁড়ে ঘর বানায় কেমন করে ? গোবর্ধন ধারণ কি চাট্টিখানি কথা। দেবতারা যা পারেন, তাকি গোয়ালারা পারে ?

অপর বৃদ্ধ আরও একটু গলা চড়িয়ে বলেন,—কানুকে নিয়ে আমাদের সব সময়ই সন্দেহ ছিল, আমি তোমাদের বলিনি এর আগে ? ও ছেলের দেহের রঙ দূর্বো ঘাসের মতো। মানুষের গায়ের কি এমনি রঙ হয় ? ও দেবতাদের ছেলে। শুনেছি দেবতা বিষ্ণু আর ইন্দ্রর গায়ের রঙ নীলকান্ত মণির মতো। বলো নন্দ! আমাদের সত্যি কথা বলো!

কোনো গোপবৃদ্ধের পক্ষে এমন একটা বুদ্ধিদীপ্ত সিদ্ধান্তে আসা যে সম্ভব তা নন্দ একবারও ভেবে দেখেন নি। যে কথা তিনি বলবেন মনে করে এসেছিলেন, এই প্রশ্নাতুর উত্তাল জনতার দিকে তাকিয়ে তা সবই তাঁর গোলমাল

হয়ে গেল। যা বলা অনুচিত, যা বলতে গর্গ পইপই করে মানা করে গেছেন. এখানে দাঁড়িয়ে জনতার বিক্ষোভ সামাল দিতে তা-ই বলে ফেললেন।

বললেন,—আমি আগেই বলেছি, তবু যদি তোমরা বুঝতে না পেরে থাকে' তবে আবার বলছি। যদি আগে কিছু গোপন করে থাকি, তবে তা করেছি সমস্ত ব্রজকুলের মঙ্গলের জন্যই। কিন্তু গোকুলে যে সব ঘটনা পর পর ঘটছে, বুঝতে পারছি, তার জন্য বারবার আশ্বস্ত করলেও, আমার ওপর তোমরা আস্থা রাখতে পারছ না। আমিও সব দায়িত্ব আর একার ওপর রেখে সুখে নিদ্রা যেতে পারছি না। আমার চোখের ঘুম গেছে। মনের শান্তি গেছে। কিন্তু আমরা নিরুপায়।

—কেন, কেন! আমাদের কি বিপদ দেখা দিয়েছে?

—না, এখনো কোনো বিপদ দেখা দেয়নি। তবে কংসের রাজত্বে এখন সর্বত্রই বিপদ। সে বিপদ আমাদেব ওপরেও এসে পড়তে পারে।

—কিন্তু আমরা তে' কারো ক্ষতি করি না। মহারাজ কংসকে ঠিক সময় খাজনা দেই। রাজ্যের দুধ মাখন ছানার যোগান দেই।

—তবু আজ বড় বিপদের দিন, ভাইসব। সব কথা সকলের সামনে বলার নয়। তোমরা তোমাদের বিশ্বস্ত বৃদ্ধ প্রতিনিধি নির্বাচন করে দাও, যাঁদেব আদেশ মতই তোমরা চলতে রাজি আছ। আমি কেবলমাত্র তাঁদেরই সব কথা বলব। এসবই খুব গোপন ও জরুরী কথা।—নন্দ এইভাবে গোপনীয়তা রক্ষা করতে শিখেছেন বসুদেবের কাছে। বসুদেব সব সময়ই নন্দর সঙ্গে গোপন বৈঠক করেন। ক্রমে নন্দও এই গোপনীয়তার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছেন।

ব্রজবাসীরা সুনন্দসহ কয়েকজন বয়স্ককে নির্বাচিত করে বিদায় নিলেন। প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলেন ব্রজবাসীর মঙ্গলের জন্য এরপর আর সকলে মিলে হৈ চৈ করবেন না। নন্দ, সুনন্দ ও বৃদ্ধরা যেমন আদেশ নির্দেশ দেবেন সকলে তা বিনা প্রশ্নে মান্য করবে।

নন্দ পাঁচজন বয়োবৃদ্ধের সঙ্গে রুদ্ধদ্বার কক্ষে এসে বসলেন। নন্দের আদেশে দুটি পাথরের পাত্রে পেস্তা পায়েস ও চপাত্র উপাদেয় লস্যি এলো অন্তঃপুর থেকে।

নন্দ শূরসেনের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, যতটুকু তিনি নিজে বোঝেন, তা ব্যক্ত করে বললেন,—কংসের বিপক্ষীয়রা দেবতাদের শক্তিতে ক্রমেই বলবান হয়ে উঠছেন শূরসেনে। এরপর তাঁদের হাতে আসবে দেশের ক্ষমতা। সেই

ক্ষমতার মাথায় থাকবেন বসুদেব আর মহর্ষি গর্গের মতো মানুষেরা। সৌভাগ্যত বসুদেব তাঁর বাল্য বন্ধু। ব্রজের স্বার্থে নন্দ তাই বসুদেবের সঙ্গে গোপনে হাত মিলিয়েছেন।

সমস্ত ব্যাপারটা বুঝে বৃদ্ধরা মাথা নেড়ে বললেন,—এভাবে জড়িয়ে পড়া যদিও উচিত হয়নি. কিন্তু যদি দেবতারা সহায় হ'ন তবে তাঁদের দলে থাকাই ভালো। তাঁরা আকাশ থেকে শিলাবৃষ্টি করে গ্রাম নগর ধ্বংস করে দিতে পারেন। দারুণ ক্ষমতাবান।

নন্দ বললেন -তাহলেই বোঝো। সেদিন যে ব্রজের ওপর শিলাপাত হয়ে গেল সেটা তো দেবতাদের খেলা মাত্র। ঐ শিলাপাত করে তাঁরা বুঝিয়ে দিলেন তাঁরা কত ক্ষমতাবান। আবার দেখো, কৃষ্ণ স্বয়ং দেবপুত্র বলেই গোবর্ধনের গর্ভে গৃহ নির্মাণ করে গো ও গোকুলকে রক্ষা করলেন।

—কৃষ্ণ দেবপুত্র!—বৃদ্ধরা সমস্বরে অস্ফুটে উচ্চারণ করলেন কথাগুলি

নন্দ ঘাড় নেড়ে বললেন,—হ্যাঁ। মথুরাপুরে যদুকুলের গুরু মহর্ষি গর্গ, যিনি প্রায়ই দেবতাদের সঙ্গে স্বর্গে যাতায়াত করেন, তিনি যা বলেছেন, তা বলছি. কিন্তু ব্রজকুলের স্বার্থে এসব কথা যেন আর কেউ জানতে না পারে। তোমরা কঠোর গোপনীয়তা রক্ষা করো।

সুনন্দ বললেন,—তোমার কথায় এবার আমরা সব ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পারছি। এসো, রাজা নন্দ ঘোষের সামনে আমরা শপথ করি, আমরা মন্ত্রের মত সব কথা গোপন রাখব!

নন্দ বললেন,—"গর্গ এই বালককে উদ্দেশ্য করে যা বলেছিলেন তা বলছি শোন— এই পুত্র আগে কোন সময় বসুদেবের ঘরে জন্মায়। তাই পণ্ডিতরা এঁকে বাসুদেব বলে থাকেন।...এই পুত্রের গুণ ও কর্মের অনুরূপ অনেক নাম ও রূপ আছে। সে সমস্ত আমি জানি না, লোকেরাও জানে না। ইনি গরু ও গোকুলের আনন্দ জন্মিয়ে তোমাদের মঙ্গল সাধন করবেন। তোমরা এঁর দ্বারা সকল বিপদ থেকে রক্ষা পাবে।...যেমন অসুররা বিষ্ণু ভক্তদের পরাভূত করতে পারে না, তেমনি যেসব সৌভাগ্যশালী মানুষ তোমার এই পুত্রকে প্রীতির চক্ষে দেখেন, তাদের শত্রুরা পরাস্ত করতে সমর্থ হয় না। হে নন্দ, তোমার এই পুত্র গুণ. সম্পত্তি, কীর্তি ও প্রভাবে নারায়ণের সমকক্ষ। অতএব হে গোপগণ, এঁর কার্যাবলী দেখে আশ্চর্যান্বিত হবার কারণ নেই।"[১]

গর্গকে সবাই চেনেন না। কিন্তু শূরসেনে যদুবংশই প্রধান একথা প্রত্যেক ব্রজবাসীরই জানা। গর্গ সেই যদুদের কুলগুরু। অতএব আর প্রশ্নে কাজ কি। মহর্ষিবাক্য মাত্রেই আদেশ এবং তা বিনা বাক্যে শিরোধার্য, এই তো নিয়ম। ব্রজের বৃদ্ধ প্রতিনিধিরা যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। এই মানুষগুলিকে কিছু একটা বোঝানো খুব শক্ত কাজ নয়। অলৌকিকতায় বিশ্বাস নিয়েই এদের জন্ম। কোনো ঘটনার সঙ্গে অলৌকিক কাহিনী যুক্ত থাকলে এরা তাকে ঐশীক্রিয়া বলে তৎক্ষণাৎ হেঁটমুণ্ডে মান্য করতে প্রস্তুত, কেননা ঈশ্বরের লীলা ছাড়া প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর অন্য কোনো ব্যাখ্যা এদের কাছে কেউ কখনও হাজির করে নি। আকাশপথে যন্ত্রযানে বিচরণশীল দেবতারা আশ্চর্য ঐশীশক্তির মালিক এ কথাও তারা এভাবেই বোঝে। তাই আর তর্ক করে না। প্রত্যক্ষের কোনো ব্যাখ্যা না থাকায় অপ্রত্যক্ষের প্রতিই ভয়, ভক্তি ও নিভরতা এদের জ্ঞানের একমাত্র অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায়।

বৃদ্ধেরা উঠে দাঁড়ালে নন্দও গাত্রোত্থান করলেন।

বললেন,—তোমরা যে দেবতার সঙ্গে কৃষ্ণের আলাপেব কথা শুনেছ, সেই দেবতা স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র।

শোনামাত্র বৃদ্ধরা ইন্দ্র ও কৃষ্ণেব নামে জয়ধ্বনি করেন।

নন্দ বলেন,—গোবর্ধন গর্ভে গৃহ নির্মাণ কবে কৃষ্ণ যে অলৌকিক কাজ করেছে, দেবরাজ এসেছিলেন তারই জন্য কৃষ্ণকে অভিনন্দিত করতে। শুনে সুখী হবে তোমরা, দেবরাজ থেকে আমাদের আর কোনো অমঙ্গলের আশঙ্কা নেই। তিনি স্বয়ং কৃষ্ণকে গোকুলের অধিপতি নির্বাচন করে গেছেন। কৃষ্ণকে অতঃপর সকলে 'গোবিন্দ' ও 'উপেন্দ্র' বলেই জানবে। আমি তাঁকে স্বয়ং নারায়ণের অংশ রূপে জেনে পুজো করি!

সুনন্দ বলল,—আমরাও গোবিন্দের পুজো করে যাবো। নন্দ, তুমি সেই শ্যামসুন্দরকে এখানে আনো। আমরা তাঁর সেই আশ্চর্য বৈজয়ন্তী মালাটি দেখে জীবন সার্থক করি।

নন্দের আহ্বানে কৃষ্ণকে পাশে নিয়ে গৌরকান্তি বলরাম এসে দাঁড়ালেন। দুটি যেন শ্বেত ও কৃষ্ণ প্রস্তরের শৈলমূর্তি। কৃষ্ণের অপূর্ব বেশ।

চন্দনে বিচিত্রিত অঙ্গ ও মুখমণ্ডল। মাথায় রৌপ্য মুকুটে ময়ূরকেতন। দুই বাজুতে রৌপ্যালঙ্কার। মণিবন্ধে পুষ্প বলয়। পরণে পীত বস্ত্র এবং কটিতে

সুনীল মেখলা। রক্তরঞ্জিত চরণযুগে রূপার সিঞ্জিনী। এবং বক্ষে ইন্দ্র-প্রদত্ত বৈজয়ন্তী মালা।

নন্দের আদেশে এভাবে তাঁকে সাজিয়ে পাঠিয়েছেন রোহিণী। যশোদা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে দেখেছেন সেই রাজবেশ। তাঁর দুই চোখ আনন্দাশ্রুতে বার বার ঝাপসা হয়ে গেছে। বুকের মধ্যে কুলকুল করে বইছে যেন পার্বত্য স্রোতস্বিনী।

বলরামের হাত ধরে কৃষ্ণ বহির্বাটীর দিকে পা বাড়ালে যশোদা সেদিকে তাকিয়ে আপন মনে অস্ফুট স্বরে বলেছেন—ওগো! আমার কান্‌হাইয়া রাজা হয়েছে! ব্রজের রাখাল হয়েছে গোবিন্দ!

বর্ষীয়সী মেয়েরাও সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেছে ঐ একরত্তি ছেলেকে।

যাবার সময় কৃষ্ণ মধুর মুখে একবার হেসেছিল নন্দরাণীর চোখে চোখ পেতে, কিন্তু আগের মত গলা জড়িয়ে চুমো খেয়ে প্রণাম করে যায় নি। বরং মেয়েরা বলেছে,—ও লো, নন্দরাণী! প্রণাম কর। প্রণাম কর!

শুনেছে কি শোনেনি যশোদা; পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে গেছে। প্রণামের কথা মরমে পশে নি। সারা অন্তর জুড়ে তাঁর তখন একটিই মাত্র আর্তি! হে ঠাকুর! রক্ষা করো আমার কান্‌হাইয়াকে। ও যে এই দুদিন আগেও আমার দুধ খেয়েছে। ননী খেয়েছে চুরি করে হাঁড়ি ভেঙে। ওর কি এখনো রাজার মতো বুদ্ধি হয়েছে! মিনসেগুলো কচি ছেলেকে নিয়ে দুষ্টু মতলব আঁটছে, ঠাকুর! দয়াময়, তুমিই ওকে দেখো!

গোপরাজবেশী কৃষ্ণ অগ্রজ বলরামের পাশাপাশি নন্দের পাশে এসে উপস্থিত হলে গোপবৃদ্ধরা চমৎকৃত হয়ে অপলকে তাকিয়ে রইল কৃষ্ণ বলরামের দিকে। কর্তব্যবিমূঢ় গোপগণকে প্রকৃতিস্থ করার উদ্দেশ্যে নন্দগোপ অল্প বিরতির পর প্রগাঢ় কণ্ঠে বলে উঠলেন,—জয় বিষ্ণু মহারাজের জয়। জয়, দেবরাজ ইন্দ্রের জয়।

সুনন্দসহ অন্যান্য গোপবৃদ্ধদের বিস্ময়াবেশ যেন দ্বিগুণিত হল। আজ একযোগে বিষ্ণু ও ইন্দ্রের জয়ধ্বনি করছে নন্দগোপ। বিবাদ মিটে গেছে তাহলে ইন্দ্রের সঙ্গে।

ভূমিশয্যায় বুক পেতে শুয়ে পড়লেন আশ্বস্ত বৃদ্ধরা। কৃষ্ণের চরণ প্রান্তের দিকে দুই বাহু প্রসারিত করে জানালেন সাষ্টাঙ্গ প্রণাম।

ঘটনাটিতে অভিভূত হয়ে পড়েছিল কৃষ্ণ। হাজার হোক বয়স তার অল্প। সে গোপবৃদ্ধদেরই গুরুজন মেনে এসেছে এতোকাল। ক্ষণিকের জন্য মনোশ্চাঞ্চল্যে সে বোধহয় ঋষি গর্গের উপদেশও বিস্মৃত হয়েছিল। অগ্রজ

বলরাম কৃষ্ণের ভাবান্তরে সচেতন হয়ে ওঠে। মনে পড়ে যায় গর্গের উপদেশ,—বৎস! ঘটনা এমনই ঘটবে যে তুমি গোকুলে স্বয়ং বিষ্ণুর অবতাররূপে প্রতিষ্ঠিত হবে। তখন গোকুলবাসীরা নিশ্চয় তোমাকে পূজা নিবেদন করবে। তার উত্তরে তুমি ঠিক এইভাবে, যেমন মুদ্রা আমি তোমাকে দেখাচ্ছি, ঠিক সেইভাবে মুদ্রা প্রদর্শন করে বলবে···

গর্গের মূর্তিটি চোখের ওপর ভেসে উঠতেই বলরাম কৃষ্ণের কানে কানে বলল,—কানু! ঋষি গর্গের উপদেশ স্মরণ করে এবার তুমি তোমার কাজ শুরু করো!

সংবিৎ ফিরে এলো কৃষ্ণর। মনে পড়ে গেল গর্গের সমস্ত শিক্ষা। একবার নয়, বারান্বয়ে মহড়া করিয়েছেন গর্গ। অদ্ভুত ভবিষ্যৎদ্রষ্টা। ঠিক যেমনটি বলেছিলেন, ঘটনা সেভাবেই ঘটছে।

আশীর্বাদের ভঙ্গিতে দুই হাত তুলে গর্গের মতই স্মিতমুখে প্রশান্তভাবে দাঁড়ালো কৃষ্ণ। তারপর দুই করতলে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ স্পর্শ করে করপদ্মের মুদ্রা সাজিয়ে মেঘমন্দ্র স্বরে বলল,—হে প্রীতি-উৎপাদক গোপবৃন্দ! ওঠো! আমি তোমাদের অভয় দান করছি।

বালকৃষ্ণের মুখে এমন সুগম্ভীর আশ্বাসবাক্য শুনে বৃদ্ধরা মাথা তুললেন। নব রাজবেশে সুসজ্জিত কৃষ্ণের বিশেষ বিভঙ্গ মূর্তি তাঁদের যেন সম্মোহিত করেছে। বিশ্বাস করলেন তাঁরা কৃষ্ণযাদুতে, কেননা ইতিপূর্বেই গোবর্ধনে গর্তগুহা সৃষ্টির কৃতিত্বও তাঁরা কৃষ্ণকৃতিত্ব হিসেবে গণ্য করেছেন, এরপর আজই ঘটেছে আর এক কাণ্ড। দেবতা তাঁর উড়ন্ত যানে গোকুলে এসে নেমেছেন, পরিয়ে গেছেন কৃষ্ণকণ্ঠে বৈজয়ন্তী মালা।

জনৈক বৃদ্ধগোপ তাঁর মুহ্যমান অবস্থা কাটিয়ে বিমূঢ় কণ্ঠে বললেন,—কৃষ্ণ! তোমাকে আমরা এরপর কী বলে ডাকব? তুমি ব্রজের নাথ হলে। হে ব্রজনাথ! এই ব্রজের স্ত্রী-পুরুষ বৃদ্ধ-শিশু সকলেই তোমার অলৌকিক কাজকর্মে মুগ্ধ। তুমিই তাদের সহায় ও রক্ষক। তুমি যা কিছু করেছ ও করছ তা দেবতারাও করতে পারেন না।

কৃষ্ণের মুখে মৃদু হাসির রেখা আরও প্রসারিত হল।

তখন ব্রজকুলে নন্দের পরেই শিক্ষিত সুনন্দ বলল,—হে ব্রজনাথ! তুমি কৃষ্ণরূপে স্বয়ং বিষ্ণু, তাই আমরা তোমার পুজো করি। সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা, আমাদের মতো এই নীচকুলে তুমি জন্ম নিলে কেমন করে! কিন্তু তুমি

যে-ই হও না কেন, তুমি আমাদের দোষ নিও না, আমাদের পরম আত্মীয় হয়েই থেকো।

গর্গের কথা স্মরণ করে কৃষ্ণ উত্তর দিল,—তোমরা কখনো বিচার কোরো না। আমাকেই আশ্রয় করো!

নাটকের সুশিক্ষিত কুশীলবের মতো কৃষ্ণ বলরাম যেমন প্রবেশ করেছিল তেমনিই সমারোহপূর্ণভাবে প্রস্থান করল। বৃদ্ধ গোপেরা কিছুক্ষণ বাকরুদ্ধ হয়ে করজোড়ে বসে রইল। কৃষ্ণের আদেশ তাদের সমস্ত ব্যক্তিত্ব যেন হরণ করে নিয়ে গেছে।

নন্দের উপস্থিতির কথা ভুলে ছিল সবাই। কৃষ্ণ বলরাম প্রস্থান করলে এইবার তারা গোপরাজ নন্দের দিকে ফিরে তাকায়।

স্থির প্রস্তরমূর্তির মতো উদাস চোখে দাঁড়িয়ে আছেন নন্দ ঘোষ। মনে হচ্ছে এ এক দণ্ডায়মান সমাধিস্থ মূর্তি।

সুনন্দ কাছে এসে বলে,—মহা সৌভাগ্যশালী তুমি নন্দ। আমাদের ওপর কোনও বিরাগ রেখো না, ভাই! আমাদের ক্ষমা করো!

নন্দ ভাবলেশহীন চোখে বন্ধু সুনন্দের দিকে তাকালেন। তাঁর অন্তর হাহাকার করে উঠল। মনে হল, কারা যেন শাসনের চাবুক উঁচিয়ে তাঁকে চিরদিনের জন্য বোবা করে দিয়েছে। এইমাত্র যে নাটক অভিনীত হয়ে গেল, বলরাম ছাড়া ব্রজে আর একমাত্র প্রাণী নন্দই জানেন সে নাটিকাটির মহড়া হয়েছে নেপথ্যে। জানেন, গর্গ ও বসুদেব কিভাবে কৃষ্ণকে তৈরী করছেন। জানেন, কৃষ্ণই মথুরাপতি হিসেবে দেবতাদের দ্বারা মনোনীত। অথচ এই নেপথ্য রাজনীতির কথা কারোকে মুখ ফুটে বলার উপায় নেই তাঁর। গোপরাজ নন্দ আজ অদৃশ্য বন্ধনে বাঁধা পড়েছেন। ব্রজের ওপর আধিপত্য নষ্ট হতে চলল তাঁর। তিনি এখন গর্গ ও বসুদেবের আজ্ঞাবাহক মাত্র। হয়ত বা এরপর কৃষ্ণই সেই প্রভুত্বের আসন দখল করবে।

সুনন্দ নন্দের দুই হাত ধরে আবার বললে—আমাদের ওপর রাগ কি তোমার পড়েনি, ভাই? বিশ্বাস করো, আমরা কৃষ্ণকে আমাদের নিজের ছেলেপুলের মতই দেখতাম।

নন্দ আর সামলাতে পারলেন না নিজেকে। ঝর ঝর করে তাঁর দুই গাল বেয়ে লবণাক্ত অশ্রুর ধারা গড়িয়ে পড়ল। অশ্রুজড়িত কণ্ঠে বললেন,—সুনন্দ, ভাই আমার, আজ আমি পুত্রহীন হলাম!

সকলেই চমকে তাকালো।

সমস্বরে তারা বললে,—সে কী কথা, নন্দ!

সমবেত কণ্ঠের উদ্বেগে সচকিত হয়ে নন্দ নিজেকে সামলে নিলেন। চোখ মুছে হাসবার চেষ্টা করতে করতে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন,—তাই-ই তো, ভাই। কৃষ্ণ আজ সবার, সকলের।

—এ তো আনন্দের কথা!

—তাই, তাই তো সেই আনন্দেই কাঁদছি আমি।

—আমরা ভাগ্যবান!

—আশীর্বাদ করো তোমরা! কৃষ্ণের যেন কল্যাণ হয়!

—সে কী কথা! কৃষ্ণ যে স্বয়ং বালবেশী বিষ্ণু!

—তা হোক! তবু সে এই ব্রজেরই শিশু। পুত্র যত বড়ই হোক, তাকে যে বড় ভাবতে পারি না। সে আমার ছোট্ট গোপাল।

এইভাবে চলল বৃদ্ধদের আলাপ। ক্রমে নন্দ অনেকটা প্রকৃতিস্থ হয়ে এলেন। বললেন,—মনে আছে তো ব্রজের স্বার্থে সবকিছু গোপন রাখবে তোমরা।

প্রস্থান করতে করতে সকলেই বললেন,—তুমি নিশ্চিন্ত থাকো নন্দ। ব্রজের স্বার্থ, আমাদেরও স্বার্থ।

১১

নন্দ ঘোষের থেকে বুদ্ধি কিছু কম নয় সুনন্দর। গাঁয়ে ফিরে সকলকে বোঝালো সুনন্দ।

কৃষ্ণ সম্পর্কে গোকুলের ঘরে ঘরে সে বার্তা পৌঁছে গেল। তাতে সেরাত্রেই কৃষ্ণ হলেন, ব্রজেশ্বর গোবিন্দ। গিরিধারী গোপাল। সকলে জানলো, এক অলৌকিক ক্ষমতা নিয়ে গোকুলে আবির্ভূত হয়েছেন স্বয়ং পুরুষোত্তম। তিনি কে, এ প্রশ্ন বাতিল। তবে ব্রজবাসীরা জানুক, যশোদার-ক্রোড়-লালিত হলেও কৃষ্ণ যথার্থ নন্দপুত্র নন। নন্দালয়ে পদার্পণ করে তিনি গোকুলকে ধন্য করেছেন। তিনি আবালবৃদ্ধবনিতার আরাধ্য। সকলেই তাঁকে মান্য করুক, কৃষ্ণের নির্দেশই পালিত হোক। তাতেই ব্রজবাসীর মঙ্গল। এর বেশি কেউ যেন কোনো প্রশ্ন না করে। এ নিয়ে কেউ যেন আর তর্ক না তোলে।

তর্কে অবশ্য ব্রজবাসীদেরও বিশেষ আসক্তি নেই। ঘটনার প্রতিক্রিয়া ধেনুসর্বস্ব জীবনে ক্ষণস্থায়ী উত্তেজনা মাত্র। স্মৃতিও তাদের মনের পরিষ্কার পিচ্ছিল পথে অতি সহজেই হারিয়ে যায়। বর্তমানের সুখ দুঃখেই তারা বাঁচে। পার্বণ আর উৎসবের মধ্যে যতটুকু পারে, বর্তমানকে চেটেপুটে উপভোগ করে নিতে চায়। অতীতকে যেমন ধরে রাখতে পারে না, ভবিষ্যৎ নিয়েও তেমনি তাদের কৌতূহল নেই। গোপজীবনে আত্মীয় বিয়োগ বেশিক্ষণ দাগ কাটে না, আবার শত্রুতাও ক্ষণস্থায়ী।

এমন এক মানবগোষ্ঠীর মধ্যে আধিপত্য বিস্তারে সময় ও শক্তির দরকার করে না। প্রচারই সব। প্রচারের ফলে কৃষ্ণ রাতারাতি একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে বসলেন।

গোপযুবাদের একত্রিত করে কৃষ্ণ ও বলরামের ব্যায়াম চর্চার আখড়া জমে উঠল। চলল অস্ত্র ও মল্ল যুদ্ধের মহড়া। গোবর্ধনের সানুদেশে একটি নির্জন আখড়ায় মাঝে মধ্যেই দু একজন অদ্ভুত দর্শন অপরিচিত পুরুষের আগমন ঘটতে লাগল যাঁরা কৃষ্ণের গোপবাহিনীকে নানা ধরনের কসরৎ শিখিয়ে যান।

শান্দর কাছে কৃষ্ণ ও বলরাম শেখেন নিরস্ত্র অবস্থায় শত্রুর মুখোমুখি যুদ্ধ করার কৌশল। কেবলমাত্র বিদ্যুৎগতিতে হস্ত চালনার দ্বারা একই সঙ্গে একাধিক শত্রুকে কিভাবে পরাস্ত করা যায়, মাটি থেকে মানুষ কতদূর লাফ দিয়ে উঠতে পারে, লাফ দিয়ে সমস্ত শরীরের ভারসহ শত্রুর বুকে সজোরে নেমে এসে কেমন করে তার হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ করে দেওয়া যায়। দেহের কোন্ কোন জায়গায় কেবলমাত্র সজোরে চড় মেরেই হত্যা করা যায় বলশালী পুরুষকে— এই সব যুদ্ধবিদ্যা শিখিয়ে যান আগন্তুক সুঠামদেহী পীত বর্ণের নির্লোম পুরুষেরা। গাঁয়ের মানুষ ফিসফাস আলোচনায় বলে, দেবতারা আসেন ব্রজেশ্বরের আখড়ায় বাছাই করা ছেলেদের যুদ্ধ শেখাতে।

দলপতি কৃষ্ণের ঐ যোদ্ধবাহিনীকে ভয় করতে শিখেছে ব্রজবাসীরা। আবার তাদের জন্যই বহিশত্রুর আশঙ্কা থেকে পুরোপুরি নির্ভয়ও হয়েছে তারা। ব্রজবালারা কৃষ্ণের বলবীর্যে মুগ্ধ। কৃষ্ণের প্রণয় লাভের জন্য প্রকাশ্যে ও চুপিসাড়ে গোপকন্যাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার শেষ নেই। যারা নিতান্তই কৃষ্ণের অনুরাগ আকর্ষণে ব্যর্থ, তারা শ্রীকৃষ্ণসহচরদের সঙ্গে গা-মাখামাখি করে বেড়ায়। এ নিয়ে ঘরের পুরুষদের অনুযোগ করার সাহস নেই, কৃষ্ণ বাহিনীর বিরুদ্ধে কথা বলে না কেউ।

আখড়া থেকে ব্যায়াম সেরে বের হতে অধিকাংশ দিনই বিকেল গড়িয়ে যায় কৃষ্ণ বাহিনীর। ইদানীং কৃষ্ণের আখড়ায় যারা স্থান পায় নি এমন অমনোনীত ও দুর্বল কিশোর যুবারাই শুধু গোঠে গোঠে ধেনুযূথের তদারকি করে। ওদিকে দীর্ঘ দ্বিপ্রহর ও অপরাহ্নে কৃষ্ণ বলরাম তাদের শিক্ষণ শিবিরেই ব্যস্ত থাকে। মাঝে মধ্যে সশস্ত্র যুদ্ধেরও মহড়া চলে। চলে লুকোচুরির মাধ্যমে কৃত্রিম যুদ্ধের আয়োজন।[১]

এইভাবেই দেখতে দেখতে আশ্বিন মাস গড়িয়ে যায়। শারদীয় প্রভাতগুলি আরও মনোরম হয়ে ওঠে। গোপকন্যারা শীতের প্রাক্‌কালে দল বেঁধে পশুখাদ্য সংগ্রহে বের হয়। সারাদিন ঘাস ও গাছগাছালি জড় করে আঁটি বাঁধে। সন্ধ্যার আগে গোবর্ধনের পার্বত্য বনানী ছেড়ে পায়ে চলা সরু সরু পথ দিয়ে নেমে আসে। যায়গায় যায়গায় ঘুঁটের পাহাড় বানায়। ঘাসের বোঝা গাঁয়ে নিয়ে গিয়ে গাছের গায়ে ঘাঘরার মতো বেঁধে রাখে। শীতে যখন

গাছ পাতা শুকিয়ে যাবে, তখন ঐ সংগ্রহ থেকে পশুদের খাওয়াবে তারা। মেখে দেবে গুড়ের সঙ্গে শুকনো জাবনা।[২]

সারাদিন নানা কসরতের পর আখড়া ছেড়ে ছেলের দল গোবর্ধন পর্বতের নিচে এসে বসে। কেউ কেউ ঘাসের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে বিশ্রাম করে। সকলেই ঘিরে থাকে কৃষ্ণ ও বলরামকে। আর এই সময় মেয়েরা একে একে নেমে আসে মাথায় বোঝা নিয়ে। গোধূলির অস্তরাগে তাদের গায়ের রঙিন বক্ষ বন্ধনীগুলি উজ্জ্বল দেখায়।

বলরাম ব্যায়ামের শেষে শিষ্যদের নিয়ে সিদ্ধি ভাঙের আসর জমিয়ে বসে। দেবতাদের সভায় এই ভাং-কেই বলে সোমরস।

মেয়েদের দিকে ঢুলু ঢুলু চোখে তাকিয়ে বলরাম বাহিনী বলে,—ঐ আসছে সব কানুর গোপী মোহিনীরা। বলে হাসে। মেয়েমানুষের চেয়ে সিদ্ধি ভাঙেই তাদের বেশি আসক্তি।

কৃষ্ণের দল কিন্তু পরিমাণের অধিক রস খায় না। তারা ভিন্ন রসে মাতাল। মেয়েদের দেখে চোখ নাচিয়ে কাছে ডাকে। হাতছানি দিয়ে সুর করে গেয়ে ওঠে,—কৈ যাওত ব্রজবালা।

মেয়েরা নিজেদের মধ্যে ঢলাঢলি করে হাসে। এ ওকে ঠেলে দেয়। প্রত্যেকেরই মনের মানুষ আছে। তারা নিজেদের পুরুষের কাছে যায়। ছেলেরা মেয়েদের মাথার বোঝা নামিয়ে দিয়ে এক এক জন এক এক কন্যার কোমর জড়িয়ে ইতি উতি ছড়িয়ে বসে। তারপর চলে হাসাহাসি ঢলাঢলি মাখামাখি পর্ব।

মেয়েরা অনেকেই পেতে চায় কৃষ্ণের সোহাগ। এগিয়ে এসে তাকে নিয়ে টানাটানি শুরু করে। কৃষ্ণও যতদূর সম্ভব আদর করে ছেড়ে দেয়। তার চোখ খুঁজে বেড়ায় গৌরীকে কিন্তু সে মেয়ে বড় অভিমানিনী। অন্যদের মতো কৃষ্ণের আদর কাড়াতে আসে না উপযাচিকা হয়ে। গোবর্ধনের কোলে কোনো এক শৈল প্রাচীরের গায়ে ঠেস দিয়ে লুকিয়ে বসে থাকে। দূর থেকে শোনে লাস্যময়ী গোপীদের কলহাস্য। কান খাড়া থাকে কৃষ্ণের কণ্ঠস্বর শোনার জন্য। কাছেপিঠে চূর্ণ পত্রের ওপর শব্দ হলে মুখ ঘুরিয়ে বসে। বুকের মধ্যে শিরশির কাঁপন জাগে। কুঞ্চিত হয়ে ওঠে স্তনচূড়। ভাবে পিছন থেকে এসে কৃষ্ণ বুঝি হঠাৎ তাকে বাহুবন্ধনে বেঁধে এখনি জ্বালাতন শুরু করবে। আর কৃষ্ণ ভাবে, কোথা থেকে শেখে গৌরী এমন প্রণয়কলা!

কৃষ্ণের মনে হয় এমন মেয়ের প্রণয়কথাই একদিন সুর করে পড়ছিলেন গর্গের এক শিষ্য। শুধু সেই পদের সুর শুনলেই স্পষ্ট তার মানে বোঝা যায়।

পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে শঙ্কিত ভবদুপযানম্।

রচয়তি শয়নং, সচকিত নয়নং পশ্যতি তব পন্থানম্॥[৩]

কৃষ্ণ অবাক হয়ে ভাবে, আশ্চর্য, গর্গ-শিষ্য কি গৌরীকে দেখেছেন!

যে যেভাবে চায়, সে সেভাবেই পায়। গোরীর প্রতীক্ষা ব্যর্থ হয় না। খুঁজে খুঁজে কানু তার কাছে ঠিকই আসে। গোরীকে বুকের ওপর আছড়ে ফেলে বলে,—রোজ যদি এমনি করে পালিয়ে আসিস, একদিন তোকে আর খুঁজব না।

মুখ ভার করে ছল ছল চোখে গোরী বলে—সে আমি জানি।

—কী জানিস?

—একদিন তুই আর আসবি না।

কৃষ্ণ অভিমানিনীর ফুটফুটে মুখখানির দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর বর্ষা যেমন ঢেউতোলা মাটির বুক দেখে আর স্থির থাকতে পারে না, অঝোরে ঝরে পড়ে সহস্র ধারায়, কৃষ্ণও তেমনি গোরীর বসন সরিয়ে তার অনাবৃত দেহকুসুমে এঁকে দেয় অজস্র চুম্বন। গোরী কলকলিয়ে হাসে আর গুম গুম করে কৃষ্ণের পিঠে সোহাগধারা বর্ষণ করে বলে,—এই ছোড়্। এই কান্‌হ ছোড়্!

মুখ তুলে কানু বলে,—না ছোড়বি তুযা মিঠ্ঠবালা। ওরে মিষ্টি মেয়ে, তোকে আর ছাড়ব না।

গোরী বলে,—কাহে?

কৃষ্ণ বলে,—তু মেরা প্যাসকা পানী।

শুরু হয়ে যায় ওদের কথার খেলা। গোরীর চিৎ-করা দেহটার ওপর কৃষ্ণর অধরোষ্ঠ ঝুঁকে আসে। তর্জনী দিয়ে তার ওষ্ঠে মৃদু আঘাত করে গোরী বলে,—তু মেরা আঁখকা ফোর।

কৃষ্ণ তার নির্লোম গণ্ডদেশ গোরীর ঠোঁটের ওপর পেতে দিয়ে জানতে চায়, সে কি চোখের জলের মতো নোন্‌তা। কই গোরী একবার জিভ ঠেকিয়েই দেখুক না

গোরী জিভ ঠেকিয়ে দুষ্টু হাসে। বলে,—ঈ! বহুত্ লোনা।

আখড়ায় সারাদিন কসরৎ করে কৃষ্ণের সর্বাঙ্গ এখন স্বেদসিক্ত, তাই বস্তুতই তা লবণাক্ত। তার শরীর থেকে একটা মাটি মাটি সোঁদা বাস বের হয় যা গোরাকে মোহিত করে। তার দুই চোখ বুজে আসে।

কৃষ্ণ আবার কথার খেলায় ফিরে যায়, বলে,—তু মেরা সুখ !

অমনি গোরী উত্তর দেয়,—তু মেরা দুখকো সায়র, কানু।

কৃষ্ণ অবাক। সে তার দুঃখ !

গোরী বলে, হ্যাঁ সে তো তাই-ই। দিনরাত কানু তাকে দুঃখই দেয়। এই দুঃখ যেদিন আর সইতে পারবে না, সেদিন যমুনায় ঝাঁপ দেবে সে।

শুনে কৃষ্ণ তাকে দুই হাতে তুলে নিয়ে বলে, যমুনায় ঝাঁপ দিলে কৃষ্ণ তাকে ডুব সাঁতার দিয়ে এমনি ভাবে তুলে আনবে। কৃষ্ণের দেহের ঘাম গোরীর গায়ে মাখামখি হয়ে যায়। সে তার গাল চেপে ধরে কৃষ্ণের বুকে। দুহাতে মালা করে কৃষ্ণের গলা জড়ায়।

এভাবেই শৈল প্রাচীরের আড়াল থেকে কৃষ্ণ বেরিয়ে আসে।

গোবর্ধনের ওপাশে সূর্য গড়িয়ে গেছে। এপাশে নেমেছে অন্ধকার। এবার গাঁয়ে ফিরতে হবে। কৃষ্ণ বড় হিসেবী প্রেমিক।

গোরীকে নামিয়ে দিলে মাথার বোঝা তুলে নিয়ে স্ফুরিত অধরে সে বলে, রোজই সে আলো থাকতে থাকতে কাজ সেরে সবার আগে নেমে আসে। ভাবে, কানুও আসবে আখড়া ছেড়ে। কিন্তু কানাই বড় দেরি করে। আগামী কাল কি সে আরও একটু আগে আসতে পারে না।

কৃষ্ণ আশ্বস্ত স্বরে বলে,—ঘরকে যা গোরী ! কাল আসব।

গোরী খুশি হয়। সজল চোখে হাসে। ফিরে তাকায়। ধীরে ধীরে প্রান্তরের আবছায়ায় অদৃশ্য হয়ে যায় এরপর।

নির্জন প্রান্তরে একাকী দাঁড়িয়ে থাকে কৃষ্ণ। বুক ঠেলে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। গোরী একদিন তার জীবন থেকে এভাবেই হারিয়ে যাবে আর অনেক বড় একটা কর্মের জগতে প্রবেশ করতে হবে কৃষ্ণকে। এই মুহূর্তে কৃষ্ণ ভেবে পায় না, কোনটা তার পক্ষে বস্তুত প্রার্থিত। গোরীর ঐ ছোট্ট মধুমাখা প্রেমময় বক্ষচূড়, না সামনের এই অসীম অখণ্ড দিকচিহ্নহীন পথ। এ পথের শেষ কোথায় ? কী আছে এই মোহময় পথের প্রান্ত সীমায় ?

কার্তিকে রাস হয়।

পরিষ্কার নক্ষত্রখচিত আকাশে যখন পূর্ণ চন্দ্রের আবির্ভাব নীল নভোমণ্ডলকে চন্দনলিপ্ত করে, ব্রজের খানা ডোবা সরসীতে ফুটে ওঠে কুন্দ কুসুম শ্বেতোৎপল, তখন সেই কৌমুদী রাতের দ্বিতীয় প্রহরে শুরু হয় রাসোৎসব। সে রাতে ব্রজ-

বাসীরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে উন্মুক্ত প্রান্তরে। চলে রাতভোর নাচ গান সোমপান আর রতিবিলাস। ঘরে ঘরে দীপাবলীর সজ্জা হয়। গান গাইতে গাইতে মেয়েরা যখন দেহলি প্রান্তে দীপাধার সাজায়, তখন তাদের আনত অঙ্গের ভারে বুকের বসন খসে পড়ে। রাসের গান বাঁধেন গোকুলের রসিক কবিয়ালেরা।। এবার গান বাঁধা হয়েছে প্রধানত নন্দকিশোর গোপাল কৃষ্ণকে নিয়ে। এবছর কৃষ্ণই রাসের মধ্যমণি। শুধু গোপরাজ নন্দের আদরের পুত্ বলেই নয়, কৃষ্ণের এখন শতনাম। সে-ই গোপেশ্বর, সে-ই ব্রজেশ্বর, সে-ই হয়েছে গোবিন্দ গিরিধারী।

সন্ধ্যায় রাসযাত্রার মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান হয় নন্দালয়ে। ঘট বসে সিংহদ্বারের ওপাশে। যশোদা রোহিণী দুজনেই দুই ঘটে নারকেল আর কদলীকাণ্ড সাজিয়ে দেন। শশি মঙ্গলা মধুমতীরা মিলে আলিম্পন আঁকে ঘরে ঘরে।

গোপ বালকেরা পথে পথে বাঁশি বাজিয়ে ঘোরে এবং গোপীকাদের দেখা পেলে রসালাপ করে বলে,—রাতের রাসে তুই আমার রাধা হবি। চোখ ঘুরিয়ে কোপ দেখিয়ে মেয়েরা বলে,—আয় না তোকে গোবরে চান করাই! শুনে ছেলেরা হাসতে হাসতে এগিয়ে যায়। গোময় তাদের প্রিয় অঙ্গরাগ। রাগের কথা নয়। তবে কাঁচা গোবর মাখে না গোপীরা। শুকনো করীষ চূর্ণ গায়ে মাখে সুতরাং গোময়ে স্নান করানোর অর্থ ইঙ্গিতে প্রশ্রয় দান। এভাবেই চলে উৎসবের প্রস্তাবনা। ঘরে ঘরে পেস্তা ক্ষীর দিয়ে সিদ্ধি ভাং তৈরী হয়।

গোধূলির ধুলো মেখে গোপাল ও ধেনুর দল ঘরে ফিরলে নন্দালয়ে কথকতার আসর সাজিয়ে পুরোহিত শ্রীধর রাসযাত্রার ব্যাখ্যা করে বলেন :

"অন্যোন্যব্যতিষক্ত হস্তানাং স্ত্রীপুংসা'
গায়তাং মণ্ডলীরূপেণ ভ্রমতাং
নৃত্য বিনোদো রাসো নাম।"

বলেন,—গীত আর নৃত্য, এই নিয়েই রাস। গোপা গোপালরা নাচবে গাইবে। মনে দেবে মন, দেহে নেবে দেহ এমনি করেই হবে মিলন। গোপালরা তাদের রাধা খুঁজে নেবে। সেই রাধাকে নিয়ে যাবে যমুনার কূলে, সরসীর কিনারে। তারপর মিলে-মিশে হবে একাকার। পরে স্নান করে পবিত্র হয়ে ফিরবে ভোরের বেলা। মধু যামিনীর এই মিলনই হবে সারা জীবনের বন্ধন।

অধিকাংশ গোপালেরই রাধা ঠিক করা আছে শৈশব থেকে। জন্মের পরে গোপগোপীদের মায়েরা বাগদান করে ছেলের জন্য মেয়ে আর মেয়ের জন্য ছেলে

ঠিক করে রাখেন। সেই মেয়ে নব বর্ষের রাসোৎসবে সেই ছেলের রাধা হয়। আরাধনা থেকেই রাধার উৎপত্তি। বাগদানের পর থেকে কন্যা সেই ছেলের আরাধনা করবে মনে মনে। তাই সে হবে বাগদত্ত কিশোরের রাধিকা। যাদের এমনভাবে জন্মের পরই রাধা মনোনীত হয়নি, রাসের দিন তারা নিজেরাই তাদের রাধাকে সংগ্রহ করবে নৃত্যগীতের আসর থেকে।[৪]

মুস্কিল হয়েছে কৃষ্ণ ও বলরামকে নিয়ে। এদের কারোই রাধা মনোনীত নেই। গোপরাজপুত্রের রাধা অমন বেহিসেবীভাবে মনোনীত করলেই তো হয় না। হিসেব করে মেয়ে তুলতে হয় ঘরে। নন্দর হিসেব মেলেনি। যেদিন তিনি শুনেছেন, কৃষ্ণ ও বলরাম, এ দুটির কোনটিই গোপকুলের সন্তান নয়, সেদিন থেকে গোপিনীদের মধ্য থেকে রাধা সংগ্রহের বাসনাও ত্যাগ করেছেন। কিন্তু সেই গোপন ব্যথা তাঁর অন্তরেই গুপ্ত আছে। যশোদাকে বলেছেন,—কারুকে যেন কথা দিয়ে বোসো না। রাম আর কৃষ্ণ আমাদের কুলের ছেলেদের মতো নয়। ওরা অন্য রকম। শেষে হয়ত তোমার আমার কথা টিকবে না। তখন ব্রজের মানুষকে আমরা মুখ দেখাব কেমন করে।

যশোদা চোখে জল ছাপিয়ে মুখ ভার করে বলেছেন,—তুমিই কেবল ওদের অন্য রকম দেখ। আমি তো পাঁচটার মধ্যে একটা ছাড়া আর কিছু বুঝি না।

নন্দ এ কথায় হাসেন,—তাই কি যশো? ভেবে দেখ তো কৃষ্ণকে নিয়ে কী হৈ চৈটাই না তুমি করো। কৃষ্ণ হাঁটলে অবাক, হাসলে অবাক, ধেনু চরালে অবাক, এমন কি চুরি করে ননী খেলেও তুমি আর তোমার সখিরা গালে হাত দিয়ে বলতে, অতটুকু ছেলের কী আশ্চর্য্যি দস্যিপনা। ভাবতে, তোমার কানুর তুলনা নেই জগতে। তা আমি অন্য চোখে দেখি, না তোমরা দেখ?

কথায় তো নন্দের কাছে হারতেই হয়। নন্দরাণীর জিত হয় শুধু হাপুস নয়নে কাঁদলে। নন্দ তখন আর যুক্তির সুতো ধরে যশোদাকে কিছু মানিয়ে নেওয়াতে যান না, যশোর বাঞ্ছাই পূরণ করেন। কিন্তু এই একটা ব্যাপারে তিনি পাথরের বাড়া শক্ত। কেঁদে ভাসিয়েও যশোদা কোনো উপায় করতে পারেন নি।

বছর ঘুরে রাস এসে পড়লে মলিন বিষণ্ণ মুখে যশোদা এসে নন্দর পাশে বসেন। কোনো রকম ভূমিকা না করেই বলেন,—কানুর জন্যে আমি রাধা ঠিক করেছি, তুমি আর বাধ সেধো না।

চমকে উঠে নন্দ তাকান,—সে কী, কাকে?

—গৌরীকে।

—গৌরী আবার কে?

—ন্যাকা! গৌরী তোমার বন্ধু সুনন্দর মাইয়া।

—অ হ, সুনন্দর সেই মেয়েটা। তাই দেখি, মেয়েটা তোমার বড় নেওটা হয়েছে।

সুগৌর মাংসল মুখখানি হাসিতে শ্বেতপদ্মের মতো বিকশিত হয়। যশোদা খুশি হয়ে বলেন,—হবে না, অত সুন্দর মেয়ে তুমি আর আর একখানা বার কর তো দেখি।

নন্দ বললেন,—কাজটা ঠিক হবে না, এ আমি তোমাকে আগেই বলে রেখেছি। সুনন্দর ঘরে কথা পাঠাও নি তো?

—পাঠিয়েছি। যশোদা নিজের দাবি প্রতিষ্ঠিত করতে চান।

নন্দ অপ্রত্যাশিত ভাবে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন,—তোমার যা খুশি তাই করো। আমি এখনই তত্ত্ব পাঠাচ্ছি। বলে পাঠাচ্ছি, এই বিষয়ে আমার মতামত নেই।

নন্দ প্রস্থান করার জন্য উঠে দাঁড়ান। যশোদা তাড়াতাড়ি নন্দর কাপড় টেনে ধরেন—যাও কোথায়? কানু নিজেই যে গৌরীকে পছন্দ করে। শ্রীদাম সুদামরা বলেছে। বলাইও বলেছে।

নন্দ থমকে দাঁড়ান। খুশিতে তাঁর মন ক্ষণেকের জন্য হালকা হয়েই ভারি হয়ে আসে। ভাবেন, কৃষ্ণের এই পছন্দ অপছন্দেরই বা মূল্য কি? বসুদেব, গর্গ, দেবতারা তাকে যখন মথুরায় নিয়ে যাবেন তখন কি আর সঙ্গে গোয়ালিনী গৌরীর স্থান হবে। না, না এ অতি অন্যায়।

নন্দ বলেন,—কানুর এ বিষয়ে আর কি বুদ্ধি। এ বয়সে যে কোনো মেয়েতেই মন ধরে যায়। না, এ হতে পারে না, কখনো হবেও না।

নন্দ বেরিয়ে গেলে মুখ ভার করে পা ছড়িয়ে বসে থাকেন যশোদা। রাসোৎসবের জন্য আয়োজনের ঝক্কি ঝামেলায় তাঁর মন বসে না। স্বামীর এসব কাজের অর্থ বুঝতে না পেরে নিজেকে বড অসহায় মনে হয়। মেয়েরা এসে জিগেস পড়া করলে ঝামরে উঠে বলেন,—আমাকে পুছতে আসিস কেন? আমি কে! যা, রোহিণীকে পুছকর যো খুশি সো কর!

মেয়েরা গালে হাত দিয়ে ফিসফাস করে। ক্ষণে ক্ষণে নন্দরাণীর আজকাল মান হয় লো! হাসাহাসি করে বলে,—রাসে এবার নন্দরাণীই হবে নন্দের

মানিনী রাধা! কেউ বা ঠোঁট উলেট উষ্মা প্রকাশ করে বলে, আহা! সেই বয়স আর আছে নাকি? গতর হয়েছে ভাঁড়ারের জালা।

এক সময় সুনন্দর ঘরনী আসে আয়োজনের তত্ত্ব-তল্লাসী করতে।

যশোদাকে উদাসী চোখে বসে থাকতে দেখে কাছে আসে। বলে—কি লো সই! রাসের মহড়া দিচ্ছিস নাকি? তা তোর আবার দুখ কিসের? পতি-সোহাগীর কি নতুন করে চন্দ্রাবলী জুটল নাকি?

এই বয়সেও কথায় কথায় ঠোঁট ফোলায় যশোদা। দেহ ভারি হলে কি হবে মুখখান এখনও কচিপানা। অভিমানে নাকের পাটা কাঁপে। ঘটনা বলে নন্দর ওপর শত দোষ চাপিয়ে। যশোদার আবার পেটে কথা থাকে না কখনো।

শুনে সুনন্দজায়া জাহ্নবী ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ান। সঙ্গের সখী মাধবী ঘটনার সব গুরুত্ব উড়িয়ে দিয়ে দুজনার মনোমত পরামর্শ দেয়।

রাসে রাধা নির্বাচনের ব্যাপার নিয়ে কাজের মানুষ পুরুষদের সঙ্গে কি কথা বলতে আছে। সংসারের জোয়াল কাঁধে চাপলে তারা নিজেদের যৌবনের কথাও ভুলে যায়। তার চেয়ে গোরীকে বরং যশোদা নিজের হাতে সাজিয়ে দিক। যশোদা সাজালে কানুর নিশ্চয়ই মনে ধরবে।

কানুর মন কানুই জানে, মাধবীর কথা কিন্তু দুই অবুঝ সখীরই মনে ধরে। জাহ্নবী নিজের ঘরের কাজে যান। মাধবী গোরীকে আনতে ছোটে।

এবারের রাস বড় চমৎকার। কৃষ্ণ অনুরাগী গোপকিশোররা সকলেই অবিকল কৃষ্ণের মতো সেজেছে। সর্বাঙ্গে নীল রঙ মেখেছে। মাথায় পরেছে ময়ূর পেখম-গোঁজা পুষ্প মুকুট। পরনে পীতবাস। কটিতে নীল মেখলা। মুখে চন্দনের ফোঁটা আর গলায় মরশুমী ফুলের মালা। হাতে লাল নীল সুতোর ঝুমকো ঝোলানো বাঁশি। হঠাৎ করে আসল কৃষ্ণকে চেনাই মুশকিল। ফলে বড় মজা হয়েছে, রাধারা আপনাপন কৃষ্ণকে খুঁজে নিতে পারছে না। মাথার ওপর শুধু চাঁদের আলো। রাসমণ্ডপে আলো জ্বালা হয় না।

মশাল থাকে দূরে। বৃদ্ধরা সে-ই আলোক-সজ্জিত মণ্ডলে বসে সিদ্ধি পান করে আর রসালাপের বন্যা বহায়। নাচ গানের সঙ্গতি নেই যাদের শরীর মনে, তারাই গোল হয়ে বসে। বড়দের এই মজলিসেও ঢলাঢলি চলে।

মেয়েদের হয়রানি করে দলবদ্ধ কৃষ্ণেরা হাসে। মেয়েরা বিভিন্ন বিভঙ্গ প্রদর্শন করে নাচে। রাত বাড়তে থাকলেও নেশা জমে উঠলে বসন ভূষণের ভার স্খলিত হয়ে পড়ে। তা নিয়ে খেয়াল করে না কেউ। আজ ভোগ ও উপভোগের রাত।

কৃষ্ণকে আড়াল করে নকল কৃষ্ণরা রাস মণ্ডলে নৃত্যের বোল তুলেছে।

রাধার দল গোরীকে মণ্ডলের মাঝে ঠেলে দিয়ে কলকলিয়ে হেসে বলছে, —বোল্ রাধা, তুহার কান্হাইয়া কাঁহা।

এ যেন চোখ বেঁধে কানামাছি খেলা। কেননা সম্পূর্ণ মণ্ডলটি নেচে নেচে আপন বৃত্তে ঘুরছে। তার মধ্য থেকেই খুঁজে নিতে হবে গোরীকে তার কানু।

সরমে রাঙা, নেশায় ঢুলুঢুলু গোরী নৃত্যরত প্রত্যেক নীলবরণ গোপ-কিশোরের কাছে গিয়ে ফিরে আসে তারপর অভিমানে কাঁদো কাঁদো গলায় গান ধরে:

কাঁহা ছুপে রহো শ্যাম, মেরে তো আর কোই নই
তোহর পরাণ কঠিন হয়ল মোর পরাণ মুরছোই॥

সঙ্গে সঙ্গে গোরীর সখীরা, যে গানে গোরীকে বিব্রত করে, সেই গানটির কলি স্বর করে গেয়ে ওঠে:

মেরে তো গিরিধারী গোপাল, দুসরা ন কোই
যাঁকো শিরে ময়ূর মুকুট মেরে পতি সোই॥[৫]

গানের সঙ্গে নাচের তাল বাড়ে। রাধা নিয়ে কাড়াকাড়ি করে ছেলেরা, আর সেই ফাঁকে কৃষ্ণ টুক করে মণ্ডল ছেড়ে বেরিয়ে এসে গোরীকে পাঁজা-কোলা করে তুলে নিয়ে যায়।

পেছনে মত্ত নেশাড়ু হাসির ধুম পড়ে, করতালি বাজতে থাকে।

বয়স্করা দূর থেকে সেদিকে তাকিয়ে বলেন, খাসা জমেছে এবার। নেশা-বিজড়িত কণ্ঠে তাঁদের মধ্যে অতীত স্মৃতির রোমন্থন শুরু হয়। রাত গড়ায় এমনি ভাবে।

স্নান পর্বের আগে গান পর্ব।

যমুনার জলে আজ আকাশের চাঁদ এসে গা ধুয়ে গেছে। জলের রঙ তাই জায়গায় জায়গায় পাকা সোনার মতো। নীল বরণ জল স্বর্ণালী স্রোতে তির তির

করে কাঁপছে। স্বচ্ছ জলের তলায় মাছেরা নির্ভয়ে ছুটোপাটি করে। যমুনার তটভূমিতে বহু গোপ-পরিবার জড় হয়ে গান গাইতে গাইতে পত্রনৌকা ভাসিয়ে দিচ্ছে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বেলে। আর ভেসে পড়েছে ছোট ছোট রঙিন ডিঙি। যুবা কিশোরেরা রাধাদের নিয়ে শেষ রাতে নৌকাবিলাস করবে।

এমনি একটি নৌকায় গোরীকে তুলে নিয়ে কৃষ্ণ ভেসে পড়ে। তীরভূমি থেকে যশোদা গলা চড়িয়ে বলেন—বেশিদূর যাস না, কানু। হুঁশিয়ার সে রহনা!

কিন্তু হুঁশিয়ারী সত্ত্বেও মন মানে না। দূর থেকে তার নৌকার ওপর নজর রাখার জন্য অপেক্ষাকৃত হুঁশিয়ার সাঁতারু মাঝিদের সঙ্গে কয়েকটি গোপিনীকে তুলে নজরদারিতে পাঠালেন যশোদা। রাসের রাতে কিছু কিছু বিপদাপদ ঘটে। যশোদা তাই তীর ঘাটেই বসে থাকেন।

ওদিকে কৃষ্ণের নৌকা দুলতে থাকে। কানহাইর দৌরাত্ম্যে গোরীর সযত্ন সজ্জিত বসনভূষণ বিস্রস্ত হয়ে খসে পড়ে। দুই করতল জোড়া করে সুখবিভোর চোখে কৃত্রিম অনিচ্ছা প্রকাশ করে গোরী বলে,—তুয়া পরশনে মোর টুটল সবহুঁ বসন! বলে: বসন সবই ছিঁড়ে দিলে, এখন আমার লাজ ঢেকে দাও তোমার দেহের আড়াল দিয়ে!

এমন রজনী জীবনে একবারই আসে, আর তা আসে ঐ ব্রজপুরে। সেখানে মানুষগুলির চাহিদা কম। নির্মল আকাশ কোনো আবরণে দেহ ঢাকে না। জ্যোৎস্নার চাঁদ যাই যাই করেও যেতে পারে না, কেননা সরল প্রকৃতিলালিত মানুষের অঙ্গরাগ পূর্ণচন্দ্রের বড় প্রিয়। তাই সে তাদের গায়ে গায়ে লেগে থাকতে চায়। বনাঞ্চল থেকে ভেসে আসে কদম্ব কৌমুদির সৌরভ।

১২

বয়সের তুলনায় কৃষ্ণ বলরামের চেহারা এমনিতেই বাড়ন্ত, তার ওপর ব্যায়াম চর্চার ফলে তারুণ্যের সঙ্গে সঙ্গে দুই ভাই ব্রজপুরে দুই লৌহ-পুরুষ হয়ে উঠেছে। আরও লোভনীয় হয়েছে তারা ব্রজনারীদের চোখে। পেশল শরীর অথচ কোমল বরাঙ্গ যুবতী। মল্লে ও রণকৌশলে সর্বাগ্রবর্তী, আবার প্রণয়ে পরমোদে নিপুণ শিল্পী। কেবলমাত্র মোড়লপুত্র বলেই নয়; বুদ্ধি. বলে ও কৌশলে রামকৃষ্ণের হাতে অনায়াসেই ব্রজের নেতৃত্ব চলে আসে। আর তাদের এই খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে ব্রজের সীমানা ছেড়ে আশপাশের মুলুকে।

সম্প্রতি কৃষ্ণখ্যাতি প্রচারিত হওয়ার পর পর কয়েকটি কারণ ঘটে গেল।

ইতিপূর্বে মল্লবীরপূর্ণ যাবাবর গোপ সম্প্রদায়ের ওপর মাঝে মধ্যে ত্রাসের বন্যা বহিয়ে দিয়ে যেত মথুরার দুষ্ট সান্ত্রী সেপাইরা। এ ছিল এক ধরনের প্রশাসনিক উপায়। পাছে কোনো সম্প্রদায় বলশালী হয়ে ওঠে, এজন্য বলবিত্তের খবর পেলে রাজবাহিনী এক একটি জনপদে গিয়ে অকারণে বিভীষিকার রাজত্ব সৃষ্টি করে যেত, যেন ভয়ে ও সন্ত্রাসে কেউ কোথাও মাথা তুলতে না পারে। সর্বত্রই যা হয়, এসব কাজ শান্তি রক্ষকরাই করে। রাজার দরবার পর্যন্ত সে সংবাদ সব সময় পৌছয় না। তাই রাজাকে তাঁর প্রাপ্য কর দেওয়া ছাড়াও প্রজাসাধারণকে রাজ সেপাই ও ক্ষমতাশালী রাজকর্মচারীদের ঘুষ ও নানা উপঢৌকন দিয়ে তুষ্ট রাখতে হয়। রাজকর্মচারীর মনে ধরলে গ্রামের সুন্দরী মেয়েদের পাঠাতে হয় ক্ষমতাবানের প্রমোদ গৃহে।

কিন্তু কৃষ্ণ বলরামর পরিণত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গোপপুরে হামলাকারী কয়েকজন রাজপুরুষ আক্রান্ত ও নিহত হলেন। প্রথম দুএকটি ঘটনায় রাজা কংস কান দেন নি। কিন্তু সম্প্রতি তাঁর কাছের মানুষ কয়েকজনের হত্যা সংবাদ শুনে ভারি চিন্তিত হয়ে উঠেছেন কংস। তদন্তকারী চর পাঠিয়েছেন তিনি গোকুলে। হুকুম, নন্দের এই দুঃসাহসের পেছনে কোন্ শক্তি কাজ করছে তার সংবাদ চাই। গুপ্তচরবাহিনীর নেতাকে ডেকে ধমক দিয়ে বলেছেন, আজকাল কি কেবল

রাজকোষের অর্থের শ্রাদ্ধ করছ আর বসে বসে মোটা হচ্ছ সব? ব্রজপুরে পর পর কয়েকজন যাদব নিহত হলেন। আমাকে তার বিস্তারিত সংবাদ জানানো হয়নি কেন?

গুপ্তচর বাহিনীর নেতা সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন নি।

এই ব্যাপারটি কংসের সন্দেহকে আরও বেশি উদ্রিক্ত করেছে।[১]

সৈন্য শিবিরে, লোকপালদের মধ্যে, শান্তিরক্ষক বাহিনীতে, চরমণ্ডলী ও মন্ত্রীমণ্ডলীর সদস্যদের মধ্যে, সর্বত্রই কংস কেমন একটা গা ছাড়া ভাব লক্ষ্য করছেন। তাঁদের দিকে তাকালে মনে হয়, রাজার আশপাশে এই সব রাজ-পুরুষরা যেন নিষ্প্রাণ প্রস্তরমূর্তির মতো কেবলমাত্র শোভাবর্ধন করার জন্যই উপস্থিত। কর্তব্যকর্মে এদের কিছুমাত্র আগ্রহ নেই। কংসের রক্তচক্ষুকেও এরা যেন ঠিক আগের মতো সমীহ করে চলেন না। আদেশ শোনেন নতনেত্রে, বিনা প্রতিবাদে। সে আদেশ পালিত হয় যান্ত্রিকভাবে। উৎসাহের অভাব, আগ্রহের ক্রমাবনতি রাজকার্যে সার্বিক শৈথিল্য সৃষ্টি করছে। মন্ত্রণা সভা একটি যাদুঘরের তুল্য নিষ্প্রাণ। কংস কারো সঙ্গেই আত্মীতার টান অনুভব করতে পারেন না। আর এই বৈলক্ষণ্য তাঁর রাতের ঘুম কেড়ে নেয়। মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া সুহৃৎ হিসেবে রাজা তাঁর আশেপাশে মানুষ খুঁজে পান না। কিন্তু যাঁরা কংসের ভক্ত, রাজকার্যে তাঁরা যথেষ্ট ক্ষমতার অধিকারী নন। অবস্থা এমনই যে প্রতিষ্ঠিত পদাধিকারী পুরুষদের স্থানচ্যুত করে কংস নিম্নপদস্থকে দায়িত্বভার অর্পণ করতেও ভরসা পাচ্ছেন না। তাঁর আশঙ্কা, এর ফলে অবস্থা একেবারেই আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে। এ ঘটনার সূত্রপাত তাঁর সেই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর থেকে ধীরে ধীরে দানা বেঁধে উঠেছে।

কেবলমাত্র উগ্রসেনের হাত থেকে ক্ষমতা গ্রহণে হয়ত রাজপুরুষদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হত না, কারণ কংস রাজ্যের ভার নিলেও মথুরার কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তি পদচ্যুত হন নি। অসন্তোষ ও বিভেদের জন্ম হয়েছে শূরসেনের সঙ্গে দেবলোক হিমালয়ের রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করায় এবং জরাসন্ধজোটে কংসের যোগদানে।

মগধাধিপতি জরাসন্ধ গঙ্গাবিধৌত ভারতবর্ষে প্রবলপ্রতাপ রাজচক্রবর্তী। ঘোষণা করেছেন তিনি, এক প্রাণ একতার মন্ত্র। আর্যাবর্তের বিভিন্ন ভূম্যধিকারী ও রাজন্যবর্গের কাছে তাঁর মৈত্রীর বাণী প্রেরিত হল। জরাসন্ধের আহ্বান, এসো, একসূত্রে যুক্ত হও সবাই। আর্যাবর্তের সম্পদে হিমালয়ের দেব-পুরুষদের দাবি দৃঢ় কণ্ঠে অস্বীকার করো। কোন্ অধিকারে তাঁরা আর্যাবর্তের

পূজা উপঢৌকন (কর) আদায় করে যাচ্ছেন তাঁদের বশংবদ পুরোহিত সম্প্রদায়ের মাধ্যমে ? দেবতারা দেশজ নন, তাঁরা বহিরাগত। কোন্ অধিকারে তবে এই বহিরাগত দেবজাতি আর্যাবর্তের সম্পদ আকর্ষণ করে তাঁদের হিমাচলস্থ দেব-লোককে সমৃদ্ধির শীর্ষে সাজিয়ে তুলছেন ? কেন আমরা আর্যদের শ্রমার্জিত সম্পদ দেবতাদের বিলাসের উপকরণ হতে দেব ? তোমরা জোট বাঁধো, বন্ধ করে দাও এই অন্যায্য শোষণ !

জরাসন্ধ শুধু আবেদনই রাখলেন না, রাজচক্রবর্তীরূপে আদেশও প্রচার করলেন। জানিয়ে দেওয়া হল, আর্যাবর্তের মঙ্গলবিরোধী যে সব রাজা দেবতাদের শোষণ, প্রাধান্য মেনে দেবলোকের বশ্যতা স্বীকার করবে তারা আর্যাবর্তবাসী, বিশেষত জরাসন্ধের শত্রুরূপে গণ্য হবে। দেবতা বা সুরদের বিরোধী অসুর-গোষ্ঠীতে যারা যোগদানে অস্বীকৃত হবেন, জরাসন্ধের রাজসূয় যজ্ঞে তাঁদের রক্তে অসুর-সংহতির উৎসব হবে।

জরাসন্ধের আহ্বানে আর্যাবর্তের বিভিন্ন শক্তিশালী রাজন্যবর্গ দেবতা-বিরোধী অসুরজোটে আপনাপন শক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করতে লাগলেন। যাঁরা মানতে চাইলেন না মগধের আধিপত্য, তাঁরা বিধ্বস্ত ও বন্দী হতে লাগলেন। পালিয়ে গেলেন অনেকে দেবলোকের আশ্রয়ে। জরাসন্ধ হয়ে উঠলেন দেবতা ও তাঁদের সহায়তাকারী ব্রাহ্মণশ্রেণীর ত্রাসের কারণ।

জরাসন্ধের ভয়ে যেসব নৃপতি ও ভূম্যধিকারীরা অসুর-সংহতিতে সামিল হতে অনিচ্ছুক, তাঁরা পালিয়ে গেলেন দিগ্বিদিকে। পালিয়ে গেলেন দক্ষিণ পাঞ্চালের ভূপতিরা, পূর্বকোশলের ছোটখাটো রাজন্যবর্গ ; পলাতক হলেন অষ্টাদশ ভোজকুল, বোধ, পটচ্চর, সুস্থল, মুকুট্ট, কুলিন্দ, কুন্তি ও শালায়নবংশীয় নরপতিরা। মৎস্য এবং সন্ন্যস্তপাদের নৃপতিরা উত্তর দিক থেকে দক্ষিণে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। বন্দী হলেন দেবমিত্র রাজন্যবর্গ রাজচক্রবর্তী জরাসন্ধের কারাগারে।

ওদিকে জরাসন্ধের মিত্রপক্ষে যাঁরা যোগদান করলেন আর্যাবর্তে তাঁদের বীরত্বের খ্যাতি সর্বজনবিদিত। কুরু ও নরকদেশের শাসক ভগদত্ত একসময় ছিলেন কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের ভ্রাতা পাণ্ডুর বন্ধু। তিনি ছিলেন মহা পরাক্রান্ত নৃপতি। জরাসন্ধের মৈত্রীজোটে এই ভগদত্তই হলেন এক নম্বর মাননীয় সদস্য। পুরুজিৎ স্বয়ং দেবানুগত রাজা কুন্তিভোজের বংশধর। ইনি সম্পর্কে পাণ্ডবদের মামা। কিন্তু তিনিও মৈত্রীজোটের আহ্বানে সাড়া দিলেন। মহাবল পৌণ্ড্রক বঙ্গ পুণ্ড্র ও কিরাতেশ্বর। জরাসন্ধের যুক্তি আকর্ষণ করল তাঁকেও। পৌণ্ড্রক স্বাধীনচেতা

আত্মবিশ্বাসী নৃপতি। দেবতা ও ব্রাহ্মণদের অনভিপ্রেত শোষণ ও শাসনকে তিনি জরাসন্ধের মতই ঘৃণা করতেন। জরাসন্ধ তাই তাঁকে পেলেন বিশ্বস্ত বন্ধুরূপে। আর এক স্বনামধন্য পুরুষ ভীষ্মক। ভীষ্মক ছিলেন যদুদের আত্মীয়। বহু যুদ্ধে বিজয়াভিযানে তিনি তখন বিশ্রুতকীর্তি। ভীষ্মকও উপলব্ধি করলেন জরাসন্ধের যুক্তির সারবত্তা। ঘোষণা করলেন : না, আর্যাবর্তের শ্রমার্জিত সম্পদে হিমালয়বাসী দেবজাতির কোনো দাবি আমরা স্বীকার করি না। আর্যাবর্ত আর্যাবর্তের জন্যই। জরাসন্ধের হাত শক্ত করতে ভীষ্মকের মতো এগিয়ে এলেন করুষদেশের অধিপতি বক্র এবং দুর্ধর্ষ যোদ্ধা হংস ও ডিম্বক।

জরাসন্ধের মহাজোট হল দেবতাদের মহাভীতির কারণ। শুধু যে আর্যাবর্ত থেকে পূজা প্রণামী আদায়েই বিঘ্ন উপস্থিত তাই নয়, মহাজোটের শক্তি বৃদ্ধি দেবলোকের নিরাপত্তার পক্ষেও হানিকর। সেজন্যই ব্রহ্মার সভায় উচ্চকিত স্বরে দেবতারা বলেছিলেন, পৃথিবীর ভার বাড়ছে। সে ভার লাঘব করতে হবে। দেবমন্ত্রীর পরামর্শে দেবতা ও ব্রাহ্মণরা শুরু করেছিলেন রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র।

বর্তমানে কংস সেই ষড়যন্ত্রের অন্যতম শিকার। কেননা জরাসন্ধের দুই কন্যার পাণীগ্রহণ করে শূরসেনে তিনি দেবতা বিষ্ণুর প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছেন। রাজ্যদেশ ঘোষিত হয়েছে, বিষ্ণুকে আর এক কানাকড়িও নয়। শূরসেনে বিষ্ণুর সেবা বন্ধ করতে হবে।

সঙ্গে সঙ্গে ঢিল পড়ল মৌচাকে। বিষ্ণুকে সামনে রেখে যে ব্রাহ্মণ ও জননেতারা দুহাতে গুছিয়ে নিচ্ছিলেন, তাঁদের কায়েমী স্বার্থে আঘাত এলো। জোট বাঁধতে লাগলেন তাঁরাও। তবে দোর্দণ্ডপ্রতাপ কংস ও জরাসন্ধের ভয়ে চক্রান্ত শুরু হলো খুবই গোপনে। নিজের বাহুবীর্যে কংসের অটুট আস্থা। প্রথমদিকে নেপথ্য চক্রান্তকে বিশেষ আমল দেন নি। আজ সেই রাজনৈতিক অদূরদর্শিতাই তাঁর কাল হয়েছে। রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় হেরে যেতে বসেছেন বীরবাহু ভোজবংশবিবর্ধন রাজা কংস। অনুভব করছেন তাঁর ঘরে বাইরে শত্রুদের সক্রিয় অস্তিত্ব। আর দুশ্চিন্তায় দিন দিনই দুর্বল হয়ে পড়ছেন তিনি। বুঝতে পারছেন, রাজসভায় এখন যাঁরা তাঁর সভাসদ ও মন্ত্রী তাঁরা ছদ্মবেশী চক্রান্তকারী। উপযুক্ত মন্ত্রণাদাতা বলতে একমাত্র ভরসা অক্রূরের ওপর। কিন্তু তিনিও যথার্থ সন্দেহের ঊর্ধ্বে নন। অক্রূর প্রধানত নীরবই থাকেন ইদানীং। এমন কি বসুদেব প্রমুখ মাননীয় যাদব সদস্যরা যখন কংসনীতির সমালোচনা করেন তখনও তাঁকে তার প্রতিবাদ করতে দেখা যায় না।[২]

কংস যখন প্রতিবেশী রাজ্যে শূরসেনের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত, আভ্যন্তরীণ গোষ্ঠীবিবাদ কঠোরভাবে দমন করতে অনন্যমন, দেবক বসুদেবরা তখন কংসবিরোধী মনোভাব সংগঠিত করে গেছেন জনে জনে প্রচারের মাধ্যমে। লোকচক্ষে কংসকে নিষ্ঠুর দানবের প্রতিমূর্তিরূপে খাড়া করা হয়েছে।

একদিন কৃতবর্মার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলাপে নিশ্চিন্ত কংসের ঘুম ভাঙল।

বীর কৃতবর্মাও কংসের সঙ্গে যাদব প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত ছিলেন। বৃন্দাবনে পরপর যাদব রাজপুরুষের হত্যার সংবাদে তিনি বিচলিত বোধ করেন। নিজের বিশ্বস্ত চরবাহিনীর মারফৎ রাজ্যব্যাপী চক্রান্তের গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত হয়ে কংসকে বললেন,—আর নিশ্চেষ্ট বসে থাকার সময় নেই কংস। রাজদ্রোহীদের সমূলে উৎপাটিত করতে হবে। তোমার ভাবমূর্তি প্রতিকূল প্রচারে সম্পূর্ণ নষ্ট হতে চলেছে। সংবাদ আছে, গোকুলে দেবসন্তানরা ছদ্মবেশে ঘাঁটি গেড়েছে। ওদিকে বন্ধুরূপী বসুদেব দ্বারে দ্বারে ঘুরে জানাচ্ছেন, তুমি তাঁর সদ্যোজাত শিশুদের একের পর এক হত্যা করেছ।

কংস ক্ষিপ্ত হয়ে বলেন,—মিথ্যে কথা। সম্পূর্ণ মিথ্যে কৃতবর্মা।

—কী মিথ্যে কংস? তুমি কি দেবকীর সাতটি সদ্যোজাত শিশুকে হত্যা কর নি?

—করেছি। কংস যেন পরিশ্রান্ত হতাশ স্বরে কথা বললেন, যেন তিনি হঠাৎ উপলব্ধি করছেন একটি দীর্ঘায়িত গোপন চক্রান্ত যা আজ তাঁর নিয়ন্ত্রণের বাইরে। চিন্তিত ক্ষুব্ধ স্বরে কৃতবর্মাকে বললেন,—কিন্তু কে আমাকে এই হত্যায় প্ররোচিত করেছিল? জানো তুমি?

—যখন প্রতাপের তুঙ্গে থাক, তখন বন্ধু-পরিজনের সঙ্গে তো পরামর্শের প্রয়োজন বোধ করো না। তোমার অভীষ্টের কথা তুমি না জানালে জানব কেমন করে।—কৃতবর্মা তাঁর চাপা অভিমান প্রকাশ করেন।

—এ সেই দুষ্ট চরিত্র দেবর্ষি নারদ। লোকটা অত্যন্ত নচ্ছার, ছদ্মবেশী পাপিষ্ঠ।—রাগে কংসের মুখ রক্তাভ হয়ে ওঠে।

কৃতবর্মা হাসেন,—নারদ চরিত্র তোমার পিতা উগ্রসেন যেমন বুঝতে পারেন নি, তাকে বুঝতে তুমিও তেমনি বিলম্ব করেছ। তুমি কি জানো না, দেবতাদের স্বার্থে এই নারদ বন্ধুবেশে যাদব রাজসভায় চিরকাল উপস্থিত হয়েছে! তোমার পিতা বিষ্ণুর প্রতি নতজানু ছিলেন। শূরসেন তাঁর আমলে ছিল কার্যত বিষ্ণুর পদানত। দেবক বসুদেবরা তাই ছিল রাজা উগ্রসেনের

মিত্র। নারদও তখন বিষ্ণুর স্বার্থে উগ্রসেনকে পরামর্শ দিত। কিন্তু তুমি যেদিন বিষ্ণুর প্রাধান্য অস্বীকার করলে, সেদিনই বিষ্ণুর অনুগত দাস দেবক বসুদেব আর ঐ কুচক্রী নারদকেও তোমার পরিত্যাগ করা উচিত ছিল। তা না করে তুমি আজ আমাকে শোনাচ্ছ, নারদের প্ররোচনায় তুমি দেবকীর পুত্রদের হত্যা করেছ! তুমি প্রতাপশালী। আমার প্রিয় ও শ্রদ্ধেয়। কিন্তু এই মুহূর্তে আমি···

কৃতবর্মা তাঁর কথা অসমাপ্ত রাখলে বিষণ্ণ মুখে মাথা নেড়ে কংস ধীরে ধীরে বললেন,—ধিক্! আমাকে ধিক্কার দিচ্ছ? কিন্তু ভেবে দেখো, তোমরাও আমার বীরত্বেই মুগ্ধ ছিলে। আর তখন আমার মন তারুণ্যে টগবগ করছে। সেদিন আমার উত্তম মন্ত্রী কে? কার কাছে পরামর্শ গ্রহণ করতে পারতাম আমি, কৃতবর্মা?

একথায় কৃতবর্মাও বেদনাহত হলেন চোখ নিচু করে বললেন,—একথা ঠিকই, কংস। সেদিন আমিও শুধু আমাদের শক্তিমত্তার ওপরেই নির্ভর করেছি। তারুণ্যের ধর্মই তাই। সেজন্যই এক এক সময় মনে হয়, আজ যদি তোমার পাশে থাকতেন কূটনীতি বিশারদ দেববৈরী ক্রোধজিৎ···

কৃতবর্মার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে কংস বললেন,—ক্রোধজিৎ? উগ্রসেনের চরপ্রধান ক্রোধজিৎ? যাঁকে একদিন দেবক বসুদেবরা জোট বেঁধে মথুরাপুরী থেকে নির্বাসিত করল? তুমি, তুমি কি সেই ক্রোধজিতের কথা বলছ, কৃতবর্মা?

মাথা হেলিয়ে কৃতবর্মা বললেন,—হাঁ। আজ সেই প্রাজ্ঞ বৃদ্ধকেই আমাদের ছিল সর্বাধিক প্রয়োজন। আজ বুঝি, তিনি যাদবের স্বাধীনতায় ব্যগ্র ছিলেন। বিষ্ণু ও বিষ্ণু দাসদের নেপথ্য চক্রান্তের সংবাদ সংগ্রহ করতেন ও সময় মতো তা উগ্রসেনের নজরে আনতেন। কিন্তু উগ্রসেন ছিলেন দুর্বল। তিনি ক্রোধজিতকে কাজে লাগাতে পারলেন না। দেবকের চাপে পড়ে নীরব সম্মতি জানিয়ে বরং তাঁকে পদচ্যুত করলেন। অক্ষম সেই যদুপতি কেবলমাত্র বিষ্ণুকে তোষণের দ্বারা তাঁর সিংহাসন টিকিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। সেই উত্তরাধিকার তোমাতেও বর্তেছে। তুমিও বসুদেব দেবকদের তোষণ করে যাচ্ছ, যখন তাদের কঠোর হাতে দমন করাই রাজকার্য।

কংস দ্রুত পদচারণা করতে করতে বললেন,—কৃতবর্মা! আজ আমাকে দোষরোপ করতে এসেছ? সময়ে পরামর্শ দাওনি কেন? আজ ঘটনা অনেক দূর গড়িয়ে গেছে। অপমানিত ক্রোধজিৎ সভাগৃহ ছেড়ে বেরিয়ে এলে

আমি তাঁকে খুঁজতে যাই। কিন্তু মথুরার কোথাও তাঁর সন্ধান আমি পাইনি। তারপর অভ্যুত্থান। রাজ্য বিস্তার। ভূম্যধিকারীদের মধ্যে বিবাদ মেটানো প্রভৃতি শত কাজের চাপে ক্রোধজিতের কথা বিস্মৃত হয়েছিলাম। আজ তুমি তাঁকে স্মরণ করিয়ে বড ভালো কাজ করলে। চেষ্টা করে দেখো, কোথাও যদি তাঁর সন্ধান পাও।

-- সন্ধান পেয়েছি।

—সন্ধান পেয়েছ।—কংস বেগে ঘুরে দাঁড়ান,—কোথায়? তাঁকে কি বাইরে দাঁড করিয়ে এসেছ? মূর্খ, এখনি সসম্ভ্রমে তাঁকে আমার এই গোপন মন্ত্রণা-কক্ষে নিয়ে এসো, বন্ধু। দেরি কোরো না!

কৃতবর্মা মাথা হেঁট করে বললেন,—সে চেষ্টাও করেছিলাম। সফল হইনি। তাঁকে আনতে হলে তোমাকেই যেতে হবে। সাবধানে, ছদ্মবেশে। যেন দেবকবাহিনী ঘুণাক্ষরেও এ খবর জানতে না পারে।

কংস নীরবে এক মুহূর্ত চিন্তা করলেন, তারপর বললেন,—তাই যাব। ব্যবস্থা করো।

কৃতবর্মা বললেন,—আজ সন্ধ্যায় আমি ছদ্মবেশে একটি সাধারণ রথচালক রূপে তোমার বাগানের কাছে এসে দাঁড়াব। সাধারণ নাগরিকের ছদ্মবেশ নিয়ে তুমি সেই রথে আসবে। সঙ্গে অস্ত্র এনো। রথেও তা থাকবে। আমি নিজেও সশস্ত্র থাকব।

—তাই হবে।

কৃতবর্মা প্রস্থানের উদ্যোগ করে আবার ফিরে দাঁড়ালেন।

বললেন,—কথার ফেরে নারদ প্রসঙ্গ চাপা পড়ে গেল।

কংস বললেন,—সব কথা ক্রোধজিতের সামনেই হবে। আমরা নিশ্চয় তাঁকে এখনও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারি?

—বোধহয় পারি। তাঁর সঙ্গে আলাপেই তা বোঝা যাবে। আমি চললাম। সায়াহ্নের আর বিশেষ বিলম্ব নেই। আমাদের যাত্রার জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

কৃতবর্মা চলে গেলে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন কংস।

অস্ফুটে বার কয়েক উচ্চারণ করলেন, ক্রোধজিৎ!

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এলে রাজবাগিচার খিড়কি পথ দিয়ে একটি ছায়ামূর্তি এসে কৃতবর্মার রথে উঠে বসল। সঙ্গে সঙ্গে রথ ছুটিয়ে দিলেন সাধারণ সারথিবেশী কৃতবর্মা।

জনাকীর্ণ মথুরা নগরীর পথ অসমান ও তরঙ্গায়িত। বেগে ধাবমান সাধারণ রথে কংস ও কৃতবর্মার দেহাস্থিগুলি ব্যথায় জর্জরিত হচ্ছিল। পথধূলিতে তাঁদের বেশভূষা ও সযত্নরক্ষিত কেশ রুক্ষ হয়ে উঠছিল।

কৃতবর্মা হেসে বললেন,—হে বণিক! পথের এই ধূলি আমাদের এমনভাবে ধূসর করে তুলল যে ক্রোধজিতও হয়ত চিনতে পারবেন না তাঁর একদা স্নেহলালিত দুই রাজপুত্রকে।

কংস কষ্টাক্লিষ্ট মুখে হাসলেন,—বেশ বলেছ। বণিক। চিরকাল হন্তারক হিসেবেই কংস তার রথ ছুটিয়েছে। আজ সে যাচ্ছে বাণিজ্যে। ক্রোধজিতের সঙ্গে বাণিজ্যে। কোন্ মূল্য আজ সেই বৃদ্ধ দাবি করবেন, জানি না।

—ভয় কি? তাঁকে বিতাড়িত করায় আমাদেব তো কোনো ভূমিকা ছিল না। তিনি নিজেও তা ভালোভাবেই জানেন

—তা ঠিক। কিন্তু আর একটু ধীরে চালাও। দেহাস্থি চুরমার হয়ে যাবে। দেখো কৃতবর্মা, এই বিষম পথ পথিকের পক্ষে বড কষ্টকর। এই পথ সমান করতে হবে! একথা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিও।

কৃতবর্মা হেসে বললেন,—এজন্যই রাজার উচিত মধ্যে মধ্যে তাঁর রাজ্যে টহল দিয়ে বেডানো। তাতে প্রজার অসুবিধা তাঁর উপলব্ধিতে আসে।

কংস বললেন,—এ সবই কি রাজার দেখার কথা। আমার প্রশাসনিক কর্তাবা কী করে? প্রজামঙ্গলেব জন্য রাজকোষে তো যথারীতি ববাদ্দ আছে।

সামনে নজব রেখে রথচালনা করতে করতে কৃতবর্মা বললেন,—কর্তারা সেই অর্থে গৃহিণীর গহনা, নিজের সম্পত্তি ও বিলাসেব ব্যয়ভার মিটিয়ে থাকে। তদুপরি প্রজাপীড়ন করেও যথেষ্ট উৎকোচ সংগ্রহ করে।

অসহায়ভাবে কংস বললেন,—কারো না কারো হাতে ক্ষমতা তো দিতেই হয়। তারা যদি সাধারণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে, সাধারণে তা রাজার গোচরে আনতে পারে।

—সাহসে কুলায় না। তারা জানে, রাজাও তার কর্মচারীদের ওপর নির্ভরশীল। নালিশ প্রতিবাদে চূড়ান্ত সুরাহা কিছুই হবে না। বরং রাজ-কর্মচারীব রোষাগ্নিই বর্ধিত হবে। তখন কোনো রাজা তাদের বাঁচাতে যাবে না।

—তাই বলে অসৎ কর্মচারীদের কি শুধু প্রশ্রয়ই দিতে হবে?

—না। তার একমাত্র উপায় কোনো কর্মচারীকেই একই জায়গায় একই

পদে অধিক দিন বসিয়ে না রাখা। প্রশাসনকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাতে প্রত্যেক কর্মচারী অসদাচরণের জন্য কঠিন শাস্তি থেকে অব্যাহতি না পায়!

—হ্যাঁ। সেটাই উচিত।

—কিন্তু তাতে কাজ বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা। মানুষের লোভের কোনো সীমা নেই। ন্যায্য প্রাপ্যে কেউ খুশি নয়। সকলেই অনুপার্জিত আয়ের দিকে হাত বাড়ায়। কর্মচারী বিনা পারিশ্রমিকেও তোমার ক্রীতদাসের মতো কাজ করে যাবে যদি তুমি তাকে প্রজার সর্বস্ব লুণ্ঠনের অবাধ সুযোগ দাও। প্রজার প্রতি উদাসীন অপদার্থ রাজারা তা-ই-ই করে। প্রজার ঘৃণা ও থুতুর ওপর এদের ভোগের সিংহাসন টলমল করে। ঔদাসীন্যের ফলে একদিন কোনো না কোনো ভাবে তার পতনও হয়। কিন্তু যতক্ষণ ক্ষমতায়, রাজা ততক্ষণ সেই কালরাত্রির কথা দুঃস্বপ্নের মধ্যেও ভাবতে পারে না।

কংস বিস্মিত হয়ে বলেন,—কৃতবর্মা! এসব কথা আমাকে তুমি শোনাচ্ছ কেন? প্রজার মঙ্গলের দিকে কি আমার দৃষ্টি নেই, না কি কখনো তা ছিল না?

কৃতবর্মা হেসে বলল,—তুমি প্রজার মঙ্গলের কথা ভাবলেও তার কল্যাণের ভার যদি এমন সব পুরুষের হাতে থাকে, যারা প্রজার কাছে তোমাকে হেয় করে তোমাকে তাদের শ্রদ্ধার আসন থেকে নামিয়ে দিতেই বদ্ধপরিকর হয়, তবে তাদের অস্ত্র হল প্রজাকে আরও বেশি পীড়ন করে তোমার বিরুদ্ধে তাদের ক্ষেপিয়ে তোলা। কার্যত এখনো দেবক অক্রূরের হাতেই তুমি প্রশাসনিক ব্যবস্থা তদারকির ভার দিয়ে রেখেছ। তারা প্রজাবিক্ষোভই চায়।

—শয়তান! কংস সরোষে উত্তর দেন;—বসুদেব একটা বন্ধুবেশী শয়তান, কিন্তু অক্রূর?

কৃতবর্মা বললেন,—তার চালচলনও খুব সুবিধের নয়। লক্ষ্য কোরো, বসুদেবের কোনো কাজে অক্রূর প্রতিবাদ করে না।

কংস আর উত্তর দেন না! রাজার পক্ষে সব কথায় কান ভারি করতে নেই। কৃতবর্মা সকলকেই কংসের শত্রু প্রমাণ করতে চায় হয়ত রাজ-প্রসাদ লাভের বাসনায়। কিন্তু কংস অত কাঁচা নন। অক্রূর তাঁর বিশ্বস্ত মন্ত্রী। এখনো সে অবিশ্বাসের কাজ করে নি। নির্লোভ, দানপতি। সাধারণত সে স্বল্পভাষী। প্রকাশ্যে কারও বিরুদ্ধে কথা বলে না। কিন্তু অক্রূরই তাঁকে সংবাদ দেয়। দেবক বসুদেবের গোপন সংবাদও কংসকে সময়ে জানাতে কখনো তার ভুল হয় না। অত্যন্ত রাজভক্ত পুরুষ।

রথ যমুনার তীরবর্তী একটি অগভীর বনাঞ্চলের মুখে এসে দাঁড়ায়।

কৃতবর্মা যমুনার অপর তীরের প্রতি তর্জনী নির্দেশ করে বললেন,—ঐ তীরে গোকুল। শোনা যায়, দেবতারা ওখানে একটা ঘাঁটি বানিয়েছেন। তাঁদেরই প্রশ্রয়ে ও সাহায্যে নন্দ গোপের দুই ছেলে কৃষ্ণ-বলরাম কয়েকজন রাজভক্ত যাদব বীরকে হত্যা করেছে। রাজদ্রোহীদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য তোমার উচিত নন্দ গোপকে বন্দী করা।

কংস বললেন,—তাকে তার ঔদ্ধত্যের জন্য অবশ্যই শাস্তি পেতে হবে। কিন্তু থামলে কেন? ক্রোধজিতের পুরীতে নিয়ে যাবে না।

—পুরী নয়, আশ্রম।

—আশ্রম!

—হ্যাঁ। মথুরাপুরী থেকে বহিষ্কৃত ক্রোধজিৎ মথুরায় ফিরে এসেছেন এক সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে। এখন তাঁর নাম, নমুচি। এই উপবনের মধ্যেই নমুচির আশ্রম। রথ বনপথে কিছুদূর পর্যন্ত যাবে। তারপর আমাদের পদব্রজেই অগ্রসর হতে হবে।

যমুনার ক্রোড়ে এই নির্জন বনপ্রান্তরের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেলে একটি টিলার কাছে এসে পথ শেষ হয়। কংস ও কৃতবর্মা টিলার পাদদেশে পৌঁছে দেখলেন, পাথর সাজিয়ে টিলায় ওঠার একটি সঙ্কীর্ণ সোপান প্রস্তুত করা হয়েছে। আরোহণ পথের দুধারে স্বল্প ঝোপঝাড় চন্দ্রালোকে চারদিক ছমছম করছে।

টিলার ওপরে প্রশস্ত পরিষ্কার চত্বর। সেখানেই একটি সুন্দর মন্দিরোপম কুটীর। কুটীরের একপাশে নাগ দেবতার বিগ্রহ।[২]

কংস ও কৃতবর্মা আনত হয়ে মথুরাধীশ নাগ-দেবতাকে প্রণাম করলেন।

প্রণাম সেরে মাথা তুলতেই দেখলেন, রক্ত পট্টবস্ত্র পরিহিত দীর্ঘকায় এক পুরুষ মন্দিরের পেছন থেকে বেরিয়ে আসছেন। পায়ে কাষ্ঠ পাদুকা। মাথার কেশ ও শ্মশ্রু স্বর্ণাভ। দেহ গৌরকান্তি।

কৃতবর্মার অনুসরণে কংসও প্রণাম জানালেন সেই মুনিবরকে। তিনি দুহাত তুলে আশীর্বাদ করে বললেন,—এসো, কংস। এসো কৃতবর্মা। তোমাদের সব কুশল তো?

দুজনে তাঁরা পরস্পরে দৃষ্টি বিনিময় করে যেন একে অপরকে বলতে চাইলেন, তাহলে ইনিই ক্রোধজিৎ। তিনি ছাড়া রাজার নাম ধরে আর কে

সম্বোধন করবেন। কৃতবর্মাও ইতিপূর্বে নমুচি-বেশী ক্রোধজিৎকে দেখেন নি। সুতরাং তাঁরা তাঁকে চিনতে পারেন নি।

কংস বললেন,—আপনার কুশল সংবাদ পেয়ে ছুটে আসছি আমরা, যাদব-হিতৈষী মহাত্মা ক্রোধজিৎ। অনেক আশা, আপনি শূরসেনের দুঃসময়ে আপনার মন্ত্রণা দিয়ে আপনার পুত্রপ্রতিম কংসকে প্রতিকূল অবস্থা থেকে উদ্ধার করবেন।

ঘরে এনে দুই রাজপুরুষকে বসিয়ে উপবেশন করলেন ক্রোধজিৎ।

গম্ভীর কণ্ঠে বললেন,—আর ক্রোধজিৎ নই, কংস। এখন আমি আত্ম-গোপনকারী নমুচি। জানো, নমুচি কে ছিলেন?

কংস ও কৃতবর্মা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন দেখে তিনি আবার নিজেই বললেন,—ঋগ্বেদে এই ইন্দ্রশত্রু নমুচির উল্লেখ আছে। অসুর জাতিকে ইন্দ্র যখন পরাস্ত ও বিধ্বস্ত করছেন, নমুচি তখন প্রবল প্রতাপে ইন্দ্রকে বাধা দিয়ে পরাজিত করেন। বন্দী করেন ও তারপর মুক্তি দেন মৈত্রীচুক্তি করে। কিন্তু কপট ইন্দ্র সে চুক্তি ভঙ্গ করে নমুচিকে হত্যা করেন,—একটু থেমে জ্বলন্ত চোখে রুষ্ট স্বরে ক্রোধজিৎ পুনশ্চ বললেন,—কিন্তু নমুচির মৃত্যু নেই। বহিরাগত দেবতাদের প্রতিরোধ করার জন্য তাদেরও আবির্ভাব হবে যুগে যুগে। আমি সেই নমুচি। আজ ক্রোধজিতের অবয়বে নমুচির প্রতিহিংসা নিয়ে উপস্থিত হয়েছি পুনরায়।[৩]

কংস বললেন,—আজ আমি সেজন্যই আপনার দ্বারস্থ। দেবতারা ষড়যন্ত্র করছেন পিতৃব্য দেবক ও বসুদেবের সঙ্গে....

—আমি জানি।

—তাই প্রার্থনা, আপনি আমার প্রধান মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করুন। আজ আমি প্রায় মিত্রহীন। আমার বুদ্ধিস্বরূপ বিশ্বস্ত মন্ত্রী নেই, নেই চক্ষুস্বরূপ বিশ্বস্ত গুপ্তচর।

বাধা দিয়ে নমুচি বললেন,—কে বলল তুমি মিত্রহীন। মগধরাজ জরাসন্ধের মতো রাজচক্রবর্তী যার শ্বশুর, আর্যাবর্তে তার চেয়ে সহায়সম্পন্ন আর কে আছে?

মাথা নত করে কংস বললেন,—কিন্তু আমি তাঁর ক্ষমারও অযোগ্য। তিনি নিশ্চয় পরাভবের স্মৃতি বিস্মৃত হন নি।

—ভুল কংস। তুমি তাঁর মহাজোটে যোগ দাও, আমার বিশ্বাস, নিশ্চয় তিনি ক্ষমা করবেন। তাঁর দুই কন্যা অস্তি ও প্রাপ্তি তোমার প্রধানা মহিষী। কন্যাদের মুখ চেয়ে পিতা কতকাল দূরে থাকবেন।

—কিন্তু কংস কারো কাছে নতি স্বীকার করে না, মুনিবর, আপনি জানেন, স্বয়ং ইন্দ্রও আমার কাছে পরাস্ত হয়েছে। তাপস শঙ্করকেও ফিরে যেতে হয়েছে। জরাসন্ধের সৈন্যদলকে আমি ছত্রভঙ্গ করেছি।

কৃতবর্মা বললেন,—তাছাড়া, জরাসন্ধের সঙ্গে মৈত্রী শূরসেনে বিদ্রোহীদের হাতে প্রচারের আর একটি অস্ত্র তুলে দেবে। তারা জনগণের মধ্যে প্রচার করবে, কংস মথুরাকে গিরিব্রজের কাছে বেচে দিচ্ছে। যাদবরা স্বাধীনচেতা। যেমন তারা চায় না হিমালয়ের প্রভুত্ব, তেমনিই জরাসন্ধের কাছে কংস নতি স্বীকার করলে তার ভাবমূর্তি বিনষ্ট হবে।

বিরক্ত স্বরে নমুচি বললেন,—অর্বাচীনের মত কথা বোলো না কৃতবর্মা। জরাসন্ধ আজ সুরবিরোধী জোটের অবিসম্বাদী নেতা। তিনি কারও রাজ্য গ্রাস করেন নি। এমন কি যে অঙ্গদেশের সঙ্গে মগধের চির শত্রুতা, আজ ক্ষমতার শীর্ষে বসেও জরাসন্ধ সে রাজ্য গ্রাস করেন নি। তাঁর বিরুদ্ধে অপপ্রচার করছে ঐ লোভী ব্রাহ্মণেরা, যারা দেবতাদের ভৃত্য এবং চায় চির অনার্য মগধেও আর্য চাতুর্বর্ণাশ্রম প্রবর্তন করতে।[৪]

কংস বললেন,—আমার মহিষীদ্বয়ও আমাকে বহু অনুরোধ করেছে তাদের পিতৃদেবের শরণ নিতে। কিন্তু হে শূরসেন হিতৈষী ক্রোধজিৎ। আপনিই বলুন, আপনার স্বাধীন শূরসেন কি তার উন্নত মাথা নুইয়ে মগধের দরবারে ক্ষমা ভিক্ষা করতে যাবে? এমন আদেশ আপনি করবেন না। এ বিশ্বাস আমার আছে।

ক্রোধজিৎ ওরফে নমুচি নিরুত্তরে কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন,—উত্তম। কিন্তু শূরসেন ও মগধের বিবাদ মিটিয়ে ফেলতেই হবে। এছাড়া দেবশক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াবার অন্য উপায় আমি দেখছি না কংস। তোমাকে দেবশিবির বিরোধী জরাসন্ধের জোটে যুক্ত হয়ে নিজের ও অপর দিকে সেই বহিরাগত পর-ভূমিগ্রাসী দেবতাদের বিরুদ্ধে শক্তি সংহত করতে হবে। আর এই মহামিলনের দায়িত্ব আমিই গ্রহণ করলাম।

—আপনি! কংস ও কৃতবর্মা উৎফুল্ল হয়ে সমস্বরে বলে উঠলেন।

—এ ছাড়া উপায় নেই। কংস ঠিকই বলেছে, কংসের নতি-স্বীকার মানেই শূরসেনের নতি-স্বীকার। কিন্তু আমি যদি স্বাধীন দূত হিসেবে তাঁর কাছে গিয়ে বলি, কংসকে রাজি করাবার দায়িত্ব আমার, আপনি অনুমতি দিন, তাহলে সেটা হবে, আমার ব্যক্তিগত আবেদন, কারণ আমি কংসের বেতনভুক মন্ত্রী বা কর্মচারী নই।

একথায় আবার দুজনে ম্রিয়মাণ হয়ে গেলেন।

কংস বললেন,—কিন্তু আমরা যে এসেছি আপনাকেই মহামন্ত্রী এবং আমার গুপ্তচরবাহিনীর প্রধানরূপে বরণ করে নিয়ে যেতে।

—তা হয় না কংস। বর্তমান পরিস্থিতিতে তা আর সম্ভব নয়। অনেক আগে অর্থাৎ তোমার ক্ষমতায় আরোহণের সময় আমাকে স্মরণ করলে আমি হয়ত তোমার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করতাম না। তখন আমার বিনিময়ে যদি তুমি দেবক গোষ্ঠীকে উগ্রসেনের মতো ক্ষমতাচ্যুত করতে, আমি পারতাম তোমার মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করতে। কিন্তু এখন যে অবস্থায় তোমার সভাকে নিয়ে এসেছ তাতে এই সংকটকালে দেবকদের সরাতে গেলে এমনই প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে যা সামলানো যাবে না। তাই যেমন চলছে চলুক। আমি গুপ্তভাবে শূরসেনের জন্য কাজ করে যাব। সাধ্যমত সহায়তা করব তোমার। জরাসন্ধের সঙ্গে মৈত্রীর পর যদি সময় আসে তখন প্রস্তাব বিবেচনা করে দেখব এক শর্তে। আর সে শর্ত হল, আমার বিনিময়ে তোমাকে ত্যাগ করতে হবে তোমার ছদ্মবেশী বন্ধুদের ; এমন কি অক্রূরকেও।

—অক্রূর ?

—সে বসুদেবের চেয়ে ধূর্ত। তার ওপরের খোলসটা ভণ্ডামিতে ঢাকা। তার থেকে সাবধান।

কৃতবর্মা বললেন,—আমিও একথাই বলেছি। কংস ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না।

—পারলেও এখন আর সময় নেই। ওদের বুঝতে দিলে চলবে না যে ওদের গোপন অভিসন্ধি রাজা অবগত আছেন। শুধু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। ওদের কার্যকলাপের সঠিক সংবাদ রাখতে পারলে আক্রমণ কোন্ দিক থেকে আসছে তা জেনে সেইমত তৈরী হতে পারবে কংস।

কিছুক্ষণ আরও পরামর্শের পর বিদায় নিলেন কংস ও কৃতবর্মা। খুব বেশিক্ষণ কংসের অনুপস্থিতি নতুন সংকট সৃষ্টি করতে পারে। তাই নমুচিই তাঁকে বিদায় জানালেন জোর করে।

বললেন—আমার কাজ আমি করব। সঠিক সময়ে আমার দূত মারফৎ সংবাদ পাবে তুমি।

১৩

বহু জনপদ পেরিয়ে গঙ্গা পার হয়ে মুনিবেশে নমুচি যখন গিরিব্রজের দ্বারদেশে উপস্থিত হলেন, তখনই গোধূলির ছায়া নেমে এসেছে। মগধের' রাজধানী রাজগৃহের পথে পথে ছুটছে টাঙার মতো ছোট ছোট ঘোড়ায়-টানা রথ। বিত্তবানরা নগরের বিপণিগুলিতে সওদা করছেন। রাজ সান্ত্রীরা কেউ ঘোড়ায়, কেউ পদব্রজে টহল দিচ্ছে। নগর দ্বারে কড়া প্রহরা।

নমুচির দেহে রক্তবস্ত্র এবং নাগসেবকের চিহ্ন দেখে দ্বারপাল পথ ছেড়ে দিল। রাজপথে চলমান পথিকেরা অপরিচিত হলেও অভিবাদন জানাতে লাগল দীর্ঘদেহী উত্তর প্রদেশীয় গৌরকান্তি নাগপূজারীকে। নমুচি রাজপ্রাসাদের হদিস জেনে নিলেন।

রাজপথের সুরম্য হর্ম্যগুলি এক একটি ছোটখাটো রাজপ্রাসাদেরই মতো সমৃদ্ধ। নমুচি সপ্রশংসভাবে সেই বৈভবপূর্ণ নগর দেখতে দেখতে এগিয়ে চললেন। তাঁর মুখে একফালি হাসি ছড়িয়ে পড়ল। মনে মনে বললেন, কাশি কঙ্খল নিয়ে দেবতারা গর্ব করেন। জরাসন্ধের রাজ নগরী দেখলে তাঁদের তো হিংসা জাগবেই। এই রাজ্য অধিকার করার জন্য তাই তাঁদের যত্নের আর শেষ নেই। লোভী আর্য ব্রাহ্মণরাও শকুনের মতো তাকিয়ে আছে এই সম্পদশালিনী সাম্রাজ্য অধিকার করার জন্য। ধন্য রাজা জরাসন্ধ। তিনি সময় থাকতে ভারতবর্ষকে সংঘবদ্ধ করার কাজে লেগেছেন। এমন এক পুরুষের কাছে কংস যদি তার মাথা অবনতই করে তবে তাতে ক্ষতি কি? জরাসন্ধ তো সর্বমান্য সম্রাট।

রাজপ্রাসাদের প্রহরী প্রধান পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে নমুচি তাঁর আসল নামই বললেন। বলে পাঠালেন, শূরসেনের পদচ্যুত চরপ্রধান ক্রোধজিৎ সম্রাটের সাক্ষাৎ-প্রার্থী।

রাজাদেশ নিয়ে প্রতিহারী ফিরে এলো। ক্রোধজিতের প্রার্থনা মঞ্জুর। সম্রাট এখনই সাক্ষাৎ করবেন।

আশ্চর্য হলেন না ক্রোধজিৎ। এমনটাই আশা করেছিলেন তিনি। সম্রাটের দুই কন্যার সংবাদ জানার জন্য যেমন, শূরসেনের এক পদচ্যুত রাজকর্মচারীর অভিপ্রায় জানার জন্যও তেমনি জরাসন্ধের কৌতূহল যে অদম্য হয়ে উঠবে

তাতে সন্দেহ ছিল না ক্রোধজিতের তবে প্রার্থনামাত্র ডাক পড়বে এতটা ভরসা ছিল না।

জরাসন্ধের ব্যক্তিগত যজ্ঞগৃহে (মন্ত্রণাকক্ষে) প্রবেশ করে ক্রোধজিৎ প্রথমে দুহাত তুলে রাজাকে নমস্কার জানিয়ে পরে এক হাত তুলে আশীর্বাদের ভঙ্গিতে বললেন,—সম্রাট। আপনার, রাজমাতার ও মগধের কল্যাণ হোক। সব কুশল তো ?

জরাসন্ধ ক্রোধজিৎকে ভিন্ন পোষাকে কল্পনা করেছিলেন। তাঁর পরণে সন্ন্যাসীর বসন ও তাঁর বিচিত্র আচরণে বিস্মিত হয়ে বললেন,—আপনি ?

—হ্যাঁ, মহারাজ। ক্রোধজিৎ আজ নাগেশ্বর-সেবক নমুচি। সেই ইন্দ্রদ্বেষী ইন্দ্রজিৎ নমুচি। যাঁর মৃত্যু নেই। বিভীষণের বিপরীতে যিনি বার বার জন্মগ্রহণ করেন।

ক্রোধজিৎ সংক্ষেপে যে পরিচয় দিলেন তার দ্বারাই তিনি তার দেববিরোধী মনোভাবও ব্যক্ত করলেন দেখে সন্তুষ্ট হয়ে জরাসন্ধ বললেন,—আপনি উপবেশন করুন। মনে হচ্ছে, বহু অভিজ্ঞতায় আপনি বিচক্ষণ হয়েছেন।

এরপর তিনি সংবাদ নিলেন তাঁর দুই কন্যার। জানতে চাইলেন শূরসেনের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং কংসের আসন্ন বিপদের কথা শুনে তাঁর প্রশস্ত কপালে চিন্তার রেখা ফুটে উঠলেও মুখে কিছু প্রকাশ করলেন না। গম্ভীরভাবে বললেন,—আপনার আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করুন এবার।

নমুচি বললেন,—সম্রাট। আমার পদচ্যুতির ইতিহাস আপনি নিশ্চয় আপনার চরমুখে জেনে থাকবেন। ভারতবর্ষের কোন রাজ্যে কী ঘটছে নিশ্চয় তা আপনার বিশ্বস্ত চরবৃন্দ নিয়মিত আপনার গোচরে আনেন।

বাধা দিয়ে জরাসন্ধ বলেন,—শুনেছি, বিষ্ণুপদলেহী দেবকের ষড়যন্ত্রে আপনি দুর্বল উগ্রসেনের দ্বারা পদচ্যুত হন। তা বর্তমানে কংস কি আপনাকে পুনরায় স্বপদে বরণ করেছেন।

—না সম্রাট! আমার পণ, দেবকগোষ্ঠী উৎখাত না হওয়া পর্যন্ত শূরসেনের রাজসভায় পদার্পণ করব না। আর সেইজন্যই আমি এসেছি আপনার কাছে কৃপা প্রার্থনা করতে।

—প্রতিহিংসা ? ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা ?

নমুচির দৃষ্টিতে সর্বক্ষণই প্রতিহিংসার আগুন জ্বলছে, জরাসন্ধ ঠিকই তাঁর মনের কথা পড়তে পারেন।

—নিশ্চয় ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা। কিন্তু জন্মভূমির প্রতি আমার প্রেমই সে

প্রতিহিংসাকে এতোকাল টিকিয়ে রেখেছে। তা আমাকে যেমন মহান, কষ্টসহিষ্ণু ও জিতেন্দ্রিয় হওয়ার শিক্ষা দিয়েছে, তেমনিই করেছে অকুতোভয়। মায়ের আশীর্বাদই আমার পাথেয়। সেই পাথেয় নিয়ে দেবতাদের সতর্ক চোখকে ফাঁকি দিয়ে কোশল ও কৌশাম্বীর জনপদ অতিক্রম করে যমুনা ও গঙ্গার উজান বেয়ে এতোদূর ছুটে এসেছি সম্রাটের দরবারে। জরাসন্ধের সামনে আমার মতো সামান্য মানুষের উপস্থিতিই কি যথেষ্ট দুঃসাহসের পবিচায়ক নয়? তা কি কেবলমাত্র ব্যক্তিগত প্রতিহিংসাসম্বল পুরুষের সাধ্যকর্ম? আমি প্রলোভনকেও জয় করতে শিখেছি।

—সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য আপনার কথা, নমুচি। কিন্তু আমার কাছে কোন্ সাহায্য আপনি প্রার্থনা করেন?

—শূরসেনের বিপন্মুক্তি। আপনার মহাজোটে শূরসেনের অন্তর্ভুক্তি আপনি অনুমোদন করুন, এই আমার প্রার্থনা।

জরাসন্ধ সিংহাসন ছেড়ে নেমে দাঁড়ান।

—আমার মহাজোটে কংস? সেই দুঃসাহসী যুবক? জরাসন্ধের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেও টিকে আছে সে কেবলমাত্র আমার দুই কন্যার জন্য। আমার স্নেহের কন্যাদুটিকে রক্ষা করার জন্যই কংসকে আক্রমণ করিনি আমি।

—আমি জানি, সম্রাট। কংস বীর, কিন্তু আপনি বীরশ্রেষ্ঠ। আপনার কাছে যে অমিত শক্তিশালী দূরক্ষেপণাস্ত্র আছে তা যে কোনো রাজ্যে আগুন জ্বালিয়ে দিতে পারে।[২]

—ধন্য ক্রোধজিৎ! রাজগুপ্তচরের পদে আসীন না থেকেও আপনি জরাসন্ধের অস্ত্রাগারের সংবাদ রাখেন। শূরসেনের নিতান্তই দুর্ভাগ্য যে সে আপনার মত কুশলী একটি অস্ত্র হারিয়েছে। আপনি আমার চর বাহিনীতে যোগদান করলে সম্রাট জরাসন্ধ আপনাকে সাদরে বরণ করে নেবে।

—আমি কৃতজ্ঞ মহারাজ। কিন্তু আমি সেজন্য আসিনি। এসেছি আমার মাতৃভূমিকে পরভূমিগ্রাসী বহিরাগত দেবতা এবং তাদের পদলেহী আর্যাবর্তবাসী বিভীষণদের কদভিপ্রায় থেকে রক্ষা করতে। আপনি আপনার জামাতা কংসের অপরাধ ক্ষমা করে তাকে আপনার পিতৃবক্ষে স্থান দিন। শূরসেনকে মহাজোটে অন্তর্ভুক্ত করে রক্ষা করুন। শূরসেনে আজও স্বাধীনচেতা যুবকের অভাব নেই। আছে কৃতবর্মার মতো অপরাজেয় বীর। তারা আপনার মহা-জোটের শক্তিবৃদ্ধি করবে এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই। সে সময় প্রয়োজনে আপনার আদেশমত যে কোন শক্ত কাজের ভার আমি মাথা পেতে বহন করব।

জরাসন্ধ সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকালেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন,—মিথ্যা গর্বে গর্বিত, বলদর্পী সেই কংস নিজে এলো না কেন ?

—সম্রাট, আমি আগেই বলেছি, আমি কংসের দূতিয়ালী করতে আসিনি, এসেছি নিজের স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে। কংস আভ্যন্তরীণ অবস্থা নিয়ে বিব্রত। সে হয়ত এদিকে চিন্তাও করে নি। কিন্তু তার দুই প্রিয় মহিষী, আপনার কন্যাদের মুখ চেয়ে আপনি তার তরুণোচিত ব্যবহার ক্ষমা করুন।

জরাসন্ধ দূরনিবদ্ধ দৃষ্টিতে যেন শূরসেন-মহিষী তাঁর দুই কন্যার মুখশ্রী দেখতে লাগলেন। কন্যাদুটির স্মৃতি তাঁর চক্ষুর্দ্বয় স্নেহার্দ্র ও ঝাপসা করে তুলল। নিজেকে সংযত করে আস্তে আস্তে থেমে থেমে তিনি বললেন, —রাজকার্য বড় নিষ্ঠুর ক্রোধজিৎ। পিতাপুত্র, কন্যাজামাতা, ভ্রাতাভগ্নী রাজাভিমানের কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়। কত স্নেহ জমে আছে এই কঠোর কঠিন বুকটায়, ঐ দুই হতভাগ্য কন্যার জন্য…

—ভুল মহারাজ ; আপনার কন্যাদ্বয় মহা সৌভাগ্যবতী। শূরসেনের রাজেশ্বরী তাঁরা। কংসের মতো সর্বগুণবান যুবকের প্রধানা মহিষীরূপে অত্যন্ত সুখী। কংস কখনো তাঁদের অনাদর করেন না। রাজ্যবাসীর শ্রদ্ধা ও সমীহের পাত্রী তাঁরা।

—শুনে সুখী হলাম। অসতর্ক মাগধী সেনাকে পরাস্ত করে কংস যখন তাদের হরণ করে পলাতক হয়, সংবাদ পাওয়ার পর আমি তার বিনাশের কোনো আয়োজন করতে পারিনি কন্যার মুখ চেয়ে। জীবনে আমার এই একমাত্র পরাজয়।

—পরাজয় কেন সম্রাট! এ আপনার আনন্দ ও গর্ব। জামাতা উপযুক্ত। ক্ষত্রিয় বীর কন্যা হরণই করেন ; ক্ষত্রিয় রমণী বীরভোগ্যা। কংস সুপুরুষও বটে।

—আপনি যথার্থ বন্ধুর মতই কথা বলছেন। আমার অমিত বিক্রমশালী মিত্রবর্গও সেদিন এই যুক্তিতেই আমাকে নিরস্ত করেছেন।

—আপনার বিক্রম প্রমাণিত হবে কৃষ্ণের অভ্যুত্থান প্রতিরোধ করে। সে দেবশিবিরের দ্বারা রক্ষিত।

—কৃষ্ণ? কৃষ্ণ কে?

—বৃন্দাবনে নন্দালয়ে বর্ধিত বসুদেব পুত্র বাসুদেব। বিশ্বাসঘাতক বসুদেব তাকে গোপনে কংস-হন্তারক হিসেবে পোষণ করেছে। যমুনার পরপারে বৃন্দাবন আজ দেবতাদের সুরক্ষিত ঘাঁটিতে পরিণত। কংসের গুপ্তচর বাহিনী কংসের কাছে এ সংবাদ চেপে রেখে আজ বিপদ ঘনিয়ে তুলেছে। আরো বিলম্বের অর্থ, মহাবিনষ্টি। পশ্চিমা রাজ্যগুলির মধ্যে শূরসেনই শক্তিশালী। তারই গায়ে

কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের হস্তিনাপুর। কিন্তু তিনি মহাবীর ভীষ্মের দ্বারা রক্ষিত। ভীষ্ম এখনও নির্লিপ্ত হয়ে আছেন। তিনিও আজ মহাজোটে যোগদান করলে হিমালয়ের দেবশিবিরকে বিধ্বস্ত ও চূর্ণবিচূর্ণ করে দেওয়া যেত। পাঞ্চাল রাজ্যের সঙ্গে বিবাদই কিন্তু তাঁদের কাছে আজ বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। যখন ভারত-বর্ষের রাজন্যবর্গের উচিত বহিরাগতের অনুপ্রবেশ একজোটে প্রতিরোধ করা, তখন তাঁরা তুচ্ছ প্রাতিবেশিক সঙ্ঘর্ষে লিপ্ত। একমাত্র আপনি-ই সেই দূরদৃষ্টির অধিকারী, ভারতের আসন্ন বিপদ সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন। তাই আমার শ্রদ্ধা আপনি গ্রহণ করুন, সম্রাট।

জরাসন্ধ অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন।

ধীরে ধীরে বলেন—বিদ্বেষ, আত্মকলহ, দম্ভ ভারতকে বিচ্ছিন্ন করেছে। তোমার মতো করে কেউ নিজেদের একই ভারত মাতার ক্রোড়-লালিত সন্তান বলে গণ্য করে না। একে অপরের প্রতি ঈর্ষান্বিত। একে অপরকে লুণ্ঠন করেইশক্তিক্ষয় করছে। আর তারই দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বহিরাগতরা। এমন সম্পদশালিনী পৃথিবী জগতে আর কোথায় আছে? যা নেই ভারতে তা নেই জগতে। পর্বত সমুদ্র নদী নির্ঝরিণী, বনজ ও খনিজ সম্পদ, সুজলা সুফলা মৃত্তিকা, প্রকৃতির অজস্র দানে ভারতবর্ষ পূর্ণ। তবু কী আহম্মক আমরা! এই মহান শক্তির পূর্ণ সদ্ব্যবহার নাকরে নিজেদের মধ্যে হানাহানি করেই শেষ হয়ে যাচ্ছি। বহিরাগত ক্ষুদ্র শক্তির আক্রমণে উত্তর পশ্চিম ভারত আক্রান্ত হচ্ছে বারবার। আমি দেখতে পাচ্ছি নমুচি, ভবিষ্যতেও এই ভারত কেবলমাত্র ক্ষুদ্র স্বার্থ ও আত্মকলহের মধ্যেই নিজের শক্তি ক্ষয় করে রিক্ত সর্বহারায় পরিণত হবে। এখনো সময় ছিল। কিন্তু ভীষ্ম দাম্ভিক। সে আমার মহাজোটে যোগদান করা অবমাননাকর মনে করে। এই দম্ভই একদিন তার পতনের কারণ হবে যদি ভারতের অন্যান্য রাজ্য বহির্শক্তির দ্বারা পরাজিত হয়। তখন নির্বান্ধব কুরুরাজ সামাল দিতে পারবেন না।

একটু থামলেন জরাসন্ধ। তারপর এগিয়ে এলেন ক্রোধজিতের কাছে। অকস্মাৎ তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে আবেগরুদ্ধ স্বরে বললেন,—ভেবে দেখলাম, তুমি আমার পুরস্কারের যোগ্য নও। তোমাকে বন্ধ করাই তোমার প্রতি সঠিক আচরণ।

পেশীবহুল জরাসন্ধের বাহুপাশে বদ্ধ ক্রোধজিৎ শিহরিত হলেন।

—আমি বদ্ধ, সম্রাট! আমার অপরাধ?

—হ্যাঁ, বন্ধু! তোমার স্বদেশহিতৈষণাই তোমার অপরাধ। আমার

কোষাগার আজ থেকে তোমার কাছে উন্মুক্ত। গ্রহণ করো আমার এই স্মারক চিহ্ন। যাও! শূরসেনের সঙ্গে মৈত্রীর সম্পর্ক স্থাপনের জন্য আমার বন্ধু রাষ্ট্রের যে কারও মাধ্যমে ব্যবস্থা করো। মনে রেখো, জরাসন্ধের জন্য নয়, ভারত-মাতার নিরাপত্তার জন্যই আমি তোমার প্রস্তাবে সম্মত। ভারতের সকল শক্তিকে সংহত করো, বিচক্ষণ নমুচি। নমুচির মৃত্যু নেই। ঠিক কথা। বিভীষণের প্রতিপক্ষে সেও যুগে যুগে আবির্ভূত হবে। জরাসন্ধের শুভেচ্ছা রইল, নমুচি!

১৪

নমুচির আশ্রম থেকে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত আর চিন্তাক্লিষ্ট হয়ে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন কংস। অন্তঃপুরে ফিরেছেন স্খলিত চরণে।

বাইরে পরিষ্কার ফুটফুটে জ্যোছনাধারায় স্নান করছে তখন রাজোদ্যানের পুষ্পবিথীকা। প্রস্তর-নির্মিত ব্রহ্মকমলের পাশে পাশে ময়ূর ময়ূরীরা স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মথুরা নগরীর সপক্ষ নাগরিক এরাই। পথে পথে ছড়িয়ে থাকে, পথিকের দৃষ্টিতে প্রশংসার প্রশ্রয় লাভ করে। সাক্ষাৎ মিথুনমূর্তি।

প্রাপ্তি তাদের নিয়ে সোহাগ করছিল একাকী। শয়নকক্ষের গবাক্ষ থেকে সেদৃশ্য দেখে কংসর অন্তর্ভেদ করে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। আপন মনে কংস বলেন,—বেলা শেষ হয়ে এলো। রাজোদ্যানের এই চন্দ্রালোক আজ বড় মিহি। তার নরম মাধুর্যে কেন অমার বুকে হাহাকার জাগছে? স্পন্দন দ্রুততর হয়েছে? আমি, আমি কি পাগল হয়ে যাব। কংস নিজেকে এমন নিঃসহায় আর নির্বান্ধব কখনো অনুভব করেনি। মন বলছে, আমারে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে!

—কার সঙ্গে কথা বলছ, রাজা? কোথায় অদৃশ্য হয়েছিলে?

কংস ঘুরে দাঁড়ান, —কে? অ, অস্তি? এসো।

তারপর ভ্রূ কুঞ্চিত করে বলেন,—আমার অনুপস্থিতি কি রাষ্ট্র হয়ে গেছে, রাণী?

—না, রাজা।—অস্তি কাছে আসেন ঘনিষ্ঠ হয়ে,—পিতার সঙ্গে রাজকার্যের পাঠ আমি শৈশব থেকেই গ্রহণ করেছি। যখন অন্তঃপুরচারিণী আমার এক সহচরীর মুখে শুনলাম, উদ্যানের খিড়কী পথে কোনো এক পুরুষ নিঃশব্দে বার হয়ে গেলেন এবং অপেক্ষমাণ একটি রথে আরোহণ করেই তীব্র বেগে ছুটে চললেন জনবিরল পথ ধরে যমুনার দিকে; তখনই সন্দেহ হয়েছিল, সে পুরুষ তুমি।

—আশ্চর্য প্রতিভাময়ী তুমি, রাণী! তারপর?

—আমি সহচরীকে এ সংবাদ গোপন রাখার নির্দেশ দিয়ে দ্রুত শয়নকক্ষে ফিরে এসে দেখলাম, আমার বস্ত্রাধারে তুমি তোমার রাজবেশ লুকিয়ে রেখে গেছ। বুক আশঙ্কায় দুর দুর করে উঠল। শত্রু-পরিবেষ্টিত শূরসেনে কোথায়

গেলে তুমি। চোখ ঝাপসা হয়ে এলো আমাকে সংবাদ না দিয়ে এভাবে চলে যাওয়ার জন্য।

—বিশ্বাস করো রাণী! তখন আমার হাতে তিলমাত্র সময় ছিল না।

অস্তি হাসলেন,—শুধু কি সেটাই কারণ? আমি নারী, রাজকার্যে তুমি আমাকে তোমার যোগ্য সহধর্মিণী বলে গণ্য করো না। আমার পরামর্শেও কখনো কর্ণপাত করো না। তাই তোমার গোপন অভিযানের কথা আমার কাছে গোপন করে গেছলে। ভেবে দেখোনি, তাতেই অনর্থ হত অনেক বেশী, যদি আমি ব্যাকুল হয়ে তোমার সন্ধানের উদ্যোগ গ্রহণ করতাম···

কংস দুহাত বাড়িয়ে অস্তিকে বুকে টেনে নিয়ে তার মুখচুম্বন করলেন।

বললেন,—ক্ষমা করো, রাণী! আমার চোখে তুমি ও প্রাপ্তি নরম পুত্তলীবৎ নিতান্ত বালিকা বলেই সব সময় মনে হয়। মনে হয়, তোমরা আমার চুম্বন ও স্নেহাদরেরই যোগ্যা। আজ বুঝি, তুমি তীক্ষ্ণবুদ্ধি রাজ-মহিষী। বলো, তারপর কি করলে।

—ছুটলাম তোমার অস্ত্রাগারে। দেখলাম, তোমার চিরসাথী অস্ত্রও অনুপস্থিত। বুঝলাম, তুমি সশস্ত্র এবং যতক্ষণ সশস্ত্র ততক্ষণ নির্ভয়। প্রাপ্তিকে জানতে দিলাম না। তাকে ঐ বাগানে পাঠিয়ে সহচরীকে খিড়কী পথে প্রহরায় রাখলাম। প্রত্যাবর্তন করে তোমার পুরীপ্রবেশে যেন বিঘ্ন না ঘটে।

—ঠিক। আমি এসে খিড়কী দ্বার উন্মুক্ত দেখলাম। নিজে সে দ্বার বন্ধ করে এসেছি। তুমি ভাগ্যবতী। তোমার বিশ্বস্ত সহচরী আছে।

—একটা মস্ত দুঃসাহসের কাজ করেছ তুমি রাজা। আমি প্রতি দণ্ডকে এক একটি যুগের মতো দীর্ঘ অনুভব করেছি। তুমি বুঝবে না আমার মনের সেই সংক্ষোভ।

কংস আবার অজস্র চুম্বনের ধারায় অস্তিকে নিমজ্জিত করে বললেন,—এছাড়া কোনো উপায় ছিল না।

—আমার কৌতূহল মার্জনা কোরো। কোথায় গিয়েছিলে, জানতে ইচ্ছে করে।

কংস এসে শয্যায় বসলেন। দুহাত বাড়িয়ে অস্তিকে কাছে নিলেন। তারপর তাঁর গন্তব্য এবং ক্রোধজিতের কথা বলে বললেন —এই নমুচিই আমার ভর্সা। কিন্তু তিনি আমার মন্ত্রীত্ব গ্রহণে রাজি হলেন না। বললেন, বিলম্ব হয়ে গেছে। তিনি গেছেন তোমার পিতার কাছে শূরসেনের সাহায্যের প্রত্যাশায়!

—পিতার কাছে?—অস্তি সবিস্ময়ে সরে বসলেন, তারপর বিমর্ষ হেসে বললেন, যথার্থ হিতৈষী তিনি তোমার। আমি বারবার অনুরোধ করেছিলাম···

—কিন্তু ক্রোধজিৎ আমার দূত হিসেবে যাননি, গেছেন শূরসেনের এক উদ্বিগ্ন সন্তান হিসেবেই। জানিনা, কতদূর সফল হবেন তিনি।

—পিতা আমার অবুঝ নন। তোমার মতো দম্ভসর্বস্বও নন, শূরসেনের বিপদের কথা শুনলে তিনি নিশ্চয় সাহায্য প্রেরণে কার্পণ্য করবেন না।

অস্তির তিরস্কার আজ আর বিদ্ধ করল না কংসকে। এটাই তাঁর পাওনা, এতোদিনে কংস যেন তা উপলব্ধি করেছেন। তবু প্রসঙ্গ পরিবর্তনের জন্যই বললেন,—আজ মন আমার বড় বিক্ষিপ্ত, রাণী। আজ আমি তোমার কাছে একটা অত্যন্ত গোপন কথা প্রকাশ করব। আমার মন বলছে, শত্রুরা হয়ত আমাকে হেয় করার জন্য এবার তাদের সেই চরমাস্ত্রও ব্যবহার করবে। আমার মাথা হেঁট করে দেবে সর্বসমক্ষে। আবার পায়ের তলার মাটি সরে যাবে। পাছে এমনটা হয় এজন্য তাদের কারোকে কখনো ঘাঁটাইনি আমি।

বিস্মিত দৃষ্টি মেলে নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকেন অস্তি।

—গোপন কথা?

—হ্যা। কৃতবর্মাকে বলতে গিয়েও বলতে পারি নি, জানাতে পারি নি নমুচিকেও। শুনলে হয়ত তাঁরাও আমাকে ঘৃণা করবেন। আমার সেই পরিচয় জানার পর তোমার পিতৃদেবের কাছে গিয়ে দাঁড়াবারও আমার আর মুখ নেই। সে পরিচয় জানলে তুমিও হয়ত ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেবে।

অস্তি অধৈর্য হয়ে ওঠেন। ব্যাকুল কণ্ঠে বলেন,—কংসকে যে ঘনিষ্ঠভাবে জানে, সে কখনই এমন শিশুর মতো সরল অথচ দুর্দমনীয় বীরের প্রতি মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারে না, স্বামী। বলো, আমাকে বলো, কী সেই গোপন কথা?

কংস কিছুক্ষণ নতমুখে বসে থেকে ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন,—আজ যদি শোনো রাণী, আমি উগ্রসেন-পুত্র নই, আমি তাঁর জারজ সন্তান; আমার মাতা পবনরেখা এক কামুকতাপূর্ণ দুর্বল মুহূর্তে মহাবল দ্রুমলিককে দেহ দান করায় আমার জন্ম, তবে, তবে কি আমায় তুমিও ঘৃণা করবে রাণী?

অস্তি দুহাতে দুই কান চেপে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন,—বন্ধ করো তোমার এই ক্লেদাক্ত কাহিনী। রাজমাতা পবনরেখার মতো সাধ্বী রমণী দেবকুলে তো দুর্লভই, আর্যাবর্তেও সুলভ নয়। শুনেছি, কুরুরাজ ভ্রাতা পাণ্ডুর মহিষী কুন্তীদেবী স্বামীর অক্ষমতার সুযোগে দেবগণের ঔরসে চার চারটি সন্তানের গর্ভ ধারণ করেন। শাস্ত্রমতে তিনটির বেশী ক্ষেত্রজ পুত্র গ্রহণ বিধিসম্মত নয়। যদি অসতীত্বের কালিমা এঁদের স্পর্শ করে না থাকে তবে প্রকৃত স্বামী-অন্ত-

প্রাণা রাজ-মাতা পবনরেখাকে শুধু শত্রুতে-গড়া কাহিনীর দ্বারা কলঙ্কিত করা যাবে কি ?

কংস বিভ্রান্ত চোখে তাকিয়ে বললেন,—না, রাণী ! এ সত্য কথা। স্বয় দেবর্ষি নারদ আমাকে একথা জানিয়েছেন।

—কে, কে জানিয়েছেন ?

—দেবর্ষি নারদ। তিনি পিতা উগ্রসেনের সভায় আগমন করতেন। আমার প্রতি স্নেহশীল ছিলেন। তিনিই আমাকে সাবধান করে দেন দেবকীর সন্তান থেকে আমার মৃত্যুর আশঙ্কা সম্পর্কে। আর আজ, সেই আশঙ্কাই সত্য হতে চলেছে শুনতে পেলাম, গোকুলে নন্দ গোপের আশ্রয়ে দেবকীর অষ্টমগর্ভের সন্তান কৃষ্ণ আমাকে নিহত করার জন্য দেবতাদের দ্বারা সুরক্ষিত হয়ে প্রস্তুত হচ্ছে।[১]

অস্তি নীরবে কিছুক্ষণ বসে রইলেন। তাঁর মুখে ঘোর অমানিশার ছায়া, কপালে চিন্তার রেখা, সর্বশরীরে অদৃশ্য কম্পন।

কিছুক্ষণ নীরব ধ্যানমগ্ন চিন্তার পর অস্তি তাঁর বুকে কংসের বিষাদাচ্ছন্ন মুখটি চেপে ধরে তাঁর কুঞ্চিত ঘন কেশরাজির মধ্যে অঙ্গুলী সঞ্চারণ করতে করতে বললেন, রাজা ! এক এক সময় মনে হয়, তুমি রাজকার্য ছেড়ে দার্শনিক হলেই ভালো করতে। এই শিশুসুলভ বিশ্বাস নিয়ে কেউ কি কুচক্রী রাজনীতির সঙ্গে সমানে সংগ্রাম করতে পারে ?

—কিন্তু রাণী ! সে সংবাদ একমাত্র নারদই জানেন, আর আমার কল্যাণার্থে তিনি তা প্রকাশ করেননি।

—না। মিথ্যা কথা !—অস্তি ক্রুদ্ধা সাপিনীর মতো শীৎকার-ধ্বনি-সহ তাঁর বক্তব্য দিয়ে আঘাত করলেন কংসকে। কংস বিদ্যুৎপৃষ্ঠের মতো অস্তির বুক থেকে মাথা তুলে বিস্ফারিত চোখে তাকালেন।

—মিথ্যা ?

—নিশ্চয় মিথ্যা। যদি রাজমাতা পবনরেখা একান্ত গোপনে মহাবল দ্রুমলিকের সঙ্গে মিলিত হয়ে থাকেন, যা কেউ জানল না, যে কৃতকর্মের ছায়া কখনো পবনরেখার মুখকে এক মুহূর্তের জন্যও কালিমালিপ্ত করল না, তবে সে সংবাদ দেবস্বার্থরক্ষক নারদ জানলেন কী করে ? তিনি কি দ্রুমলিকের আত্মার বন্ধু, নাকি পবনরেখার গুরুদেব ? এ তার শয়তানি। নারদের পূর্বাপর আচরণ বিশ্লেষণ করে দেখো, রাজা। সে তোমার মঙ্গল চায় না, অনিষ্টই চেয়েছে। তোমাকে বিভ্রান্ত করে তোমার মনোবল হরণ করাই তার নোংরা উদ্দেশ্য। তাই সে, দেবকী গর্ভজাতক

হবে তোমার মৃত্যুর কারণ, একথা বলে তোমাকে দিয়ে শিশুরক্তের হোলি খেলেছে। সেই পিশাচকে চিনতে তোমার এখনো দ্বিধা? শিশু হত্যার কালিমা লেপন করে জগদ্বাসীর চোখে সে তোমাকে হেয় করেছে। অথচ কৃষ্ণের গুপ্ত জন্ম ও বৃদ্ধির সংবাদ তোমাকে জানায় নি। দেবক বসুদেব ও দেবতাদের সঙ্গে যার ঘনিষ্ঠতা, কৃষ্ণের কথা সে জানে না, জানে, তোমার মাতার শয়নকক্ষের সংবাদ! ধিক্ এই ঋষিরূপী বর্বর পুরুষকে। আর ধিক তোমায়, তুমি সামান্য বুদ্ধি বিবেচনাও বিসর্জন দিয়ে মাতৃনিন্দা শুনেছ তোমার শত্রুর মুখে। যদি জানতাম, তুমি মাতা পবনরেখার ক্ষেত্রজ পুত্র তাহলেও আমার শ্রদ্ধা অটুটই থাকত। কিন্তু নারদবাক্যে তোমার অদ্ভুত আস্থা দেখে বস্তুতই আমার শ্রদ্ধা চঞ্চল হয়েছে, মহারাজ। আর কখনো এমন অসম্ভব, অলীক, অশ্রাব্য কথা বলো না। যে বলবে, তার শিরশ্ছেদ কোরো তৎক্ষণাৎ।

এক সঙ্গে এতোগুলি কথা বলে হাঁপাতে লাগলেন রাজমহিষী অস্তি।

কংস নির্বাক। অস্তির বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণ বিশ্লেষণ ও সক্রোধ সত্যভাষণে পুলকিত বিস্মিত ও চমকিত কংস স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। তারপর একটি শ্বাস মুক্ত করে বললেন,—বৃথাই ভেবেছি আমি বন্ধুহীন, মন্ত্রীহীন। রাণী, তুমিই আমার বাহু, আত্মা, চক্ষু। আমি তোমার মতো সম্পদ হেলায় ব্যবহার করি নি এতোকাল। এজন্য অনুতাপেরও আর সময় নেই। আমি বস্তুতই মূর্খ।

কংসকে দুর্বল হতে দেখে অস্তির দুই চক্ষু জ্বালা করে উঠল। চোখ ফেটে জল গড়িয়ে পড়ল দুটি মসৃণ স্বর্ণগণ্ড বেয়ে।

বললেন,—স্বামী, ধৈর্য ধরো। স্থিরভাবে রাজ্যের হাল ধরো। নিজেকে দুর্বল হতে দিও না। সমগ্র যাদবকুল তোমার দিকেই তাকিয়ে আছে। তাদের বিক্ষুব্ধ দাসত্ব থেকে উদ্ধার করো।

কংস কী যেন চিন্তা করছিলেন এবং আবারও নিস্তেজ ও নিষ্প্রভ হয়ে পড়ছিলেন। স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো অবোধ শিশু-সারল্যের সঙ্গে তিনি কিছুক্ষণ পর পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন,—কিন্তু রাণী বসুদেব আমার আশঙ্কা উপলব্ধি করে স্বয়ং পিতা হয়েও তার সন্তানদের একের পর এক আমার হাতে তুলে দিয়েছে। তার এই আত্মত্যাগের জন্য আমি তাকে বন্দী না করে রাজসভায় সসম্মানে স্থান দিয়েছি। নারদের অসৎ অভিপ্রায় থাকলে তিনি কি আমাকে দেবকীর সন্তানদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করার পরামর্শ দিতেন?

অস্তি আবার ফুঁসে উঠলেন,—তুমি সত্যাই কী বলত? শত্রুর ওপর এমন

বিশ্বাস নিয়ে কে কোথায় সিংহাসন টিকিয়ে রেখেছে। আমি কৃতবর্মা যে সন্দেহ করতে পারি, তোমার মনে তা একবারও উঁকি দেয় না। আমরা কি বারবার তোমাকে বলিনি, এটা তোমার ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য ঐ নির্দয় পিশাচদের পাতা একটা ফাঁদ। এতোদিন এ শুধু আমার সন্দেহ ছিল। তবু মনে দ্বন্দ্ব ছিল। কৃতবর্মা বলেছিলেন, বসুদেবের এই অদ্ভুত আচরণের আমি কোনো যুক্তি খুঁজে পাই না। দুনিয়ায় এমন কোন্ পাষণ্ড পিতা আছে যে নিজের পদমর্যাদা টিকিয়ে রাখার জন্য এবং নিজেকে বাঁচাবার জন্য পর পর তার ঔরসজাত সন্তানকে ঘাতকের হাতে তুলে দেয় সুস্থ মস্তিষ্কে। মানুষ পাগল হয়ে যায় এমন অবস্থায়। বসুদেব কিন্তু টনটনে জ্ঞান নিয়ে এর পরেও কুচক্রী রাজনীতি করে। এই ঘটনার নেপথ্যে নিশ্চয় আছে কোনো গূঢ় রহস্য। এমন কোনো ঘৃণ্য নৃশংস কাজ নেই যা দেবতারা তাদের স্বার্থ পূরণের জন্য করতে না পারে। আমিও সেই রহস্যের কোনো কূল-কিনারা দেখতে পেতাম না। কিন্তু তোমাকে বার বার অনুরোধ করেছি শিশু রক্তে তোমার হাত কলঙ্কিত না করতে। আজ বুঝছি, এই দেবতারা আর তাদের অনুগত দাসেরা সব রকম শঠতা ও ঘৃণ্যকাজ সত্যিই করতে পারে। আমার বিশ্বাস, ঐ শিশুরা দেবকীর গর্ভজাত সন্তানই নয়। যে সত্যই দেবকীসুত, সে হল কৃষ্ণ। তাই কৃষ্ণকে তারা সাবধানে রক্ষা করেছে।

বিস্মিত কংস কর্তব্যবিমূঢ়ভাবে স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকেন। তারপর দুহাতে তাঁর ঘনকেশ মুঠো করে চেপে ধরে চিৎকার করে ওঠেন,—মূর্খ! সত্যিই মূর্খ আমি। নির্বীর্য পাপিষ্ঠ বিশ্বাসঘাতক বসুদেবের কাছে আমি অসির আঘাতে নয়, কূটবুদ্ধির দ্বারা পরাজিত হয়েছি। আর সময় নেই, এখনি তাকে বন্দী করে কারাগারে নিক্ষেপ করব, তারপর তিলে তিলে মারব তাকে। শোধ তুলব শিশু হত্যার। রাক্ষসী দেবকীও পাবে উচিত শাস্তি।

কংস বেগে প্রস্থান করতে উদ্যত হলে অস্তি ছুটে গিয়ে দোর আগলে দাঁড়ান। বলেন,—অধীর হও না স্বামী। তোমার ক্রোধই তোমার শত্রু। শান্ত হয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ বিচার করো। যদি আপত্তি না থাকে, এসো, পরামর্শ করি। সংবাদ দাও কৃতবর্মাকে।

তখন রাত্রি গভীর ও নির্জন। মথুরার রাজপথ পথচারী পরিত্যক্ত। রাজ-মন্ত্রণার উপযুক্ত সময়। কংসের রাজপ্রাসাদে একে একে উপস্থিত হতে লাগলেন বিশিষ্ট সভাসদ্‌বৃন্দ।

এলেন অবসর প্রাপ্ত রাজা উগ্রসেন এবং কংসসভার বিশিষ্ট সম্মানিত সদস্য বসুদেব। কংস নিজে হাত ধরে নামিয়ে আনলেন সংসদের সর্বজন শ্রদ্ধেয় ওজস্বী বক্তা বৃদ্ধ অন্ধককে ; দানপতি অক্রুরকেও সহাস্য মুখে আহবান জানালেন দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে। সভায় নিজ নিজ আসন গ্রহণ করলেন যাদব কঙ্ক, সাত্যকি, দারুক, ভোজ বৈতরণ, বিকদ্রু, ভয়শঙ্খ, বিপৃথু। পৃথক সারিতে এসে বসলেন কৃতবর্মা, ভূরিতেজা ও ভূরিশ্রবা।

সকলকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে কংস বললেন,—সভার প্রতি কংস তার বিনীত অভিভাবদন জ্ঞাপন করে।

সঙ্গে সঙ্গে করতালিধ্বনিসহ সভাসদেরা কংসকে জানালেন প্রত্যাভিবাদন।

সভা শান্ত হলে কংস বললেন,—শূরসেনের মহা সংকটকাল উপস্থিত। এই সংবাদ পাওয়া মাত্র আপনাদের মূল্যবান উপদেশ গ্রহণ করার জন্য মধ্যরাত্রে সভা আহ্বানে বাধ্য হয়েছি। হে মহাত্মাগণ, আপনাদের স্নেহ ও আশীর্বাদের দ্বারা সেবক কংসের কল্যাণকারী উপদেশ দান করে আমাকে নিশ্চিন্ত করবেন, এই আমার সনির্বন্ধ প্রার্থনা।

অন্ধক দক্ষিণবাহু উর্ধ্বে তুলে বললেন,—সাধু! সাধু!

কংস উৎসাহ পেয়ে বলতে লাগলেন,—"আপনারা সমস্ত কার্যবিষয়ে অভিজ্ঞ, সকল বেদের পরিলিখিত বিদ্বান, ন্যায়োচিত ব্যবহারে কুশল, ধর্ম, অর্থ ও কামের প্রবর্তক, কর্তব্যসমূহের পালক…

"এই মহান যদুকুল যখন নিজের মর্যাদা…ভ্রষ্ট হয়, তখন প্রখ্যাত কীর্তিমান আপনাদের ন্যায় বীরগণই তাকে পুনরায় স্বীয় মর্যাদায় স্থাপিত করেন।

"আপনারা সকলেই সুযোগ্য পুরুষ এবং সর্বদা আমার মনের অনুকূল আচরণ করেন। কিন্তু এই সময় আপনারা বিদ্যমান থাকতেই আমার সঙ্কট বর্ধিত হচ্ছে, অথচ জানি না, আপনারা কেন তা উপেক্ষা করছেন।"

কংসের ভাষণ সভাগৃহের মৃদুগুঞ্জনে কিছুক্ষণের জন্য স্থগিত রাখতে হল। দেখা গেল সভাসদেরা পার্শ্ববর্তী সদস্যের সঙ্গে কংসের অভিযোগ নিয়ে নিম্নস্বরে আলাপ করছেন।

গুঞ্জনধ্বনি শুদ্ধ হলে কংস বললেন,—"ব্রজে কৃষ্ণ নামে নন্দ-গোপের এক পুত্র আছে, সে আমার মূল ছেদন করার উদ্দেশ্যে তৈরা হচ্ছে।

"আমার কোনো সুযোগ্য মন্ত্রী নেই। আমি আজ একাকী এবং আমার গুপ্তচররূপ তৃতীয় নয়নটিও অক্ষম হয়ে গেছে।..."

এ কথায় আবার গুঞ্জনধ্বনি এবং সদস্যবৃন্দের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দিল। বিশেষত বসুদেব তাঁর দুই পাশে এবং পশ্চাদ্বর্তী সদস্যদের সঙ্গে আলাপ করতে লাগলেন। রাজাকে উপেক্ষা করে অন্ধকের আসনের কাছে গিয়ে তাঁর পার্শ্ববর্তী শূন্য আসনে বসে পরামর্শ শুরু করে দিলেন।

অন্যদিকে কৃতবর্মাকে দেখা গেল উত্তেজিতভাবে অপর সদস্যদের কিছু বোঝাবার চেষ্টা করতে।

কংস সবই লক্ষ্য করলেন। তাঁর দৃষ্টি বসুদেবের আচরণের প্রতিই সমধিক নিবদ্ধ। অন্তরে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু বিশেষ প্রযত্নে নিজেকে শান্ত রাখারও প্রয়াস পাচ্ছিলেন। অস্তির অনুরোধ তিনি রক্ষা করবেন বলে মনে মনে স্থির করেছেন। তাই কারকে ক্ষুব্ধ না করার জন্য চেষ্টা করছেন, যদিও ব্যাপারটি তাঁর মধ্যে প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে।

সকলের আচরণ পরিমাপ করতে করতে তিনি বললেন,—"আমার এই দুর্ভাগ্য ও দুর্বলতার সুযোগে গোপকুলে কৃষ্ণ পরাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। তার বলবীর্যের আশ্রয় কি, আমি তা জানি না। কে তার পরিচালক, কোথায় সে পেয়েছে এই দুঃসাহস আর তাকে বশীভূত করারই বা কী উপায় আমি তাও জানি না।"...

বসুদেবের মুখে এই সময় এক ধরনের ব্যঙ্গের হাসি চকিতে দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। সে হাসি নজর করলেন শুধু মহাবীর কৃতবর্মা। লক্ষ্য করে তাঁর মুখের রেখা কঠোর হয়ে উঠল।

কংস বলছিলেন,—শূরসেনের হিতৈষী সদস্যগণ জানেন, মহাবীর কেশী ব্রজপুরে প্রশাসক নিযুক্ত আছেন। আমার আশঙ্কা, শীঘ্রই কেশী ও আমার ওপরও সুযোগমত কৃষ্ণ আক্রমণ রচনা করবে।

বসুদেব প্রমুখের সারিবদ্ধ আসনগুলি থেকে এই সময় সাত্যকির কণ্ঠস্বর শোনা গেল। সাত্যকি ব্যঙ্গমিশ্রিত কণ্ঠে বললেন,—ঐ অপদার্থ কেশী তবে ব্রজপুরে

প্রশাসকের গুরুত্বপূর্ণ আসনে এখনো সমাসীন আছেন কেন? তাঁর কি কেবল পুরবাসীদের ওপর অত্যাচার করাই কাজ? রাজাকে ব্রজপুরের সংবাদ জ্ঞাপনে ত্রুটির জন্য আমরা এখনই তাঁর পদচ্যুতি দাবি করি!

সভাগৃহে আবার গুঞ্জন শুরু হলে বিপরীত সারি থেকে কৃতবর্মা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—মহামান্য সদস্য সাত্যকি এবং তাঁর বান্ধববর্গ বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির পদচ্যুতি দাবি করা ভিন্ন আর কিছুই পরামর্শ হাজির করেন না যা রাজা ও জাতির উপকারার্থে লাগে। এখানে অবসরপ্রাপ্ত রাজা উগ্রসেন উপস্থিত আছেন। তিনি জানেন, কত সামান্য কারণে কোনো কোনো মান্যবর সদস্য একদিন চরপ্রধান ক্রোধজিৎ-কে পদচ্যুত করেছিলেন। জিজ্ঞাসা করি, সে কাজ কার স্বার্থ পূরণ করেছিল? ক্রোধজিতের অপসারণে গুপ্তচর বাহিনী কি হীনবল হয়নি? তাতে কি শূরসেনের স্বার্থ রক্ষিত হয়েছে? তাঁর পদচ্যুতির দ্বারা কেউ কেউ কি নিষ্কণ্টক হয়েছেন, এবং তাঁরাই কি পুনরায় মহাবীর কেশীকে সরাতে চাইছেন?

প্রতিবাদ উত্থাপিত হচ্ছিল; কৃতবর্মা কিন্তু নিরস্ত হলেন না। হাত তুলে বলতে লাগলেন,- কেশী একজন উদ্যমশীল পরাক্রান্ত পুরুষ। বিভিন্ন যুদ্ধে রাজা কংসের পাশে তাঁর উপস্থিতি শূরসেনের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। তিনি সৈনাপত্যে পারদর্শী। তাঁর কাছে গুপ্তচরবৃত্তির সাফল্য দাবি করা, হয় ভ্রান্ত, নয় উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। কেশীর অত্যাচারের সংবাদ যাঁরা রাখেন, আশ্চর্যের কথা, কৃষ্ণের উত্থানের সংবাদ তাঁরা রাজ দরবারে পেশ করেন না। সদস্যগণ এই বৈপরীত্যকে বিচার করে সমগ্র বিষয়টি বিবেচনা করবেন বলে আমি আশা রাখি। আজ বস্তুতই শূরসেনের ভাগ্যাকাশে ঘনকৃষ্ণ মেঘের আনাগোনা শুরু হয়েছে।

সভাগৃহ কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হয়ে রইল।

দেখা গেল, দানপতি অক্রূর তাঁর আসনে চঞ্চল হয়ে উঠেছেন, যেন তিনিই অস্বস্তি বোধ করছেন সবচেয়ে বেশি।

সত্যকি বললেন,—মাননীয় সদস্য কৃতবর্মা স্বভাবতই কোপন স্বভাব। তাঁর কাছ থেকে এর চেয়ে ভালো কথা শোনার প্রত্যাশা নেই। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, দায়িত্ব তবে কার?

নিঃসন্দেহে সাত্যকি ধূর্ত। তিনি একটি গোলমাল পাকাতে চাইছিলেন। তাঁর সেই মনোরথ পূর্ণ হল।

কৃতবর্মা কণ্ঠস্বর উচ্চে তুলে বললেন,—সে দায়িত্ব দানপতি অক্রূরের। তিনিই রাজার একান্ত সচিব। রাজাকে সমস্ত বিষয়ে অবহিত রাখার দায়িত্ব কি তিনি

অস্বীকার করতে পারেন? পদাধিকার বলে গুপ্তচরবৃন্দের দ্বারা সংবাদ সংগ্রহ তিনি না করলে আর কে করবে? ক্রোধজিতের পদচ্যুতির সময় তাঁর বক্তব্যই কি সর্বাপেক্ষা কার্যকরী হয় নি?

অক্রূর সাবধানী প্রাজ্ঞ রাজনীতিক। মধুর বাক্যের দ্বারা কংস তাঁর বশীভূত। তিনি উঠে দাঁড়ালেন। সভাসদগণের প্রতি অভিবাদন জানিয়ে রাজার মঙ্গল কামনা করে ধীরে ধীরে বললেন,—রাজা কোন্ সূত্রে সংবাদ পেয়েছেন আমি জানি না। কিন্তু শূরসেনেকে সুরক্ষিত রাখার জন্য প্রয়াস প্রযত্নের আমি অবশেষ রাখি না। আমি কখনো মনে করিনি, সামান্য গো-ব্রজ রাজায় বিপদের কারণ হতে পারে। হ্যাঁ; সংবাদ আমিও রাখি যে, কৃষ্ণ নামা জনৈক অদ্ভুতকর্মা তরুণ আজ গোকুলে বেশ বলবান ও নেতৃস্থানীয় পুরুষ হয়ে উঠেছেন। কিন্তু সে তো আমাদেরই আনন্দের কারণ। শীঘ্রই তাঁকে আমরা রাজরক্ষী বাহিনীতে গ্রহণ করলে শূরসেনের শক্তি বৃদ্ধি পাবে।

করতালি ধ্বনির সঙ্গে বসুদেবপ্রিয় সদস্যবর্গ, 'সাধু সাধু' শব্দে সভাগৃহে মুখরিত করে তুললেন।

কৃতবর্মা সরোষে বললেন,—রাজপুরুষ-হন্তারক হবে রাজরক্ষী বাহিনীর নেতা? চমৎকার। এরপর কি আমরা শুনব, বিষ্ণু হবেন শূরসেনের মাননীয় ভাগ্য-বিধাতা?

সভায় গুঞ্জন ও হাস্যধ্বনি শোনা গেল। শোনা গেল সাত্যকিরও কণ্ঠস্বর। তিনি বললেন,—রক্ষক না হয়ে রাজপুরুষ ভক্ষক হলে তার পরিণাম যে রমণীয় হয় না, ব্রজবাসীরা তারই জানান দিয়েছেন। কথাটা আশা করি মাননীয় কৃতবর্মা স্মরণে রাখবেন।

কৃতবর্মা বললেন,—অত্যাচারী রাজপুরুষের শাস্তি দেবেন রাজা, প্রজা নয়। শাস্তির দায়িত্ব যখন প্রজায় গ্রহণ করে তখন তাকে রাজ ভাষায় বলা হয়, বিদ্রোহ। মাননীয় সদস্য বিদ্রোহীর অনুকূলে বক্তব্য রাখছেন দেখে আমি বিস্মিত হচ্ছি।

এই যুক্তিপূর্ণ কথায় সাত্যকি ম্লান মুখে বসে পড়লেন। তাঁর আর বাক্যস্ফূর্তি হল না।

অবস্থার গতি মন্দ।

বসুদেব ব্যস্ত হয়ে অন্ধককে কিছু বলতে, সেই প্রবীণ সভাসদ বললেন,—এটা বিতণ্ডার সময় নয়। রাজা কংসকে তাঁর বক্তব্য শেষ করতে দেওয়া হয়নি। আমি তাঁকে আহ্বান জানাই। তিনিই বলুন, তাঁর কী বক্তব্য।

কংস বললেন,—মহাত্মন্! আমার মহৎ ভয়ের কারণ স্বয়ং বসুদেব। আমি তাঁকে বহু সম্মানে ও যত্নে রেখেছি, যদিও তাঁর বংশধর থেকে আমার বিপদের কারণ গণনা করে আমি দেবকী ও বসুদেবকে কারারুদ্ধ করতে চাই। তখন বসুদেব নিজে এক অদ্ভুত প্রস্তাব রাখেন। তা হল, যে ভয়ে আমি ভীত, তিনি নিজেই তার অবসান ঘটাবেন দেবকীর সন্তানদের নিহত করার জন্য আমার হাতে তুলে দিয়ে। মূর্খের মত আমি তার সেই প্রস্তাব গ্রহণ করি, কেননা তিনি বলেন, এর দ্বারা তিনি আদৌ বিচলিত নন, আমার প্রতি বন্ধুত্বকে তিনি শ্রেষ্ঠতর মনে করেন মনে করেন, আমি শুধু ভোজকুলবর্ধকই নই, আমি শূরসেনের শক্তি। সুতরাং আমার কল্যাণই জাতির কল্যাণ এবং সেজন্য তিনি তাঁর সদ্যোজাত শিশুকে হত্যায়ও বিচলিত নন।

কংসকে সমর্থন জানিয়ে কৃতবর্মা বললেন,—রাজার এই সারল্যপূর্ণ উক্তি সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য। যদি স্বেচ্ছায় পুত্রদের রাজকরে সঁপে দিতে বসুদেব অনভিলাষী হতেন, তবে তাঁকে আমরা রাজবিদ্রোহী রূপেই দেখতে পেতাম। সামান্য উৎপাত যদি কৃষ্ণকে রাজদ্রোহী করে থাকে, তবে অসামান্য এই কাজ বসুদেবকে করত উন্মাদ। আমরা কিন্তু তাঁকে এই মুহূর্তেও প্রশান্ত মুখে রাজ-হিতৈষী সদস্যের চরিত্রে দেখতে পাচ্ছি। এই অসম্ভব অচিন্তনীয় ব্যাখ্যার অযোগ্য ঘটনা আমাকেও প্রায়ই প্রশ্নাতুর করেছে। জানিনা, কোনো পাষণ্ডের পক্ষেও এমন কঠিন ব্রত পালন করে বন্ধুত্ব রাখা সম্ভব কি না।

এ প্রসঙ্গে বসুদেবকে নীরব দেখে অন্ধক বিরক্ত কণ্ঠে বললেন,—কৃতবর্মা! যথেষ্ট হয়েছে। তুমি এবার চুপ করো। আমরা কি জানি না, তুমি নিজে ভোজ বংশীয় এবং শূরসেনের কলঙ্ক জরাসন্ধ মিত্র ভীষ্মকই তোমার আদর্শ পুরুষ। ভীষ্মক, তুমি এবং কংস সকলেই ভোজকুল বিবর্ধক মহাবীর। কিন্তু তোমরা ভুলে যাচ্ছ, শূরসেন শুধু ভোজবংশীয়দেরই নয়, যদু, বৃষ্ণি, অন্ধক, কুকুর—এঁদেরও প্রেয় অপ্রেয় বিচারের বুদ্ধি আছে।

সভায় বৃদ্ধ অন্ধকের প্রতি উষ্ণ উক্তি করার সাহস কারও নেই। কৃতবর্মা কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব নরম করে বললেন,—ভোজবংশ থেকে যেমন মহাবল ভীষ্মক তেমনই দেবানুরক্ত কুন্তিভোজও আছেন। হে জ্ঞানবৃদ্ধ অন্ধক! যদুকুলে আজ অন্তর্বিরোধ ভয়াবহ আকার ধারণ করতে চলেছে। আমি আপনাকে সম্পূর্ণ দায়িত্বসহকারেই বলতে পারি যে সাধারণ মানুষ অহঙ্কারী ও অত্যাচারী পুরোহিত সমাজকে কিছুমাত্র সুনজরে দেখেন না। ঐ উপবীতধারী সম্প্রদায় নানা অনাচারে

লিপ্ত। তাছাড়া তাঁরা সর্বত্রই হিমালয়ের শক্তিকে সমতলের ওপর চাপিয়ে দিয়ে ভারতীয় রাজন্যবর্গের ওপর বহির্শক্তির দাপট প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট। জরাসন্ধ ভীষ্মক প্রমুখ চেয়েছেন বহির্শক্তির আগ্রাসনকে ঠেকাতে। আপনারাই বলুন, জরাসন্ধের মহাজোট আর্যাবর্তের কল্যাণকামী কি না? আর আমি একথাও ঘোষণা করতে চাই যে, যদি চক্রান্তকারীদের মাধ্যমে দেবতারা আবার শূরসেনকে গ্রাস করতে সচেষ্ট হন, তবে শূরসেনের জনগণ তা বরদাস্ত করবে না। শূরসেনের মানুষ দীর্ঘকাল গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় থেকে আর্যাবর্তের অন্যান্য রাজ্য অপেক্ষা অধিকতর ভাবে রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন হয়েছেন। তাঁদের ওপরে বাইরের শক্তিকে চাপিয়ে দিলে অবস্থা অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠবে, তার ধাক্কায় যদুবংশ ধ্বংস হয়ে যাবে। আমার বিনীত প্রার্থনা, আপনারা সেই অমোঘ অনিবার্য বিনাশের হাত থেকে শূরসেনকে রক্ষা করুন। হ্যাঁ, আমি ভোজকুল শিরোমণি ভীষ্মকের স্বদেশানুরাগে মুগ্ধ, একথা অকপটে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত নই। শূরসেনও রাজা কংসের সুযোগ্য নেতৃত্বে মহাজোটে সামিল হবেন বলে আমি আশা করব। এর ব্যতিক্রম যেখানে সেখানেই চক্রান্তের বাস্তু সাপ কুণ্ডলীকৃত হয়ে আছে।

কৃতবর্মার বক্তব্য শেষ হওয়ামাত্র বসুদেবের নেতৃত্বাধীন সভাসদবর্গ উঠে দাঁড়িয়ে সমস্বরে বলতে লাগলেন,—পূজ্যপাদ বৃদ্ধ অন্ধকের অনুরোধ যে সভায় কৃতবর্মার মত অর্বাচীন ও অল্পবিদ্যর দ্বারা উপেক্ষিত হয়, সে সভা আমরা বর্জন করছি।

একথায় সভাগৃহে গুরুতর বিতণ্ডার সূত্রপাত ঘটল। অন্ধক উগ্রসেন প্রমুখ বার বার হাত তুলেও সেই বিক্ষোভকে প্রশমিত করতে সক্ষম হলেন না।

কংস এতোক্ষণ নীরবে সব কিছু শুনছিলেন ও লক্ষ্য করছিলেন, এখন তিনি উঠে দাঁড়িয়ে দুহাত তুলে পারিষদবর্গকে থামিয়ে দিলেন, বললেন,—হে প্রাজ্ঞ সভাসদ্গণ! জ্ঞানী সভার উদ্দেশ্যই হল, মত বিনিময়। সভায় আপনারা মন খুলে যত স্পষ্ট ভাবে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করবেন, ততই তা দেশের মঙ্গলের কারণ হবে। হবে ভুল বোঝাবুঝির অবসান। সভার উদ্দেশ্য বিতণ্ডায় শেষ হলে সেই সভা ব্যর্থ। সভার উদ্দেশ্য হল, সমস্ত মতবিরোধ খণ্ডন করে অথবা তারই নির্যাসে একটি মতৈক্যে উপনীত হয়ে জাতির হিতকারী পন্থা নির্ণয় করা। বিতণ্ডায় এখানে জয় বা পরাজয় নিতান্তই মূল্যহীন। কারণ এ সভা দল বা ব্যক্তির মর্যাদা প্রতিষ্ঠার মঞ্চ নয়। এ সভা সমগ্র জাতির ভাগ্য নির্ধারণের গুরুতর দায়িত্ব বহন করছে। এখানে প্রত্যেকে অবাধে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করলে তার দ্বারা জাতির

মনোভাব সুস্পষ্ট আকৃতি নেয় এবং আমি সেই আকাঙ্ক্ষাকে বেতনভোগী দাসের মত পালন করে জাতীয় আকাঙ্ক্ষার রূপায়ণে সর্বশক্তি নিয়োগ করে ধন্য হতে পারি। আপনারা বিতর্কের দ্বারা আমাকে উপযুক্ত পথ নির্দেশ করুন। বিতর্কের দ্বারা বিদ্বেষকে প্রজ্বলিত করবেন না। তা করা হলে এই সভা আহ্বান নিরর্থক, জনগণের কষ্টার্জিত ধনের অপচয় মাত্র।

কংসের কথায় আবার সভাস্থল সাধুবাদে মুখরিত হল। উত্থিত সদস্যরা হেঁট মুণ্ডে আসনে বসে পড়লেন। তাদের মুখ লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল।

কংস সুবক্তা। এই তরুণ নেতা রাজনীতির কুটিল আবর্তে তেমন জুৎ পান না বটে, কিন্তু ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করে দেশবাসীকে জাতীয়তা বোধে তিনিই উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। বীরত্বে সাহসিকতায় ও রণকৌশলে তিনি অতুলনীয়। এই গুণের সমাবেশই তাঁকে রাজপদে আরোহণে সহায়তা করে। কৃতবর্মা প্রমুখেরা সমবেত হন বিষ্ণুবিরোধী এই তরুণ অ-সুর নেতার পতাকাতলে। বসুদেব কংসকে তাই এক কথায় তাচ্ছিল্য করতে পারেন না। তিনি জানেন, শূরসেনেব মানুষ কংসকে সুরক্ষক বলেই মনে করে।

কৃতবর্মা আজকের সভায় বসুদেবের মস্তবড় একটি চক্রান্ত ফাঁস করে দিলেন। বসুদেব কর্তৃক নিজের সন্তানগুলিকে কংসের হাতে তুলে দেওয়ার খেলার পেছনে যে একটি কুটিল রাজনৈতিক মতলব ক্রিয়াশীল, কৃতবর্মা তার আভাস দিয়েছেন।

বসুদেব দেখলেন, কৃতবর্মা ও কংসের বক্তৃতায় অন্ধক স্নায়ু চাপ অনুভব করছেন। তাঁকে কিঞ্চিত অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে। সর্বনাশের লক্ষণ যেন ফুটে উঠছে। বসুদেব তাড়াতাড়ি অন্ধকের পাশে এসে নিচু স্বরে বললেন,—শ্রদ্ধেয়! আপনার অবমাননায় আমরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ, যদি আদেশ করেন, এই মুহূর্তে কৃতবর্মার মাথা আপনার চরণ যুগলে স্থাপন করে তার ঔদ্ধত্যের জবাব দেয় সাত্যকি। অপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করুন।

অন্ধক এই পূজায় আত্মপ্রসাদ লাভ করলেন। ভুলে গেলেন বসুদেবের কৃতকর্মের কথা যা কৃতবর্মা বলায় তিনি শুধু আশ্চর্য নন, মনে মনে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন বসুদেবের ওপর। ছি, ছি, ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা এমনই উৎকট যে বসুদেব স্বেচ্ছায় তাঁর সন্তান তুলে দিয়েছে ঘাতকের হাতে! এমন সব মানুষ ক্ষমতা পেলে দেশের একটি শিশুর জীবনও তো আর নিরাপদ থাকবে না। কিন্তু বসুদেবের পূজায় সন্তুষ্ট অন্ধক এবার নতুন যুক্তিতে মন ভেজালেন।

মনে মনে নিজেকে বললেন, কিন্তু বসুদেবেরই বা উপায় কি? নিজের ও দেবকীর জীবন রক্ষার্থে সে বাধ্য হয়েছে এই নির্মম কাজে। আসলে শিশু তো ক্ষেতের ফসল। ক্ষেত অবিনষ্ট থাকলে ফসল ফলবেই। দেবকী বসুদেবের বয়স পালিয়ে যায়নি। তারা বেঁচে থাকলে সন্তানের অভাব হবে না। বেচারা বসুদেব হয়ত একথা ভেবেই কাজ করেছে, প্রতীক্ষা করছে কংসর চরম পতনের জন্য। কংস নিজেকে নিরাপদ করতে শিশু হত্যা করছে। সে পাপও তো কম নয়।

এইসব ভাবতে খুব অল্প সময়ই লাগল অন্ধকের। তিনি দেখলেন রাজসভায় এখন বিপর্যস্ত অবস্থা। বিতর্ক ও দলাদলি প্রকট রূপ নিচ্ছে।

একবার বসুদেবের কাতর মুখের দিকে তাকালেন। বড় ভাবলেশহীন ঐ মুখ। বড় বিনয়ী এই দেবক জামাতা। সব সময়ই যেন অবনত হয়ে আছে। কখনো পায়ের তলায় ছাড়া বসে না। সে কী কংসকে ভয় পাচ্ছে। আজ তার স্বরূপ উদ্ঘাটিত। সে কী মৃত্যুর আশঙ্কা করছে। না, না, আশ্রিতকে আশ্রয় দান না করে অন্ধক কি তাকে কংসর হাতে তুলে দেবেন? দিয়ে লাভ? ঐ দুর্বিনীত কৃতবর্মারা কি বসুদেবের মতো তাঁকে পাত্তার্ঘ্য দান করবে?

অন্ধক সভার উদ্দেশ্যে বললেন—রাজকার্যে বার বার বিঘ্ন সৃষ্টি করে কৃতবর্মা সভার উদ্দেশ্যকেই পণ্ড করে দিচ্ছে। আমি মনে করি, তার সভাস্থল ত্যাগ করাই উচিত। অন্যথা আমাদের পক্ষে এ সভায় উপস্থিত থেকে অর্বাচীনের বক্তৃতা শোনার মতো ধৈর্য ধারণ করা কঠিন। এ বিষয়ে কংস ব্যবস্থা গ্রহণ করলে তবেই আমি আছি, নাহলে আমাকে প্রস্থান করতে হবে।

অন্ধকের কথায় সভা স্তব্ধ হয়ে গেল। অনেকেরই মনে পড়ল ঠিক এমনি আর একটি নাটকের কথা। সেদিন ক্রোধজিৎ বিতাড়িত হয়েছিলেন যদুসভা থেকে।

কংস দূর থেকে অসহায় ভাবে কৃতবর্মার দিকে তাকালেন। কৃতবর্মার মুখে তিনি লাঞ্ছিত ক্রোধজিতের মুখাবয়ব দেখতে পেলেন। কিন্তু কী অক্ষম আজ তিনি। শূরসেনের দ্বারদেশে তাঁর মৃত্যুদূত দাঁড়িয়ে। রাজসভায় দেবক গোষ্ঠীরই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত। মহামন্ত্রী অক্রুর নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছেন। একটি কথাও তিনি উচ্চারণ করেন নি রাজার পক্ষে। বন্ধু কি শুধু কৃতবর্মা? কিন্তু তাঁর সম্মান আজ কংস কীভাবে রক্ষা করবেন। এই সভাকে তিনি স্বমতে আনতে চেয়েছিলেন। কৃতবর্মা কীসব গোলমাল পাকিয়ে দিল। হায়, সময় যখন মন্দ, তখন এমনি ভাবেই সব কিছু তালগোল পাকিয়ে যায়।

কৃতবর্মা একবার কংসর দিকে তাকালেন। মুখের কোণে বিদ্রূপের ঝিলিক। কিন্তু তা কার প্রতি ? কংসর নীরবতায় তিনি কি ক্ষুব্ধ ?

কিন্তু হায় কৃতবর্মা! আমি কী করব ? কী আমার করার আছে ? এই মুহূর্তে আমি কি নিজেকে প্রকাশ করতে পারি ? কৃতবর্মা, বন্ধু আমার, আমাকে ক্ষমা করো! আমাকে বুঝতে চেষ্টা কর, ভাই।—

কৃতবর্মা যেন শুনতে পান শৃঙ্খলিত এক সিংহের দীর্ঘশ্বাসের নিঃস্বন। তিনি ধীরে ধীরে আসন ত্যাগ করে কংসের প্রতি অবনত অভিবাদন জানিয়ে সভাস্থল থেকে বেরিয়ে যান।

কৃতবর্মা নিষ্ক্রান্ত হলে হৃষ্টমুখে উঠে দাঁড়ালেন বসুদেব। মনে মনে তিনি এখন বিজয় গর্বে অত্যন্ত পুলকিত। তাঁর উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। আর একটু বাকি। এখন প্রয়োজন শুধু কংসকে উত্তেজিত করে তার মনোগত অভিলাষ জেনে নেওয়া। তরুণ কংস বলদর্পী। তাকে খেলানো প্রাজ্ঞ রাজনীতিক বসুদেবের পক্ষে কঠিন নয়। রাজনীতির তালিম বসুদেব গ্রহণ করেন স্বয়ং বিষ্ণুর কাছে।

উঠে দাঁড়িয়ে বসুদেব কংসর অন্তরের সবচেয়ে ব্যথার স্থানে হাত দিয়ে বলেন, কংস! তোমার প্রতি বন্ধুত্বই আমাকে আমার পুত্রশোক ভুলিয়ে দিয়েছে। তোমার জীবনের মূল্য আমি সবচেয়ে বড় করে গণনা করি। কৃতবর্মা বিভেদের রাজনীতিকে আমাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করছিল।

বসুদেব ফাঁদ পাতেন আর কংস তাতে ধরা দেন। এমন একবার নয় বার বার ঘটেছে। তবু কংস সময়কালে নিজেকে সংযত করতে শেখেন নি। বসুদেবের কথায় যে আত্মপ্রসাদ প্রকাশিত হল, তা কংসের বুকে ব্যঙ্গের শাণিত শলাকার মতো বিদ্ধ হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, কথার ছুরিকায় বসুদেব যেন রসিয়ে রসিয়ে কংসের হৃদপদ্ম থেকে একটি একটি করে পাপড়ি কেটে ফেলছেন আর মনে মনে মহা উল্লাসে অট্টহাস্য করছেন।

কংস ভুলে গেলেন কোন্ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সফল করার অভিপ্রায়ে তিনি তাঁর পরম হিতৈষী বন্ধু কৃতবর্মার অপমানকেও এই মুহূর্তকয় আগেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও উপেক্ষা করেছেন। বসুদেবের প্রতি আরক্ত নয়নে তাকিয়ে কংস তাঁর মনের তীব্র ঘৃণা উদ্গার করে বলে ফেললেন,—দক্ষ অভিনেতা বসুদেব! তোমার মুখে বন্ধুত্বের বাণী বড় বিচিত্র শোনায়!

বললেন,—"বসুদেব! তুমি এই কুলের কাল স্বরূপ। নিজের বিনাশের

জন্যই বুঝি তোমাকে সম্যকভাবে জানার পরও আমি পালন-পোষণ করেছি। কিন্তু তুমি? তুমি আমার সঙ্গে গুরুতর বিরোধ শুধু বর্ধিত করেই এসেছ।

"মূঢ়! তুমি অমর্ষশীল। তোমার স্বভাব শঠতায় শত্রুতায় পূর্ণ। তোমার বুদ্ধি পাপাসক্ত। তুমি এই যদুকুলের অবস্থা শোচনীয় করে তুলেছ। তোমাকে পুরস্কৃত করার সব প্রয়াস আমার বৃথা গেছে।....

"তোমার স্বভাব ক্রূর।...

"আমি তোমাকে বিশ্বাস করেছিলাম; কিন্তু তুমি আমার সর্বনাশই শুধু কামনা করেছ।..."

কংস ক্রোধকম্পিত স্বরে সভাসদদের উদ্দেশ্যে বলতে লাগলেন,—আপনারা শুনুন ঐ কপটাচারীর কীর্তি! বসুদেব যাদবকুলের বিনাশের জন্য সব আয়োজন পাকা করে ফেলেছেন। সম্প্রতি আমি খট্বাঙ্গবনে ঋষি নমুচির সঙ্গে মিলিত হই। তিনি আমাকে বসুদেবের চক্রান্তের সংবাদ দেন। তিনি যা বলেছেন, আমি তা নিবেদন করছি! তিনি বলেন:

"কংস! তুমি যে দেবকীর গর্ভ নষ্ট করিয়া দিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিয়াছ, তোমার সেই কর্মকে রাত্রিকালে বসুদেব নিষ্ফল করিয়া দিয়াছে।...

"তোমার মিত্ররূপধারী শত্রু বসুদেব রাত্রিকালে ছলপূর্বক তোমার বধের জন্য দেবকীর পুত্রের সঙ্গে যশোদার কন্যাকে পরিবর্তন করিয়া দিয়াছে।"[১]

কংস যখন সক্রোধে কথাগুলি বলছেন তখন বসুদেব তাঁর এক পার্শ্বচরকে নিম্নস্বরে কিছু বলায় সে তাড়াতাড়ি উঠে সভার বাইরে চলে গেল। দেখা গেল, একই সময় কৃতবর্মা যাঁদের সঙ্গে বসেছিলেন, তাঁদের মধ্য থেকেও জনৈক ব্যক্তি সকলের অলক্ষ্যে সভাস্থল ত্যাগ করছেন।

কংস বলছিলেন,—আমি নিজের প্রাণ রক্ষার্থে এবং শূরসেনের মঙ্গলের জন্য একরকম বসুদেবের দ্বারা প্ররোচিত হয়েই নরাধমের মত শিশুরক্তে এই দুই হাত কলঙ্কিত করেছি। আজ বুঝি, এই কাজের পেছনে বসুদেবের উদ্দেশ্য ছিল জনগণের সামনে আমাকে পিশাচ মূর্তি রূপে খাড়া করা। প্রচারের অপূর্ব কলা, সন্দেহ নেই। আমার তাই সন্দেহ, বস্তুতই কি ঐ শিশুগুলি ছিল বসুদেবের ঔরসজাত এবং দেবকীর গর্ভসম্ভূত? সন্দেহের যথেষ্টই কারণ আছে। বসুদেবের সন্তান-ভ্রমে আমি পর পর ছটি শিশু ও একটি কন্যাকে হত্যা করিয়েছি। তার জন্য প্রতি রাত্রি আমি অনুতাপে বিদ্ধ হই

এবং দুঃস্বপ্ন দেখি। অথচ ঐ নির্মম বসুদেব অম্লান, তিনি শিশুহত্যা বিষয়টিকে রাজনৈতিক পাশার চাল হিসেবে ব্যবহার করে পরিতৃপ্ত। হয় তিনি জগতের সবচেয়ে হৃদয়হীন পিতা, নয় ক্ষমতালোভী পাষণ্ড।

গোপরাজ নন্দ বসুদেবের ওপর পরম আস্থাশীল। তাঁরা আবাল্য বন্ধু। বসুদেব সেই বন্ধুকে প্রতারণা করে নন্দপত্নী যশোদার একমাত্র কন্যাকে নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মৃত্যুর হাতে সঁপে দিয়ে সেখানে তাঁর নিজের সন্তানকে রেখে এসেছেন! জগতে এমন চক্রান্তেরও তুলনা নেই। পরম যত্নে বন্ধুবৎসল নন্দ এবং নন্দজায়া কৃষ্ণকে পুত্রজ্ঞানে লালন-পালন করেছেন। বসুদেব অতঃপর সেই পবিত্র বন্ধুত্বের পুরস্কার স্বরূপ তাঁদের বুক থেকে কৃষ্ণকে ছিনিয়ে আনবেন মথুরার সিংহাসন অধিকার করার জন্য! কিন্তু তাঁর সেই সযত্ন লালিত বাসনা পূর্ণ হবে না। যাদবেরা ঐ খল কপটাচারী ক্ষমতা-লোলুপকে শূরসেনের ভাগ্যবিধাতা হিসেবে নিশ্চয় মেনে নেবেন না, জনগণই বিচার করবেন। এখন আপনারাই বলুন, শিশুঘাতক কে, আমি? নাকি, আমাকে যিনি শিশুহত্যায় প্ররোচিত করে রাজনৈতিক চক্রান্তকে দানা বাধিয়ে তুলেছেন : শিশু ঘাতক তিনি?

কংসের ভাষণে সভাস্থল চাপা বিতর্কে গুঞ্জরিত হতে থাকল। বিভিন্ন কোন্ থেকে সভাসদেরা বলে উঠলেন, ধিক ধিক!

দেখা গেল বসুদেব তেমনিই অবিচলিত। তিনি নিম্নকণ্ঠে অন্ধকের সঙ্গে জরুরী আলাপ করছেন।

বসুদেব নিচুস্বরে অন্ধককে বললেন—নিজের পাপ আবৃত করার জন্য কংস যা বলছে এবং আমাকে যেভাবে অপমান করছে, আপনি তার জবাব দিন। মনে রাখবেন, কংসের আয়ু সীমিত। আমরা যতক্ষণ সভা করছি, ততক্ষণে শূরসেন কংস বিরোধী শক্তির দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়েছে চতুর্দিকে। কংসের এটাই শেষ ভাষণ।

অন্ধক বৃদ্ধ হয়েছেন। রাজনীতির পঙ্কিল স্রোতধারা যে কত অভাবিত পথে প্রবাহিত হতে পারে তা তিনি জানেন। কংসের বক্তব্যকে তাই তিনি ভিত্তিহীন বলেও ভাবতে পারছেন না। বস্তুত, একথা তো খুবই সত্য যে, একটি একটি করে ছয়টি সন্তান কংসের হাতে তুলে দিয়ে বসুদেব কখনো বিষাদে ভেঙে পড়েন নি। বরং প্রতিবারই তাঁকে এবং তাঁর অনুচরবৃন্দকে তৎপর হয়ে শুধু কংসর বিরুদ্ধে প্রচার চালাতেই দেখা গেছে। ইনি শুধু অপেক্ষা

করেছেন উপযুক্ত অবসরের জন্য। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সন্তানের পিতামাতা কি এমন অবস্থায় উন্মাদ না হয়ে স্থিরভাবে নিপুণ রাজনীতি করতে পারে! অন্ধক মুগ্ধ হয়ে গেছলেন কংসর ভাষণে। বলতে কি বসুদেবের প্রতি ঘৃণা ও বিবমিষায় এই মাত্র তাঁর মনও পূর্ণ হয়েছিল। এখন বসুদেবের নিষ্কম্প কণ্ঠস্বরে তিনি বিস্ফারিত নেত্রে এই অদ্ভুত কুচক্রী মানুষটিকে দেখলেন। মনে হল, ক্রূর হাস্যে বসুদেবের মুখ যেন উদ্ভাসিত। তাঁর বাক্যের প্রতিটি শব্দ যেন নিরেট পাথরের মতো রসহীন। তাঁর স্থির চোখের তারা দুটি যেন অতলগর্ভ দুটি অন্ধকার কূপ, যে কূপতল থেকে উঠে আসছে অজ্ঞাত অশরীরী আত্মার অমোঘ আদেশ। সে আদেশ বলছে, কংসর দিন শেষ। হে বৃদ্ধ অন্ধক, এখন তুমি সমস্ত তর্কবিতর্ক ভুলে বেছে নাও তোমার আপন মঙ্গল অথবা অমঙ্গলকে। দোলাচল চিত্ততায় আর সুযোগ নেই। হয় বসুদেবের পক্ষে ভাষণ দিয়ে নিজেকে ও তোমার পরিবারকে সমৃদ্ধ করার সুযোগ নাও। নতুবা কংসের সঙ্গে, মূর্খের মতো আলিঙ্গন কর মৃত্যু। শূরসেনে আজ সেই মৃত্যুর ঘণ্টা বাজছে। সে শব্দ ধ্বনিত হচ্ছে বিষ্ণুস্তাবক দেবকজামাতা বসুদেবের কণ্ঠে।

অন্ধক শিহরিত হলেন। তারপর গলা পরিষ্কার করে কংসর উদ্দেশ্যে বলতে শুরু করলেন,—পুত্র! তুমি যে দীর্ঘ সময় ধরে ভাষণদানের কষ্ট স্বীকার করলে, তা ব্যর্থ হল, কেননা নিন্দাবাদ করতে গিয়ে তুমি নিজেই নিন্দনীয় হয়েছ। তোমার এই উত্তেজিত নিন্দাপূর্ণ ভাষণ প্রকৃতপক্ষে কোনই কার্যসিদ্ধি করতে পারে নি, তোমার স্বরূপই উন্মোচিত করেছে, তোমার গোপনতম স্থল উন্মুক্ত হয়ে গেছে সর্বসমক্ষে।

অন্ধক একবার কংস এবং একবার বসুদেবের মুখের দিকে তাকালেন। কংসের মুখ কিছুটা রাগত, কিছুটা অনুতপ্ত। বসুদেব সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছেন, বুঝতে চেষ্টা করছেন অন্ধক-ভাষণের গতি-প্রকৃতি। কেননা তাঁর সন্দেহ, ভর্ৎসনাচ্ছলে অন্ধক কংসকে সাবধান করে বলতে চাইছেন, উত্তেজিত ভাষণের দ্বারা কংস রাজ্যের গোপন রাজনৈতিক ঘটনাবর্ত ফাঁস করে বসুদেবকেই সতর্ক করে বসেছেন। ফলে তাঁর সেই ভাষণ ব্যর্থ হয়ে গেছে। রাজার উপযুক্ত কাজ তিনি করেন নি। রাজা হিসেবে কংসের উচিত ছিল সভা ডেকে বসুদেবকে সতর্ক করার আগে নিজেকে সুরক্ষিত করার উপায় চিন্তা করা। শত্রুকে এভাবে সতর্ক করে দেওয়া রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচায়ক ন।

বসুদেব সুতরাং কঠিন চোখে বৃদ্ধ অন্ধকের প্রতি নীরব শাসানি প্রদর্শন করলেন।

সচেতন হয়ে অন্ধক তাঁর বক্তব্যকে মোচড় দিয়ে ঘুরিয়ে নিলেন, বললেন,—কংস, তুমি যাদের শাসক, সেই বৃষ্ণিবংশীয়গণ আদর ও প্রশংসার যোগ্য নন।… আমার দৃষ্টিতে উগ্রসেনও ব্যর্থ, কেননা সে তোমার মতো অপরিণামদর্শীর জন্ম দান করেছে।… তাত! তুমি যদুবংশে নিন্দনীয় হলে। তোমার মতো মূর্খ অবিবেকী বালক আজ যাদবগণের শাসক হওয়ায় কুলনাশ আসন্ন হয়ে পড়েছে। ··

অন্ধক শ্বাস গ্রহণের জন্য ভাষণের মধ্যে সামান্য বিরতি টানলেন। সভা শবাধারের মতো স্তব্ধ। কংসের আনন বিমর্ষ। বসুদেবের ভ্রূদ্বয় এখনও সন্দেহ কুটিল।

অন্ধক বললেন,—যিনি আত্মোন্নতির পথে অগ্রসর, জিতেন্দ্রিয় ও বিবেকশীল বিদ্বান্, সেই পুরুষের আচরণীয় পথই অনুসরণ করা উচিত। তাত! তুমি অহঙ্কারবশত কিছুই কর নি, পরন্তু আয়াসে সিংহাসনে বসে অহঙ্কার সর্বস্ব মর্মভেদী বাণী উচ্চারণ করে তেজস্বী পুরুষগণকে পীড়িত করেছ। মন্ত্রের উচ্চারণ না করেই আহুতি প্রদান করলে যেমন তা ব্যর্থ হয়ে যায়, তোমার এই আক্ষেপোক্তিও তেমনি নিষ্ফল হয়ে গেছে…

বাসুদেব নিচুস্বরে বললেন,—হে জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ। আপনিও কি বৃথা প্রলাপ করে কংসকে রাজনৈতিক মন্ত্রণা দান করছেন না! আপনি কি তার হিতৈষী মন্ত্রী? একথা আগে জানলে·

অন্ধক বিরক্ত হলেন। বললেন,—অধৈর্য হও না বসুদেব। আজ কংস ইষ্ট আনষ্টের বহির্ভূত। শত উপদেশও বর্তমান সংকটকালে তাকে রক্ষা করতে পারবে না। গোপন করি না, কংস যাদবগণের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করে যদুশক্তি বৃদ্ধি করায় আমার মতো বহু শূরসেনীই তার প্রতি স্নেহ পোষণ করে। তুমি জানো তা মিথ্য নয়। আর সেজন্যই তার বিনাশের জন্য তুমি সরাসরি কোনো পথ অবলম্বন করতে পার নি। কংসের রাজনৈতিক মূর্খতা তোমাকে মস্ত সুযোগ করে দিয়েছে মাত্র। তার অন্তিম সময়ে তার পতনের কারণটুকু ইঙ্গিতে আমি তাকে জানাতে চাই। সে এটাও জেনে যাক, সে ছিল আমাদের স্নেহে সমৃদ্ধ, কিন্তু নিজের মূর্খতায় আজ সে সব হারালো। এটুকুই হোক তার সান্ত্বনা এবং এই বৃদ্ধ বয়সে আমারও সান্ত্বনা। সে যেন মনে না করে যে, আমিও একজন ষড়যন্ত্রী।

ক্ষুব্ধ বসুদেব চাপা স্বরে বললেন—হে বিবেকবান বৃদ্ধ! আপনার মনে যদি এই ছিল তবে আমাদের সঙ্গে একত্রে আসন গ্রহণ করেছিলেন কেন?

এবার অন্ধকও রুষ্ট কণ্ঠে বললেন,—অত অধৈর্য হও না বসুদেব! আমাকে তুমি যেভাবে ব্যবহার করতে চাও আমিও সেভাবেই ব্যবহৃত হব, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে আমাকে সেই কাজটা আমার মতো করেই করতে দাও। বিধাতা জানেন, আমি আজ কতদূর নির্মম ও নিষ্ঠুর হতে পারব! পাপ আমাকে দেহে ও আত্মায় বেষ্টন করছে।

অন্ধক আর গ্রাহ্য করলেন না বাধাদানকারী বসুদেবকে।

বললেন,—পুত্র কংস! পুত্র যদি ক্রূর স্বভাবেরও হয়, পিতা তার প্রতি কখনো কঠোর হতে পারেন না, বরং পুত্রের জন্যই পিতারা অনেক কষ্টদায়ক বিপদ আলিঙ্গন করে থাকেন। বসুদেব যদি তাঁর পুত্রকে গোপনে রক্ষা করে থাকেন, তবে তা অনুচিত কিছু হয় নি। বসুদেবকে নিন্দা করে তুমি এখন শত্রুতা বৃদ্ধি করলে।

একটু থামলেন বৃদ্ধ অন্ধক। সবচেয়ে কঠিন ও রূঢ় কথাটি বলার জন্য নিজেকে যেন প্রস্তুত করে নিলেন। তারপর কংসের বিষণ্ণ এবং বিস্মিত চোখের ওপর থেকে চোখদুটিও সরিয়ে নিলেন, কেননা তরুণ বীরের সেই বিমূঢ় দৃষ্টি তিনি সহ্য করতে পারছিলেন না। মনে হচ্ছিল, তাঁর সামনে যেন একটি পুষ্পিত মহীরুহ মূলসুদ্ধ ধীরে ধীরে অবলম্বনচ্যুত হয়ে খসে পড়ছে। অন্ধক প্রমুখ যে উত্তুঙ্গ পর্বতমালার মৃত্তিকাস্তর অবলম্বন করে কংসবৃক্ষ তার শাখা-প্রশাখা বিস্তারিত করেছিল, সেই বিশ্বস্ত ভূমিকে আঁকড়ে ধরার ব্যর্থ চেষ্টা করে সক্ষোভে ও সশব্দে ভেঙে পড়ছেন সরল-বিশ্বাসী ভোজবংশ বিবর্ধক কংস।

দৃষ্টি নমিত করে অন্ধক বলছিলেন,—হে দুর্ভাগ্য আমন্ত্রক কংস! তোমার প্রতি আমাদের যে স্নেহ ছিল, আজ তা আমরা পরিত্যাগ করলাম। তুমি নিজের বংশের অহিতকারী, সেজন্য আর মুহূর্তমাত্র তোমার পাশে আমাদের থাকা সম্ভব নয়। তোমার জন্যই আজ যদুবংশের মূল ছিন্ন হয়ে গেল। এখন ব্রজপুর থেকে শ্রীকৃষ্ণ এসে সমগ্র শূরসেনকে একত্রিত করে তাঁদের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করবেন।

বিমূঢ় কংস নির্বাক। তিনি দেখলেন, বৃদ্ধ অন্ধক তাঁর পার্শ্বচরের কাঁধে হাত রেখে আসন ত্যাগ করে ধীরে ধীরে নেমে যাচ্ছেন। মৃদু ব্যঙ্গখচিত স্মিত-

মুখে তাঁকে অনুসরণ করছেন বসুদেব এবং তাঁর অনুগামিবৃন্দ। আর স্থির প্রস্তর মূর্তির মতো বসে আছেন পিতা উগ্রসেন। তাঁর দুচোখে করুণ হতাশা।

সিংহাসন ত্যাগ করে উঠে এলেন কংস। নত হয়ে অন্ধককে বললেন—আমি নিশ্চিন্ত হলাম। আমার পাশে আপনারা আর নেই। তবু আমাকে ত্যাগ করে যাওয়ার আগে আশীর্বাদ করে যান। আপনার তিরস্কারের বস্তুতই আমি যোগ্য, কেননা আমি শুধু যুদ্ধ করতেই শিখেছি, কুটিল রাজনীতির তির্যক পথগুলি সময়কালে চিনে রাখিনি। আমার অন্তিমকাল আসন্ন।·হে পিতৃব্য! এমন অবস্থায় ক্রোধী তার শেষ ক্ষমতা ব্যবহার করে বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ গ্রহণ করে, বৃথা রক্তক্ষয় এবং স্বজাতিহননের সেই পথেও আমি পা দেব না। বরং নিজের ব্যর্থতার জন্য মৃত্যুকেই বরণ করে নেব। হে জ্ঞানী! আপনি জানেন, আমি আগেও কোনো বৃদ্ধকে, ব্রাহ্মণকে অথবা স্ত্রীলোককে বধ করি নি এবং জেনে যান, পরেও তা করব না। বিশেষত নিজের আত্মীয় বন্ধুদের প্রতি তা কখনোই করব না।

এই কথা বলে বসুদেবের দিকে ফিরে শ্লেষযুক্ত হাস্য করে কংস আরও বললেন,—হে বন্ধুবেশী পরমশত্রু, বসুদেব! তুমি এখানেই (শূরসেনেই) জন্ম-গ্রহণ করেছ, পুষ্ট ও বর্ধিত হয়েছ, এবং আমার পিতাই তোমাকে পালন পোষণ করেছেন, তুমি আমার নিকট আত্মীয়, পিতৃব্যজার পতি। কিন্তু হায়, যদুবংশে জন্মগ্রহণ করেও শূরসেনের প্রতি তুমি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করলে। বহির্শক্তিকে বরণ করে আনছ স্বখাত সলিল খনন করে। তোমার দুর্নীতিতে আমার মৃত্যু অথবা জয়, যা-ই হোক-না-কেন, যদুকুলের সৎপুরুষদের সামনে তোমাকে তোমার নিজের মুখ আবৃত করেই পরবর্তীকাল অতিবাহিত করতে হবে। লজ্জা ও নিজের প্রতি ঘৃণাই হবে তোমার অলঙ্কার। তুমি আমার বধোপায় চিন্তা করতে করতে দেশের সঙ্গে এমন বিশ্বাসহন্তার কাজ করলে যাতে যদুবংশীয়গণ চিরকালের জন্য কলঙ্কিত ও নিন্দিত হয়ে থাকবেন। তোমাকে বিশ্বাস করে আমি ঠকেছি, ঠকেছে যদুকুল। তবু তুমি ছিলে আমার আবাল্য বান্ধব, তাই তোমাকে আমি বধ করব না। কিন্তু ব্রজপুরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত তোমার দুই পুত্রকে ক্ষমা করতে পারব না।

বৃদ্ধ অন্ধক ক্লিষ্টমুখে ফিরে তাকালেন বন্ধুবৎসল, বৃদ্ধ ও স্ত্রীজাতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল সেই উজ্জ্বল তরুণ যোদ্ধার দিকে, যে বিপৎকালে যদুবংশের হৃতমর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিল। শেষবারের মত অন্ধক কংসের মঙ্গল কামনা করে এই কথাগুলি বললেন,—কংস! আমার তো এটাই যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয় যে, তুমি

বসুদেবকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের কাছে যাও। তার সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করে নাও।

আদেশ নয় বৃদ্ধ অন্ধকের কণ্ঠস্বর এখন বস্তুতই স্নেহাপ্লুত, তিনি অসহায় কংসকে প্রাণে বাঁচার শুধু উপদেশটুকু দিলেন অশ্রুরুদ্ধ ভিজে গলায়। এই সময় বসুদেব সম্পূর্ণ নীরব। তাঁর চোখের সেই তীব্র ভর্ৎসনাও আর স্ফুরিত হচ্ছে না। বুকের কাছে মাথা নেমে এসেছে। যেন তিনিও আবাল্যের সহচর কংসের মহত্ত্বের দ্বারা এই মুহূর্তে অভিভূত হয়ে পড়েছেন। মনে পড়ে যাচ্ছে তাঁর অনেক কথা, যা বস্তুতই ক্লেদাক্ত। মনে মনে কংসের তিরস্কারের সারবত্তা তিনি যেন আর অস্বীকার করতে পারছেন না।

নিষ্পাপ শিশুকে তুলে দিয়েছিলেন তিনি কংসের হাতে। উদ্দেশ্য, শিশু-হত্যার অপরাধে যদুকুলের প্রিয় নরপতি কংসের কীর্তিকে কালিমালিপ্ত করা।

অন্ধকের প্রতি যে বিরূপতা কিছুক্ষণ আগে বসুদেবকে উত্তেজিত করেছিল, এখন তার আর তেমন তীব্রতা নেই। কংসের দিকেও বসুদেব ফিরে তাকাতে পারলেন না। অন্ধকের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সদলবলে রাজসভা ত্যাগ করে অর্ধস্ফুট প্রত্যুষে তাঁরা রাজোদ্যানে এসে দাঁড়ালেন।

পূব আকাশে চোখ তুলে অন্ধক দেখলেন, অন্ধকার রাত্রের গোপন মৃগয়া সেরে সূর্যরথ তার রথচক্র শোণিত-রঞ্জিত করে মহাদর্পে প্রত্যাবর্তন করছে। অনাদিকালের নিষ্ঠুরতায় আরক্তিম সেই রথনেমির উচ্চকিত আগমনে প্রাণীজগতে ত্রস্ত সাড়া পড়ে গেছে। পাখিরা করছে পক্ষতাড়না, সরীসৃপরা দ্রুত তাদের গর্তে ফিরে যাচ্ছে, নিশাচর শ্বাপদেরা গা ঢাকা দিচ্ছে ঘন বনাঞ্চলে এবং মানুষেরা প্রাণ ধারণের তাগিদে গৃহদ্বার উন্মুক্ত করে বেরিয়ে পড়ছে পথে-ঘাটে। বিশ্বজুড়ে এখন শুরু হবে পরস্পর রেষারেষির চিরন্তন স্বার্থদ্বন্দ্ব।

অন্ধক তাঁর চোখ দুটি বুজে শিবিকায় পরিশ্রান্ত দেহ এলিয়ে দিলেন। কোনো সূর্য বন্দনা করলেন না তিনি। সর্ব পাপঘ্ন বলে জবাকুসুমসংকাশ প্রাতঃ-সূর্যকে প্রণতি জানাতে আজ আর তাঁর কোনো তাগিদ নেই। তাঁর মনে হল, হিংসায় উন্মত্ত এই পৃথিবীতে বুদ্ধিমান মানুষ বৃথাই বেঁচে আছে। এককে মেরে

যেখানে অপরকে বাঁচতে হয় সেখানে বেঁচে থাকাটাই একটা মস্ত বিড়ম্বনা। অন্ধকের আর সাধ নেই। এখন সর্বাঙ্গ জুড়ে যদি শিশিরের মতো মহানিদ্রা নেমে আসত। আহ্, তাহলে তাঁকে দেখে যেতে হত না যদুবংশের ধ্বংসকাণ্ড।

চক্ষু মুদে অন্ধক স্বগতভাবে বললেন,—আয়, ঘুম নেমে আয়! বড় ক্লান্ত আমি।

বসুদেববাহিনী সভা ছেড়ে গেলে অক্রূর ব্যতীত মুষ্টিমেয় কিছু সদস্য বিমর্ষ মুখে, কেউ কেউবা উত্তেজিত বিতণ্ডায় আচ্ছন্ন হয়ে ছিলেন। সভাদ্বার থেকে কংস ফিরে আসতে তাঁরা উঠে দাঁড়ালেন।

অক্রূরকে দেখেই কংস বললেন, যাও অক্রূর! আমার আদেশ, কালই ব্রজে গিয়ে আমার মৃত্যুস্বরূপ বসুদেবের সেই গোপনে-বর্ধিত পুত্রদ্বয়কে নিয়ে এসো মথুরায়। শেষ শক্তি প্রয়োগ করে আমার মূর্খতার প্রায়শ্চিত্ত করে যাব। হয় এই পৃথিবীতে থাকবে কংস আর শূরসেনের স্বাধীন সত্তা, না হয় তা পূর্ণ হবে বসুদেবের মত স্বজনহনন-কারীদের দ্বারা! ব্রজপতি নন্দগোপকে বলবে, তুমি রাজাকে দেয় বার্ষিক কর নিয়ে গোপগণের সঙ্গে মথুরায় যাও! মথুরায় এক ধনুর্যজ্ঞের অনুষ্ঠান হবে ··

—ধনুর্যজ্ঞ!—অক্রূর সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকান।

—হ্যাঁ! ধনুর্যজ্ঞ। সেই যজ্ঞে আমার মল্লবীরেরা তাঁদের বীরত্ব প্রদর্শন করবেন। বসুদেব পুত্রেরা, শুনেছি, এই মল্লযুদ্ধে পারদর্শী। তারা আমারই প্রজা। তারাও এই প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করতে পারবে। ব্রজের গোপকুল তাদের দুগ্ধজাত দ্রব্য নিয়ে যেন মথুরার উপকণ্ঠে হাজির থাকে। যজ্ঞে আমন্ত্রিতরা সেদিন রাজার আতিথ্য গ্রহণ করে ইচ্ছামত মিষ্টান্নের দ্বারা আপ্যায়িত হবেন। সেই মহোৎসবে প্রয়োজনীয় যাবতীয় মিষ্টান্ন যোগান দিতে হবে রাজশত্রু গোপকুলকে। না হলে নির্বংশ হবে তারা। যাও, কৃষ্ণ ও বলরামকে নিজে সঙ্গে করে আনো।

অক্রূর প্রস্থানোদ্যত হলে কংস তাঁকে বাধা দিয়ে সব্যঙ্গে বললেন,—উত্তম প্রতিপালনকারী অক্রূর, এই মুহূর্ত পর্যন্ত আমি তোমাকে আমার অকৃত্রিম বন্ধু

বলেই জানি, বিশ্বাসও করি। আমার সে বিশ্বাস সত্য না-ও হতে পারে। কেননা আজ আমি সহায় ও বান্ধবহীন। "যদি বসুদেব তোমার কানে কুমন্ত্রণা ঢেলে না থাকে" তাহলে নিশ্চয় তুমি আমার এই মনোবাঞ্ছা পূরণ করবে।

—তুমি কি আমাকেও সন্দেহ করো, কংস ?—অক্রূর কম্পিত কণ্ঠে প্রশ্ন করেন ?

কংস হাসেন, বড় তিক্ত হৃদয়-বিদারক হাসি।

বলেন,—তোমরা রাজনীতে প্রাজ্ঞ ! তোমাদের কূটচক্রই একদিন আমাকে সিংহাসনারূঢ় করেছে। তোমরা আমার বিশ্বস্ত সহযোগী ছিলে। সেই কটা দিনই জীবনে আমার পরম প্রাপ্তি, একথা ভাবতে ভালো লাগছে, বন্ধু ! আজ আমি মিত্র অ-মিত্রে আর পার্থক্য করতে পারছি না। পরবর্তী পরিস্থিতিই তা বাছাই করবে, যদি পূর্ণ মর্যাদায় কংস জীবিত থাকে।

—তুমি অত্যন্ত দুর্বল আর নিরাশ হয়েছ, কংস !

—নিরাশ অবশ্যই। কিন্তু দুর্বল নই। ন্যায় যুদ্ধে এখনো কংস ভীত নয়। অবশ্য যদি চক্রান্তের ফলে আমার জীবনাবসান ঘটে, তবে জেনে রেখো, জরাসন্ধ প্রমুখ স্বাধীন রাজারা শূরসেনকে কখনোই ক্ষমা করবেন না। সে হবে ভয়াবহ অবস্থা। কেউ পরিত্রাণ পাবে না। দেবতারাও রক্ষা করতে পারবেন না বীর্যহীন চাটুকারদের ! অক্রূর, আমি সেই ভীষণ ভয়ঙ্কর ভবিতব্যকে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। বড় ক্লান্ত ! বড় নিঃসঙ্গ ! বড্ড অন্ধকার ! তুমি যাও ! আর দেরি কোরো না !

অক্রূর অভিভাদন জানিয়ে বিদায় নিতেই কৃতবর্মার পার্শ্বচর সুমন্ত্র উঠে এসে নিম্নস্বরে কংসকে বললেন,—মহারাজ ! আপনি কি স্বেচ্ছামৃত্যুর আয়োজন করতেই ব্যস্ত ! সামান্য গৃহীও তার সংসারের সংবাদ গোপন রাখে, আপনি শত্রুদের কাছে আপনার মনের দ্বেষ ও পরিকল্পনা সবই উন্মুক্ত করে তাদের প্রস্তুতির সুযোগ করে দিলেন ?

—এ কী ! সুমন্ত্র ! কৃতবর্মার সঙ্গে আমাকে পরিত্যাগ করে কি তুমিও চলে যাও নি ? —কংস বিস্মিত চোখে তাকালেন।

—আপনি যথার্থ বন্ধুকে আজও চিনতে পারেন নি। কৃতবর্মা আপনাকে, আপনার আদর্শকে পরিত্যাগ করে নি। জীবনের শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে সে তা প্রমাণ করবেই। আমরাও করব।

—কিন্তু তার তো আর সময় নেই বন্ধু। আমার মতো মূর্খ অবিবেচক রাজার

শাসনে শূরসেনের সীমান্ত আজ অরক্ষিত। হয়ত ইতিমধ্যেই মথুরার জনপথে ছদ্মবেশী ঘাতকরা গা ঢাকা দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কৃতবর্মা কেন আগে এগিয়ে আসে নি?

—আপনি কি তেমন সুযোগ সৃষ্টি করেছিলেন? বসুদেবের প্রতি দুর্বলতা আপনার পাশ থেকে আপনার হিতৈষীদের ক্ষমতাচ্যুত করে দূরে সরিয়ে দিয়েছে।

—হ্যাঁ! আজ তা উপলব্ধি করছি।

কংসর বুক ঠেলে একটি দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে।

—কিন্তু আজও সেই ভুলের সংশোধন করতে পারতেন। কৃতবর্মাকে যখন লাঞ্ছিত হয়ে বিদায় নিতে হল, আপনি তখন তার আশ্রয় হতে পারতেন।

—আর আমাকে মানসিকভাবে উৎপীড়ন কোরো না তোমরা, সুমন্ত্র। শূরসেন-ই তার ভাগ্য নির্ধারণ করে নিয়েছে। আমি আমার সেই বহু সাধের সাজানো মাতৃভূমির চরণে শেষ চুম্বন এঁকে দিয়ে বিদায় নেব। ইতিহাস একদিন শূরসেন ধ্বংসের কারণ নিশ্চয় জানবে।

সুমন্ত্র বললেন,—তবু একবার শেষ চেষ্টা করতে হবে। আপনার জন্য আজ নমুচিও বিপদগ্রস্ত হলেন।

—নমুচি বিপদগ্রস্ত? কেন সুমন্ত্র?

—আপনি তাঁর স্বরূপ উদ্ঘাটিত করেছেন। তাঁর আশ্রমের ঠিকানাও জানিয়ে দিয়েছেন সভায়। লক্ষ্য করেন নি, এই সংবাদ শোনামাত্র বসুদেবের চর সভাগৃহ ছেড়ে বের হয়ে গেছে, সম্ভবত নমুচির সন্ধানে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে আমিও আমাদের দূত পাঠিয়েছি মহাবীর কৃতবর্মার কাছে।

কংস বিবর্ণ ও হতাশ দৃষ্টিতে তাকালেন। তারপর নিজের বুকে একটা করাঘাত করে বললেন,—ওহ্! উত্তেজিত হলে আমি ভুলে যাই আমার চারপাশে কুচক্রী শ্বাপদেরা ওৎ পেতে আছে। সুমন্ত্র! বস্তুতই আমার জন্যেই মহাত্মা নমুচি বিপদগ্রস্ত। তুমি কি পার-না তাঁর নিরাপত্তার জন্য ব্যবস্থা নিতে? যা তোমার প্রয়োজন, তাই নিয়ে যাও!

—আমি এখনই খট্বাঙ্গ বনের উদ্দেশ্যে দূত পাঠাচ্ছি, মহারাজ।

—তাই করো!

কংস আর দাঁড়ালেন না, ব্যাধ-তাড়িত বিচ্ছিন্ন কোনো হস্তির মত গজেন্দ্র-গমনে সভাস্থল ত্যাগ করলেন।

সুমন্ত্রও তাঁর দ্রুতগামী শকটে আরোহণ করলেন। মথুরার পথে নিশ্চিন্ত আনন্দপ্রিয় মানুষগুলির দিকে তাকিয়ে একটি দীর্ঘশ্বাস মোচন করলেন তিনি। মনে মনে বললেন, এই শত শত মানুষের কে-উ-ই জানে না শূরসেনের ভাগ্যাকাশ আজ কেমন মেঘমলিন। ঝড় আসছে, আসছে মহা অনর্থকারী বিপর্যয়। সে ঝড়ে শুধু শূরসেনই নয়, সমগ্র আর্যাবর্ত বিধ্বস্ত হয়ে যাবে। জরাসন্ধও রক্ষা করতে পারবেন না। এরা নিজেদের বাহুবীর্যে এতই নির্ভরশীল যে কুটিল রাজনীতির ধার ধারেন না, কখনো তার সম্যক চর্চাও করেন না। সরলতাই সভ্য মানুষের বিপদের কারণ, যেমন অসতর্কতা জঙ্গলে মারাত্মক।

শয়নকক্ষে অন্যমনস্কভাবে শুয়েছিলেন কংস। রাজ্যের দুশ্চিন্তা মাথার মধ্যে গিজগিজ করছে। কাছে বসে বকবক করছিল কংসের দ্বিতীয়া মহিষী, নিতান্ত বালিকা, প্রাপ্তি। স্বামী কয়েকদিন বড় ব্যস্ত। যাও বা তিনি অন্তঃপুরে এসেছেন, দিদিই তাঁকে সঙ্গ দান করেছে। ঘরে ঢুকতে গিয়েও দ্বার পথ থেকে নিঃশব্দে ফিরে গেছে প্রাপ্তি। তাই মুখে চোখে ও কথায় অভিমান স্ফুরিত হচ্ছে। তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা এখন নেই। কংস তাই কষ্টে হাসবার চেষ্টা করছেন, সস্নেহে তার চুলের মধ্যে হাত চালিয়ে বলছেন,—দাঁড়াও না, এবার তোমাকে নিয়ে মৃগয়ায় যাব। দিদি থাকবে রাজ্য আগলে। কেবল কাজ আর কাজ। যখন বেড়াব, তখন শুধু তুমি আর আমি। খুশী?

ঠোঁট ফুলিয়ে প্রাপ্তি বলে,—দিদি তোমাকে আর আমাকে একা ছাড়ছে যেন।

—ছাড়বে না মানে, রাজা কংস যদি একবার চোখ পাকিয়ে তাকায়...

বলে কংস চোখ পাকিয়ে তাকাবার চেষ্টা করেন।

খিলখিল করে হেসে উঠে প্রাপ্তি এক হাতে কংসের চোখ ঢেকে দিয়ে বলে,—হল না গো, হল না। তুমি কি আমাদের তোমার প্রজা পেয়েছ? বরং দিদি যদি চোখ পাকিয়ে তাকায়, তাইতেই তোমার হয়ে যাবে।

কংসর মনটা অনেক হাল্কা হয়ে আসে। নির্মল হাসিতে মুখ ভাসিয়ে তিনি বলেন,—বলে দেব?

—দাও না। আমি কি দিদিকে ভয় করি না কি? জানো, বাবা আমায় সবচেয়ে ভালোবাসতেন।

—আমিও তো বাসি এই টুকটুকে মেয়েটাকে। আর তোমার দিদিও তোমাকে খুব ভালোবাসে।

অস্বীকার করতে পারে না প্রাপ্তি। তবু অভিমানরুদ্ধ কণ্ঠে বলে—মোটেও তা নয়। তোমরা আমাকে ছোট্ট মেয়ে ভাব। আমি যেন আর বড় হইনি। আমার দিকে তাকিয়ে দেখ না! দেখো আমি অনেক বড় হয়ে গেছি।

কংস তাকান।

প্রাপ্তির উত্তুঙ্গ বক্ষদ্বয় কামনায় স্পন্দিত হচ্ছে।

প্রাপ্তির দিকে হাত বাড়ান। মনে মনে বলেন, আমারই মতন সরল তুমি, রাণী। বয়সই হয়েছে, বুদ্ধি অপরিপক্ক থেকে গেছে। আমি শিখেছি যুদ্ধ, তুমি শিখেছ খেলা। কিন্তু কেবলমাত্র যুদ্ধই যেমন রাজাসন টিকিয়ে রাখতে পারে না, খেলাও তেমনি সংসারে স্থান পায় না। জীবন বড় কঠিন। সব সময় তা শুধু বিচক্ষণতা দাবি করে, আর বিচক্ষণতা মানেই কূটকর্ম।

কংস বলেন,—তোমার সেই ময়ুর ময়ুরী আর রাজহংসী কেমন আছে প্রাপ্তি। মনে কর, আমরা যদি ময়ুর ময়ুরী হয়ে যেতাম।

প্রাপ্তি রঙ্গ করে বলে,—ও বাবা! তাহলে তো সাপের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হত। পেছনে ব্যাধ তাড়া করত।

কংস আবার বিমর্ষ হয়ে পড়েন কিছুক্ষণের জন্য। তারপর ভাবেন, প্রাপ্তিও আজ একটা মহা সত্যের সন্ধান দিল। বস্তুত, প্রকৃতির রাজ্যে কোথাও নিরবচ্ছিন্ন নিশ্চিন্তি নেই। বিধাতা প্রত্যেকের পেছনেই গুপ্তঘাতক ছেড়ে দিয়েছেন।

এই সময় অস্তি আসে থমথমে গম্ভীর মুখে।

ঘরে ঢুকেই ছোট বোনকে হুকুম করে—নিজের ঘরে যা প্রাপ্তি। একটু বিশ্রাম করতে দে, রাজাকে।

কংস তাড়াতাড়ি বলেন,—না না। তোমরা কাছে থাকলেই আমার বিশ্রাম। এসো, তুমিও বসো।

অস্তি গম্ভীর ভাবে বোনের দিকে তাকান। অর্থাৎ তাঁর আদেশই চূড়ান্ত। প্রাপ্তির প্রস্থান করাই কর্তব্য।

ধীরে ধীরে মলিন মুখে উঠে পড়ে প্রাপ্তি। বুঝতে পারে না, অত স্নেহময়ী দিদি হঠাৎ হঠাৎ এমন নিষ্ঠুর ব্যবহার করে কী করে। নির্লজ্জ দিদিটা বোধহয় এখন রাজাকে একা পেতে চায়।

প্রাপ্তি চলে গেলে কংস একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন,—তোমরা দুটি

বোনই এতো ভালো। আমি বস্তুতই সৌভাগ্যবান ছিলাম। জানি না, তোমাদের জন্য কী ভবিষ্যৎ রেখে যাচ্ছি।—তারপর একটু থেমে আবার বলেন,—আহা! সরলতার প্রতিমূর্তি যেন এই প্রাপ্তি। তোমাদের দুই বোনের দুই রূপ আমাকে মায়ামুগ্ধ করে, রাণী। মরতে আমি ভয় পাই না। বীর ক্ষত্রিয়ের সমর সমাধিই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু যখনি তোমাদের প্রেমপূর্ণ কল্যাণী রূপমূর্তি আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে, তখন বড় বাঁচবার সাধ যায়। অথচ আমার এই দুটো হাত রক্তাক্ত। কত মায়ের অশ্রু, কত বধূর দীর্ঘশ্বাস, কত শিশুর আর্তনাদ উপেক্ষা করে আমি গ্রাম নগর জনপদ ধ্বংস করেছি বিজয়োল্লাসে। তখন একবারও ভেবে দেখিনি, তাদেরও এমনিই সাধ ছিল!

অস্তি উদ্‌গত অশ্রু দমন করে অতি কষ্টে। এখন ভেঙে পড়লে কংস আরও দুর্বল হয়ে পড়বে। সে বীর, সন্দেহ নেই। কিন্তু মনটা বড় কমনীয়। এসময় শক্ত হয়ে তাকে সাহচর্য দিতে হবে।

অস্তি বলে,—সারল্য ধুয়ে জল খায় হতভাগ্য বঞ্চিতের দল। তুমি এভাবে নিজেকে সরলতার হাতে সঁপে দেবে জানলে আমি তোমাকে··

কথা শেষ করতে পারে না, অশ্রুধারাও আর বাধ মানে না।

কংস অস্তিকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে আশ্বস্ত করে বলেন,—এ কী, রাণী! তুমিও কাঁদছ? আরে, কংস এখনো একাই ব্রহ্মা বিষ্ণু শংকর ইন্দ্রকে পরাস্ত করার ক্ষমতা রাখে। আর সে ব্যবস্থাও করেছি।

অস্তি মাথা ঝাঁকিয়ে মুখ তোলে,—কী ব্যবস্থা করেছ? খবর পেলাম, তুমি সভায় সব গোপন তথ্য ফাঁস করে ফেলেছ। বলেছ, নমুচির কথা। তোমার সংলাপে বোঝা গেছে, তুমি দেবক বসুদেবদের শত্রুপক্ষ বলেই গণ্য করছ, জানতে পেরেছ তাদের চক্রান্ত আর প্রস্তুত হচ্ছ নন্দগোপের গৃহে বর্ধিত দেবকী সুতদের নিধনের জন্য। শত্রুরা এসব জেনে কি চুপ করে বসে থাকবে? শত্রুকে অক্ষত রেখে কেউ কি শত্রুতার মনোভাব প্রকাশ করে?

কংস এবার পরিতৃপ্ত ভাবে হাসলেন,—সে ব্যবস্থাও করেছি, রাণী। রাত্রে সভা আহ্বানের আগেই কেশীকে পাঠিয়েছি বৃন্দাবনে। সভায় বলেছি, ধনুর্যজ্ঞে কৃষ্ণ ও বলরামের শক্তি পরীক্ষা হবে। কিন্তু অক্রূর তাদের কাছে পৌছানোর আগেই মহাবল কেশী আমার স্পর্ধাকারী সেই দুই দুর্বিনীত তরুণকে বধ করবে। হয় অক্রূরও তাদের সঙ্গেও নিহত হবে, না হয় সে মথুরায় ফিরে আসবে তাদের শবদেহ নিয়ে।

বলতে বলতে অকস্মাৎ উন্মাদের মতো হেসে ওঠেন কংস।

অস্তি কংসকে চেপে ধরে বলে,—তুমি নিজের ওপর আস্থা রেখেও তা হারিয়ে ফেলছ। কিন্তু এখন এক মুহূর্তও বিলম্ব করার অবসর নেই, রাজা। প্রকৃতিস্থ হও। কেশী যে সফল হবেন-ই তারই বা নিশ্চয়তা কি? কেশীর ওপর নজরদারি করার জন্য শত্রুপক্ষও তো চর নিযুক্ত করে থাকতে পারে। ব্যবস্থা তারাই আগে নিলে কেশীর অতর্কিত আক্রমণেও কোনো কাজ হবে না।

শত্রুপক্ষের চর?—কংস যেন নিদ্রোত্থিতের মতো উঠে বসেন।

—অসম্ভব কি? বসুদেবের চক্রান্ত সফল করার জন্য তোমার নিযুক্ত চর বাহিনী দেবকীর ওপর কতটুকু নজর রেখেছিল? তারা সম্পূর্ণ সজাগ থাকলে, দেবকীর অষ্টমগর্ভের সন্তান ব্রজপুরে প্রেরিত হয় কি করে? অসম্ভব কি, সেই গুপ্তচরেরা হয়ত বসুদেবকেও উৎকোচের বশীভূত করেছিল। তারা তো বসুদেবের আর কোনো গতিবিধির সংবাদ তোমাকে দেয় নি। নজরবন্দী না-রেখে দেবকী ও বসুদেবকে কারাগারে নিক্ষেপ করাই তোমার উচিত ছিল। কিন্তু সময়ে আমার পরামর্শ তুমি ··

—রাণী! অস্তি!—কংস চিৎকার করে ওঠেন,—অনুগ্রহ করো আমাকে! আর পুরোনো কীর্তি স্মরণ করিয়ে আমার অনুতাপ বাড়িও না। আমাকে, একটু একা থাকতে দাও! মহামূর্খ কংসকে ক্ষমা কোরো না। বরং পারো তো পিতৃগৃহে চলে যাও। জানিনা, আমার দুই মূর্তিমতী কল্যাণী মহিষীদের ভাগ্যে কী বিড়ম্বনা লেখা আছে।

বলতে বলতে ঝড়ের বেগে কংস বেরিয়ে যান।

প্রস্তর মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকেন অস্তি। হতাশ ক্লান্ত, আর তাঁর দুই চোখ ফেটে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ে বুকের বসন ভিজিয়ে দেয়।

১৩

কংসের অশ্বারোহী সেনাবিভাগের প্রধান কেশী সে রাত্রেই যাত্রা করলেন বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে। তাঁর সুন্দর গৌরকান্তি মুখে অশ্বমুণ্ডের শিরস্ত্রাণের ওপর শোভা পাচ্ছিল অশ্বরোমের চামর। কেশীর যুদ্ধকালীন বর্ম ও পোষাকও ছিল অশ্বরোমাবৃত। এজন্য সর্বত্র কেশী অশ্বরূপী দানব নামে পরিচিত[১]। তাঁর পরাক্রমে শত্রু ছিন্নভিন্ন হয়ে দিগ্বিদিকে পালায়। তাঁর সেনাদল অশ্বচালনায় দক্ষ ও ক্ষিপ্রতায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কেশী বাহিনী যে পথে যান, অশ্বখুরের ধূলায় সে পথ কিছুক্ষণের জন্য আচ্ছন্ন হয়ে থাকে।

ছপ্‌ছপ করে যমুনার অগভীর নদীচর পার হয়ে ঘন জঙ্গলময় পথে কেশীর সৈন্যদল প্রবেশ করল। অগ্রবর্তী সেনাদল কৃপাণের কোপে গাছপালা সাফ করে এগিয়ে যেতে লাগল। ফলে সমস্ত বনভূমি সশব্দে সচকিত হয়ে উঠল।

মথুরা বৃন্দাবনের মধ্যবর্তী দেবশিবিরে সে সংবাদ পৌঁছাতে দেরি হল না। বিষ্ণুব্রতের বাহিনী কেশীর পশ্চাদ্‌বর্তী সেনাদলকে নিঃশব্দে শেষ দিক থেকে খতম করতে শুরু করলো। ফলে অগ্রগামী সেনারা বা মধ্যবর্তী কেশী তা জানতেও পারলেন না।

এইভাবে কেশীর সেনাদল যখন গোবর্ধন পর্বতের নিচে এসে পৌঁছালেন, ততক্ষণে তাঁর বাহিনীর অনুসরণকারীরা খতম হয়ে গেছেন। ফাঁকা জায়গায় এসে কেশী নিজেকে সহায় শূন্য দেখে উন্মত্ত হয়ে উঠলেন। অবশিষ্ট অশ্বারোহীদের আদেশ করলেন,—বাছবিচার না করে গোব্রজকে শ্মশান বানিয়ে দাও! সামনে যা কিছু পাবে তছনছ করো। কেটে টুকরো টুকরো করো শত্রুদের।

আদেশমাত্র অশ্বারোহী বাহিনী কলরব করতে করতে ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে।

ওদিকে কৃষ্ণ-বলরামের কাছে কেশীর আগমনবার্তা পৌঁছানো মাত্র সুদাম, শ্রীদাম সহ কৃষ্ণবাহিনী ও গোপবেশধারী দেব-বাহিনীর দল কৃষ্ণ ও শাম্বর নেতৃত্বে ছুটে চললেন গোবর্ধন পর্বতের দিকে। বলদেব তাঁর

প্রধান সাকরেদ মল্লবীর প্রলম্বের সঙ্গে নিজের বাহিনী নিয়ে উঠে পড়লেন পাহাড়ের ওপর। কিছু শিক্ষিত গোপযুবা গ্রাম প্রবেশের পথগুলি গাছের গুঁড়ি ও গোশকটের বেড় দিয়ে আটকে ফেলতে লাগল। সমস্ত গ্রামটি চিৎকারে হাহাকারে আর্তনাদে ভেঙে পড়ল। বুকে শিশু চেপে পাকাবাড়িতে আশ্রয় নেওয়ার জন্য ছুটতে লাগল মেয়েরা। যে যেমন পারল উন্মুক্ত স্থানে খোঁটায় বাঁধা গবাদি পশুগুলিকে মুক্ত করে তাড়িয়ে নিয়ে গেল নিরাপদ স্থানে।

কেশীর অগ্রবর্তী বাহিনী গোবর্ধন পর্বতের নিচে পৌঁছানোর আগেই বলরামের মল্লবীরেরা পাহাড়ের টিলাগুলির পেছনে গা ঢাকা দিয়ে ওৎ পেতে ছিল। হাতের কাছে জড়ো করে রাখল তারা সেইসব পাথরের গোলা, গোবর্ধন-বিস্ফোরণের সময় যেগুলি একত্রিত করে রেখেছিল সুযোগমত ব্যবহারের জন্য।

অন্যদিকে তীক্ষ্ণ নখরযুক্ত লৌহহস্তাবরণ পরে কৃষ্ণের সুশিক্ষিত কিছু যুযুৎসু বাহিনী গুহায় বা পাহাড়ের খাঁজে সাবধানে আত্মগোপন করে সুযোগের প্রতীক্ষায় রইল।

কেশীবাহিনী পাহাড়ের নিচে পৌঁছালে ওপর থেকে বলরামের দল শুরু করে দিল বর্ষার মতো প্রস্তরবর্ষণ। হতাহত সৈন্যরা চিৎকার করে ঘোড়ার পিঠ থেকে খসে পড়তে থাকলে শাম্ব ও কৃষ্ণের দল তাদের শেষ করতে লাগল একে একে। রীতিমত যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল চন্দ্রালোকিত বনপ্রান্তরের মধ্যে। অশ্বের আর্ত হ্রেষা ও খুরক্ষেপে সমস্ত চরাচর শব্দিত ও ধূলিজালে আচ্ছন্ন হল। আর ঠিক এই সময় বৃন্দাবনের আকাশে চক্রাকারে উড়তে লাগল একটি দেবযান। একমাত্র শাম্বই বুঝলেন রণক্ষেত্রের মাথায় বিষ্ণুব্রত প্রয়োজনীয় সাহায্যের জন্য উপস্থিত হয়েছেন।

গৌরবরণ গোপযুবাদের মধ্যে কৃষ্ণাঙ্গ বাসুদেবকে চিনে নেওয়ায় অসুবিধে ছিল না। হাতে লোহার দণ্ড নিয়ে এগিয়ে আসছিলেন তিনি।

কৃষ্ণকে দেখামাত্র ক্রুদ্ধ কেশী তাঁর ঘোড়া ছুটিয়ে চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে এবং কখনো বা সোজাসুজি আক্রমণ করতে এগিয়ে এলেন। উন্মুক্ত তরবারি আন্দোলিত হল তাঁর হাতে। কিন্তু তরবারির চেয়ে কৃষ্ণের লৌহদণ্ড আন্দোলন আরও বেশি ক্ষিপ্র হওয়ায় একসময় কেশীর সেই তরোয়ালও তাঁর হস্তচ্যুত হয়ে ছিটকে পড়ল।

কৃষ্ণ সাহাস্যে বললেন,—এইবার মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও কেশী। ব্রজবাসীর

ওপর তুমি বারবার অত্যাচার করেছ। প্রাণ নিয়েছ অনেক নিরীহ গোপপুরুষের, হরণ করেছ অবলা গোপনারী। আজ তোমার সামনে তোমার কৃতান্তস্বরূপ এই কৃষ্ণ। সাহস থাকে অশ্ব পরিত্যাগ করে নেমে এসো!

কিন্তু উত্তম অশ্বারোহী কেশী নিরস্ত্র অবস্থায় অশ্বত্যাগের আহ্বানকে স্বীকার করতে পারলেন না। বরং চক্রাবর্তনের মাঝে মাঝে ছুটন্ত ঘোড়ার রাশ টেনে তাকে দুই পায়ে দাঁড় করিয়ে কৃষ্ণের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চেষ্টা করলেন। জুজুৎসু বিদ্যায় শিক্ষিত কৃষ্ণকে এই লম্ফ-ঝম্ফের খেলায় পরাস্ত করা অসম্ভব। ঠিক অন্তিম মুহূর্তে লৌহদণ্ডের আঘাত হেনে কৃষ্ণ প্রতিবারই সরে গেলেন। অবশেষে ঘোড়ার সামনের পাদুটি জখম হল। তার ঘাড়ে পড়ল এমনই জোরালো আঘাত যে মুখ দিয়ে ফেনা তুলতে তুলতে ঘোড়াটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। পড়ে গেলেন কেশীও। তাঁর মুখাবরণ লোহার অশ্বমুণ্ডটি গড়িয়ে পড়ল। কেশী দেখলেন একটি ভয়াল তীক্ষ্ন শব্দ করে কৃষ্ণের দেহটি উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হল। তারপর চক্ষের নিমেষে কৃষ্ণের পদযুগল বক্রভাবে নেমে এলো তাঁর বুকের ওপর।[৩]

যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করে চিৎকার করে উঠলেন কেশী আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হাঁমুখে কৃষ্ণের প্রলম্ব নখরযুক্ত লৌহদণ্ডটি প্রবেশ করল।[৪] সে আঘাতে কেশীর দাঁতগুলি ভেঙে পড়ল, মুখ ছিন্নভিন্ন হয়ে রক্তের ছিটেয় পরিপূর্ণ হল। মনে হল, অস্তগামী সূর্যের মুখে যেন রক্তরাগ ছিটিয়ে পড়েছে।

বিজয় উল্লাসের মাত্রা কমে আসতে কৃষ্ণ দেখলেন, দূর থেকে এক ব্যক্তি তাঁকে একখণ্ড গেরুয়ারঙের পতাকা নেড়ে ডাকছেন। ঐ রঙ, ঐ পতাকার বিশেষ অর্থ শুধু কৃষ্ণই জানেন। সে নিশানা দেবতাদের উপস্থিতি জ্ঞাপন করে। দূর পাহাড়ের টিলা থেকে নিশানটির ইঙ্গিত জানানোর অর্থ, কোনো দেবতা কৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন।

সমবেত স্তুতিকারদের দিকে ফিরে আত্মপ্রসন্ন ভাবে মৃদু হেসে কৃষ্ণ বললেন, —তোমরা এবার গ্রামে যাও! আর ভয় নেই। কংসের দক্ষিণহস্তটি আজ বৃন্দাবনের মাটিতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। আশাকরি, এরপর বৃন্দাবনে আর কেউ অত্যাচার করতে আসবে না।

এখন কৃষ্ণের বাক্য মানেই আদেশ। কৃষ্ণাদেশ পালন না-করার সাহস কারও ছিল না। তারা কৃষ্ণের জয়ধ্বনি দিতে দিতে সদলে ফিরে চললো গ্রামের দিকে।

প্রলম্বের সঙ্গে নিঃশব্দে ফিরে চললেন বলদেবও। পরিশ্রমের পর তাঁর নেশার টান জাগে। তিনি তাই আর কৃষ্ণের দিকে ফিরেও তাকালেন না।

গোবর্ধন পর্বতের নিচে একটি নির্জন স্থানে একখানি অদ্ভুতদর্শন ধাতবযান দাঁড়িয়ে ছিল। এমন জিনিস কৃষ্ণ আগে কখনো দেখেন নি। অবাক কৌতূহলের সঙ্গে দুরু দুরু বুকে এগিয়ে গেলেন তিনি। দেখলেন, যানটি কাঠের গুঁড়ির মতো সরল এবং লম্বাটে। পেছনের অংশ ফড়িং-এর মতো। সে অংশে ছোট ছোট স্ফটিকশুভ্র দুটি পাখনা ঊর্ধ্বমুখী হয়ে আছে এবং সেদুটি যেন বাঁধা আছে একখানি ধাতব পাত দিয়ে। পাখনাদুটি ও ধাতব পাতটির মাঝে বেশ খানিকটা ফাঁক। যানটির নিচে হাতির পায়ের মতো দুটি ধারক। সামনের দিকটা মাটির দিকে নামানো। সেদিকে অনুরূপ আর একটি হ্রস্বাকার পদ মাটি থেকে যানটিকে সাবধানে তুলে ধরেছে। যানটির আকৃতি ধানভাঙা ঢেঁকির মতো। মুখের দিকে স্বচ্ছ আবরণে ঢাকা ঢেউতোলা একটি কুটুরী। বাইরে থেকেও তার ভেতরটি পরিষ্কার দেখা যায়।

কৃষ্ণ দেখলেন, যানটির কাছাকাছি আসতে সেই স্বচ্ছ ঢাকনা খুলে গেল। সেখান থেকে নেমে এলেন শ্মশ্রুজটাধারী এক দীর্ঘকায় সুপুরুষ। পতাকাধারীকে পর্বতবাসী কোনো গন্ধর্ব বলেই মনে হয়।

পতাকাধারক কৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে তাঁর দৃষ্টি দীর্ঘকায় পুরুষটির প্রতি আকৃষ্ট করে সসম্ভ্রমে বললেন,—হে উপেন্দ্র। দেবর্ষি নারদ আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন, আপনি সেই সৌভাগ্যবানদের অন্যতম যিনি দেবর্ষির আশীর্বাদ লাভ করবেন।

সঙ্গে সঙ্গে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হয়ে কৃষ্ণ সেই স্থানের মৃত্তিকা চুম্বন করে বললেন,—হে স্বর্গ-মর্ত-পাতাল ভ্রমণকারী ভগবন! আপনার দর্শনে আজ কৃষ্ণ যেমন অভিভূত, বৃন্দাবনও তেমনি প্রগাঢ় শ্রদ্ধায় স্তব্ধ এবং বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে আছে, আজ্ঞা করুন!

প্রীত মুখে কৃষ্ণের দুই বাহু ধরে তাঁকে উঠিয়ে দেবর্ষি বললেন,—তোমার জন্ম দেবতাদের প্রীতি ও আশীর্বাদ বহন করে আমি হিমালয় থেকে ভূতলে অবতরণ করেছি। বিষ্ণুপুত্র বাসুদেব! তোমার শিক্ষাগ্রহণ সার্থক হয়েছে। কৌশলে কেশীকে দলবিচ্ছিন্ন করে একক সংগ্রামে তুমি তাকে পরাস্ত করেছ। অপরাজেয় কেশীকে নিহত করায় তুমি আজ থেকে কেশব নামে খ্যাত হলে। দেবতাদের

বুদ্ধিবলের সঙ্গে মর্তবাসীর দৈহিক বল যুক্ত হলে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা অবশ্যই নির্বিঘ্ন হবে। হে উপেন্দ্র! সেই ধর্মরাজ্যের শিরোভূষণ স্বরূপ তুমিই হবে তখন আর্যাবর্তের সর্বমান্য পুরুষ। কেশী বধে সে পথ অনেকটাই পরিষ্কৃত হয়েছে। অতঃপর কংসের পতনে আর্যাবর্তের পশ্চিমভূভাগে আমাদের প্রাধান্যই সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। মথুরা অভিযানের সকল প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই সুচারুরূপে সম্পূর্ণ হয়েছে। অক্রূর আসছেন মথুরা থেকে। তিনি আমাদেরই লোক। তাঁর সঙ্গে তুমি ও বলরাম সেখানে যাও। ছদ্মবেশী দেবসেনারাও তোমাদের অনুগমন করবে। স্বয়ং যোগমায়া হবেন তোমাদের প্রধান সহায়তাকারিণী। প্রয়োজন মতো তিনি মোহিনীমায়ায় আচ্ছন্ন করবেন কংস প্রহরীদের।[৫]

কৃষ্ণ মাথা নত করে দেবর্ষির অভিনন্দন ও আশীর্বাদ গ্রহণ করলেন।

নারদ মৃদু হেসে বললেন,—আমার দিকে চোখ তুলে তাকাও। আমাকে চিনে রাখো।

—আপনি অবিস্মরণীয় ভগবন! তবে এমন কথা বলছেন কেন?

কৃষ্ণ উত্তম স্তুতিকারক আর হিমালয়বাসী দেবতারা স্তুতিবাদ অত্যন্ত পছন্দ করেন। দেবর্ষি নারদ খুশি হয়ে বললেন,—উপেন্দ্র, তোমার জয় হোক, এই আশীর্বাদ করি।

নারদ তাঁর বিমানে আরোহণ করলে সেই নলাকৃতি বিমানটি সিধে গোবর্ধন পর্বতের মাথার ওপর দিয়ে ভেসে গেল। দেখতে দেখতে দিগন্তের কোলে যানটিকে অদৃশ্য হতে দেখলেন কৃষ্ণ। কিছুক্ষণ অভিভূতভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর বিমানের ফেলে-যাওয়া ধূম্র রেখার দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলেন, একদিন তিনিও অমনি একটি বিমানের মালিক হবেন। ভেসে যাবেন পাখির মতো দিগন্তের একটি কিনার থেকে অপর কিনারে। সমুদ্রতীরবর্তী পাতাল প্রদেশ, গাঙ্গেয় সমভূমি, আর্যাবর্তের মর্ত্যলোক এবং হিমালয়ের ভৌমস্বর্গে তিনি ছুটে যাবেন। অযোধ্যাপতি রঘুবীর, ক্ষত্রিয়হন্তারক পরশুরাম, মৎস্যাধিপতি উপরিচর বসুর মতো কৃষ্ণের রথও জগদ্বাসীকে স্তম্ভিত করে নক্ষত্রলোকের সীমাহীন নীল শূন্যে যখন ভেসে যাবে, পৃথ্বীলোকের পাখাহীন মানুষেরা তখন দুই কর যুক্ত করে তাঁর স্তুতি করবে এবং সবিস্ময়ে বলবে, ঐ চলেছেন দেবেন্দ্রপ্রিয় উপেন্দ্র কেশব! আহ্! এমন স্বপ্নও কি বাস্তবিক সার্থক হবে তাঁর জীবনে![৬]

হঠাৎ কাছেপিঠে একখণ্ড পাথর গড়িয়ে পড়ার শব্দে সচকিত কৃষ্ণ বিদ্যুৎ-

বেগে ঘুরে দাঁড়ালেন। অনুশীলনের ফলে তাঁর কান ও দেহ এখন হরিণের মতো সতর্ক ও সজাগ হয়েছে।

কৃষ্ণ দেখলেন, অদূরে একটি ভারি পাথর গড়িয়ে পড়েছে এবং তার গড়ান পথে গোবর্ধনের ঢালু সানুদেশে কোনো রকমে ঝুলছে একটি বালিকার রঙিন লাল ঘাঘরা। এ ঘাঘরা কৃষ্ণের অত্যন্ত পরিচিত।

কৃষ্ণ লাফ দিয়ে একটি গাছের ঝুরি ধরে পতিত দেহটির দিকে ঝাঁপিয়ে যাওয়ার সময় চিৎকার করে বললেন,—যেমন আছিস ঠিক সেইভাবে থাক গোরী, আমি আসছি। নড়াচড়া করলে পাথরের সঙ্গে নিজেও খসে পড়ে যাবি। হুঁশিয়ার!

দেহটিকে আন্দোলিত করে গোরীর পাশে ঝুপ করে নামলেন কৃষ্ণ। তারপর তাকে ধরে আস্তে আস্তে তুলে নিলেন। কৃষ্ণের বুকের ওপর আছড়ে পড়ে অর্ধমূর্ছিতা গোরী নিচের দিকে তাকিয়ে দেখল। এই টিলা থেকে নিচে আছড়ে পড়লে হয়ত বা সে প্রাণে মরত না, কিন্তু নির্ঘাত কোনো অঙ্গহানি ঘটে যেত যা মৃত্যুর চেয়ে ভয়ঙ্কর।

গোরীর কম্পিত দেহখানি সর্বাঙ্গে মথিত করে অনুরাগসিক্ত কণ্ঠে কৃষ্ণ বললেন,—কী করছিলি এখানে? আবার কি লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের কথা শুনছিলি?

গোরীর দুই গালে অশ্রুর ধারা শুকিয়ে দুটি খড়িটানা সাদা রেখার মতো দেখাচ্ছে। ঠোঁটের কোণে যেন কোনো শীর্ণকায়া ছায়াপথ হঠাৎ মুছে গেছে। সে নিঃশব্দে মাথা নেড়ে জানাল, হ্যাঁ, অত্যন্ত নিষিদ্ধ কাজটি সে খুবই সংগোপনে করছিল। নারদের যন্ত্রযান আকাশে উড়তে সেই শব্দে হঠাৎ বুকের কাছের পাথরটা পিছলে গেল, আর সে-ও পড়ে গেল পা ফসকে। ভাগ্যে একটা গাছের গুঁড়িতে আটকে যায়, নাহলে কৃষ্ণের পায়ের কাছে আজ তার মৃত্যু হ'ত। অবশ্য তাই হলেই সবচেয়ে ভাল ছিল।

শুনে একদৃষ্টে গোরীর ক্রন্দনরত মুখখানির দিকে তাকিয়ে থেকে কৃষ্ণ হঠাৎ তার রক্তাভ গণ্ডদেশ আরও রক্তিম করে দিলেন একটি রাগত করাঘাত হেনে। কঠিন কণ্ঠে বললেন,—এইভাবে লুকিয়ে আমার কাজ দেখা যে কতবড় অন্যায় তা কি আমি তোকে বলিনি?

কাঁদতে কাঁদতে গোরী বলল,—মার্ কানু, আরও মার্। তোর প্রাণে প্রেম নেই, দরদ্ নেই। আমার খুন নিয়ে তুই হোলি খেল্! তু চলা যা কানু, তু চলা যা মথুরানগরী। তু মথুরাপতি!

—শুন্ প্যারী শুন্!—কৃষ্ণ বিদ্রোহিণী গৌরীকে আবার বুকে বেঁধে নিয়ে সান্ত্বনা দিতে চান।

কিন্তু কৃষ্ণের প্রসারিত বুকে গুম গুম করে কিল মেরে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করে অভিমানিনী গৌরী। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলে,—নেহি, নেহি। হম্ তুহার কোই নহি। হম্ গোয়ালিনী।

—তু রাধা!

—ছোড়্ এ্যাসা বাত! হম্ রাধা নহি!

কৃষ্ণের অন্তর রাগে জ্বলে। আবার গৌরীর প্রণয় প্রদীপ্ত মুখের দিকে তাকিয়ে সেই রাগাঙ্গার অনুরাগের শীতল স্পর্শে স্তিমিত হয়ে আসে। অবুঝ মেয়েটিকে প্রবোধ দেওয়ার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে তার স্ফুরিত অধরোষ্ঠ নিজের উত্তপ্ত অধোরোষ্ঠের দ্বারা মথিত করে কানু। তাদের সেই দেহ নিপীড়ন এবং রাগানু-রাগের শব্দে উচ্চকিত হয়ে কাছে-পিঠের শাখা থেকে টিয়ার ঝাঁক টি টি করে উড়ে যায়। এক গাছ থেকে অপর গাছে আশ্রয় নিয়ে লক্ষ্য করে গৌরীর ব্যর্থ মুক্তি-প্রয়াস।

সাধারণত গৌরীর কোপ স্বল্পস্থায়ী। কৃষ্ণের দুই আজানুলম্বিত বাহু যখন নিপুণ মন্থনদণ্ডের মতো গৌরীকে বিমর্দিত করে, তখন বিদ্বেষ বিষাদের জমাট হলাহল সরল হয়ে গৌরীর সর্বাঙ্গ অমৃতসিক্ত হয়। আজ কিন্তু তার ব্যতিক্রম ঘটেছে। আজ গৌরীর নিঃশ্বাস নিদাঘের ফুটন্ত বায়ুর মতো উত্তপ্ত! পীনোদ্ধত দুই বক্ষের উথাল-পাথাল সরোষে কাঁচলিবদ্ধ ছিন্ন করার জন্য উন্মত্ত। আক্রোশ-প্রমত্ত দুটি হাত কৃষ্ণের কামাতুর দেহকে প্রেমশূন্য আঘাতে আহত করতে উদ্যত।

নিজের কামস্পৃহা মিটিয়ে অবশেষে কৃষ্ণ তাকে মুক্তি দেয়।

যেন কোনো নরম পাখির দেহ ব্যাধের মুঠি থেকে মুক্ত হয়েছে,—একবার বিমূঢ় ভাবে থমকে দাঁড়ায় গৌরী, তারপর টিলা থেকে গড়ান্ পথে নামতে থাকে দৌড়ে।

কৃষ্ণ চিৎকার করে বলে,—একটা কথাও কারোকে বলিস না গৌরী তাহলে আর জীবনেও তোর সঙ্গে আমার দেখা হবে না।

গৌরী একবার মুখ ঘুরিয়ে দেখে তারপর আবার দৌড়ে চলে গাঁয়ের পথে। তবে সুনন্দের বাথানের দিকে নয়, সে ছুটে যায় নন্দরাণীর চকমেলানো দালানবাড়ি লক্ষ্য করে।

পথে দু একজন অবাক হয়ে গোরীর সেই পাগলিনী রূপ দেখে। সে দৌড়ে যায় বলে তার মুখমণ্ডলে কেটে-যাওয়া, শুকিয়ে-যাওয়া রক্তের ছাপ কেউ দেখতে পায় না। যেমন কাঁটা-বেঁধা পায়ের আঘাত বুঝতে পারে না আত্মবিস্মৃত গোরী নিজেও।

করুণাময়ী যশোদা ক্ষীরের ও সরের নাড়ু গোল গোল করে পাকিয়ে একটি পাত্রে রাখছিলেন। কেশী বধের উৎসব পালিত হবে নন্দালয়ে। এজন্য অন্দর-মহল আজ বিশেষ আহ্লাদিত এবং ব্যস্ত।

এমন সময় হাঁপাতে হাঁপাতে গোরী এসে দাঁড়ায়।

মুখ তুলে যশোদা শুধু পলকহীন চোখে তাকিয়ে থাকেন। গোরীর রূপ মোহভরা চাঁদনি রাতের মতো। এখন সেই ভরা ক্ষেতে যেন সর্বনাশা প্লাবন হা হা করে ছড়িয়ে পড়েছে। বিস্রস্ত বিপর্যস্ত আতঙ্কিত প্রকৃতিরও যে ভয়াল সুন্দর এক ধরনের চেহারা আছে, গোরীর মধ্যে তার প্রতিচ্ছায়া দেখে নির্বাক যশোদা উঠে দাঁড়ান। বড় আদরের মেয়ে সে নন্দরাণীর। যশোদার মনোগত অভিপ্রায়, কৃষ্ণের 'বহু' করে ঘরে আনবেন তিনি এই ফুটফুটে মেয়েটাকে। সাজাবেন সব রকম রত্নালঙ্কার দিয়ে।

কিন্তু কাছে গিয়ে গোরীকে কিছু জিজ্ঞেস করার সুযোগ পেলেন না যশোদা। সকলকে উৎকর্ণ ও সতর্ক করে নন্দালয়ের পুরোদ্যানে এই সময় শিঙা ও বিষাণ বেজে উঠল। সকলে ছুটল সেদিকে। এ আওয়াজ কখনো সতর্কতামূলক, কখনো বা তা গ্রামবাসীকে নন্দালয়ে আহবান করার উপায়।

যশোদা গোরীর দিকে ব্যাকুলভাবে তাকালেন, আবার কি কোনো বিপদ? রাজা কংস কি পাঠালেন আর কোনো হামলাকারী সেনাপতিকে?

গোরী সেই অবস্থায় ছুটল বহির্বাটির দিকে।

যশোদা দেখলেন, বৃন্দাবননন্দিনী চম্পকবরণী গোরীর গণ্ডদেশ থেকে গড়িয়ে পড়ছে গোধূলি স্বর্ণের অরুণিমা। গোরীর মুখে যে শুকনো রক্ত জমাট বেঁধে ছিল, যশোদা তাকে অস্তস্বর্যের চুম্বনসিক্ত অলকাতিলকা বলে ভুল করলেন।

১৭

কেশী বধের পর বৃন্দাবন যখন উৎসবে উন্মত্ত হয়েছিল তখন সবার মাঝে কৃষ্ণ ছিলেন অনুপস্থিত। তাঁরই আদেশে বিনা কৃষ্ণেই কৃষ্ণোৎসব পালিত হচ্ছিল।

উৎসবের অংশীদাররা ইতিউতি সোমরসের আসর সাজিয়ে বসলেন। বড় ঘরের গোপিনীরা এসে সেই আসরে নাচ গানের রাসলীলায় গা ঢেলে দিলেন। গোপ নেতাদের দালান কুঠীতে গৃহস্বামিনীরা ঘিয়ের প্রদীপ সাজাতে সাজাতে সমবেত স্বরে গান ধরলেন। গোঠে তখনও দরিদ্র রাখাল বালাকেরা আদুড় গায়ে গো-পাল সামলাচ্ছিল বেণু বাজিয়ে। তারা শ্রমিক, উৎসব আনন্দে উচ্ছিষ্ট ভোগী। অবশ্য দিগন্তের পরপারে ফালাকরা তরমুজের চাকার মতো একখানা সূর্য ছাড়া তাদের কাজ তদারকিতে তখন আর কেউ নিযুক্ত ছিল না। তাই উৎসবের জনপদে ঠাঁই না-পেলেও কর্মী রাখাল বালকরাও স্বাধীনতা পেয়েছিল অনেক বেশি। গান গাইছিল তারা গলা ছেড়ে। ছুটোছুটি লুকোচুরি খেলে সন্ধ্যা নামিয়ে এনেছিল সুবিস্তীর্ণ নির্জন গোচারণ ক্ষেত্রে।

গরুর পাল উৎসব বোঝে না। তারা অভ্যাসমত ফিরে আসছিল তাদের পালক চালকদের সীমানায়। কৌতূহলী রাঙা সূর্য আজকের ব্যতিক্রম লক্ষ্য করেই বুঝি থমকে দাঁড়িয়ে নরম হাসি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন নির্জন উৎসব-প্রেমিক এই রাখাল বালকদের জন্য। কিন্তু তাদের সময় মাপা। যেখানে যাই ঘটুক এদের কাজ করতে হয় যথারীতি। প্রকৃতির আহ্বান পেছনে ফেলে বলবান মহিষের পিঠে চড়ে তারা 'হু' 'হু' শব্দে গরু তাড়িয়ে নিয়ে ফেরে। অন্যদল কাঠকুটোর বোঝা কাঁধে নেয়। বাঁকে করে বহে নিয়ে চলে সারাদিনের পরিত্যক্ত গোময়-রাশি। সেই ভারে তাদের কাঁধগুলিতে বাহক-বলদের মত মাংসের দলা কালা কালা হয়ে চাক বাঁধে। এজন্য অবশ্য মুখের হাসি কখনো লুপ্ত হয় না। অভ্যাসের ফলে মানুষ যেমন মানুষ হয়, তেমনি আবার সে ইতর প্রাণীদের স্বভাবও সহজেই আয়ত্ত করতে পারে।

গৃহগামী রাখাল বালকেরা ফেরার পথে পশ্চিম দিগন্তের অলক্ত আভার দিকে তাকিয়ে একবার যুক্তঃকরে প্রণাম জানায়। এ তাদের সূর্যদেবতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। তাঁর অলক্ষ্য প্রহরায় তারা যে নির্বিঘ্নে গৃহে ফিরছে এজন্যই তারা কৃতজ্ঞ।

কিন্তু আজ প্রণাম জানাতে গিয়ে জনৈক রাখাল সভয়ে চিৎকার করে ওঠে,—কেশী! কেশী! ফির্ কেশী! বাপ্‌স্ রে বাপ্! জলদি করো, জলদি চলো!

সবাই চক্রবালের দিকে তাকিয়ে ভয়ে বিবর্ণ হয়ে যায়। দেখে, দিগন্ত রেখায় ভেসে উঠেছে ধ্বজা-পতাকাধারী একটি রথের আকৃতি। রথের সাদা ঘোড়া দুটিকে দূর থেকে পুতুল ঘোড়ার মতো দেখাচ্ছে। রথটাকে মনে হচ্ছে, আকাশ-পটে আঁকা কোনো নির্জন মন্দির।

সবচেয়ে দ্রুতগামী মহিষের সওয়ার গলা চড়িয়ে সবাইকে সাবধান করে যায় তাড়াতাড়ি ফিরে আসার জন্য, নিজে ছোটে গোপরাজ নন্দের ভবনের দিকে। সংবাদ জানাতে হবে রাজাকে। ভয়ার্ত বালকেরা তারস্বরে 'ছু' 'ছু' শব্দ করে আর নিজেদের মহিষের লেজ মোচড়ায় প্রাণপণে।

কিন্তু শীঘ্রই দূরদৃষ্ট রথ এবং সঙ্গের কিছু ঘোড়সওয়ার টগ্‌বগ করে গোপালের মধ্যে এসে দাঁড়ায়। অশ্বখুরের শব্দে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে গাভীর দল। ভীতু প্রকৃতির রাখাল বালকেরা কেঁদে ফেলে।

তাদের ভয় ও আশঙ্কার অবসান ঘটিয়ে রথারূঢ় রাজপুরুষ সহাস্যে নেমে আসেন। তাঁর ঝকমকে পোষাক ও উজ্জ্বল রত্নমণিখচিত উষ্ণীষের দিকে তাকিয়ে বালকেরা বোবা হয়ে যায়।

রাজপুরুষ বলেন,—ডরো মত্ বেটা! জিজ্ঞেস করেন, গোপরাজ নন্দের প্রাসাদ কোন দিকে। বলেন, ভয় নেই। তিনি নন্দরাজার বন্ধু। এসেছেন মহাবল শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করতে। রাজপুরুষ ছেলেদের হাতে প্রীতির স্মারক স্বরূপ মিষ্টান্ন তুলে দেন।

রাখাল ছেলেরা সরল। সামান্য আদরে গলে যায়। সমস্বরে তারা তাদের রাজ-আলয়ের পথ দেখিয়ে দেয়। রাজপুরুষ আবার রথে আরোহণ করেন। ঘোড়ার খুরে ধুলো ওড়ে।

গ্রাম-প্রবেশের পথে একটা ঝাঁকড়া মাথা গাছের ডালে মস্ত একটা ঢাক বাঁধা আছে। গাছের পাতা দিয়ে সেই জায়গাটা এমনভাবে ছাওয়া যে চট করে-

ঢাকটা কারো চোখে পড়ে না। শুধু বৃন্দাবনের তরুণ ছেলের দলকে সেই ঢাকে বিভিন্ন রকম বোল ফোটানোর শিক্ষা দিয়েছেন কৃষ্ণ। এক একটি বোল এক এক রকম সংবাদ ঘোষণা করে। যে রাখাল বালক মহিষ ছুটিয়ে আসছিল, গাছের নিচে পৌঁছে সে একটা ডাল ধরে চলন্ত মহিষের পিঠ থেকেই ঝুলতে ঝুলতে গাছে উঠে পড়ে। তারপর একজোড়া কাঠি দিয়ে ঝড়ের মত ঢাকের বুকে আওয়াজ তোলে, যার অর্থ, সাবধান! হুঁশিয়ার! সামনে বিপদ, সকলে প্রস্তুত হও।

শব্দ শুনে নন্দালয়ের দিকে গ্রামবাসীরা ছুটে আসতে লাগল দলে দলে। কৃষ্ণ ও বলরামের সুশিক্ষিত বাহিনী নন্দালয়কে ঘিরে ব্যূহ রচনা করে ফেলল। অপর একটি অগ্রগামী দল গ্রামের প্রবেশ পথে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। এখনো সেই গোশকটের প্রাচীর অটুট আছে। কর্মী রাখালরা চারণভূমি থেকে ফিরে ঐ প্রতিবন্ধক সরিয়ে ফেলত। তারা ফেরেনি বলেই বাধাটুকু অপসারিত হয় নি। এখন সেই শকটপ্রাচীর শত্রুর প্রবেশ পথে প্রথম বাধার কাজ করবে।

বলরাম, নন্দ ও সুনন্দ দ্বিতীয় সারির যোদ্ধাদের সঙ্গে পঙ্‌ক্তিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁদের দৃষ্টি সামনের ঢেউ-তোলা প্রান্তরের দিকে। মাটি যেখানে উঁচু হয়েছে এবং পরপারের গড়ান পথে নেমে গেছে, সেখানে দৃষ্টি বাধা পায়। গড়ানের বিপরীতে কী আছে বোঝা যায় না দূর থেকে। সকলের উদ্বিগ্ন দৃষ্টি তাই ঐ ঢিবির দিকে।

বলরাম দেখলেন, ঢিবির নিচে থেকে প্রথমে একটি ধ্বজা পরে রথের চূড়ো এবং ক্রমশ একটি রথ উঠে আসতে লাগল। রথের পাশে ও পেছনে ঘোড়সওয়ার।

নন্দ বললেন,—সর্বনাশ! এ তো কংসের ধ্বজা। কেশীর মৃত্যু সংবাদ শুনে রাজা কি তবে আরও এক বাহিনী পাঠালেন!

অগ্রগামী বাহিনী বিপদ সংকেতের ধ্বনি তুলল। সকলে সভয়ে বলে উঠলেন,—কৃষ্ণ কোথায়? কেশীকে তিনিই যমালয়ে পাঠিয়েছেন। আমাদের এই সংকট মুহূর্তে সেই কেশব কৃষ্ণ কোথায় গেলেন!

বৃদ্ধ গোপেদের আর্তনাদ শুনে বলরাম এক টুকরো বিমর্ষ হাসি হেসে বললেন, —আপনারা নির্ভাবনায় নন্দালয়ে গিয়ে বিশ্রাম করুন। ঐ রথ আমরা শুধু গোশকটের ভারি ভারি চাকা ছুঁড়েই চুরমার করে দিতে পারব। তবে হয়ত তার দরকারও হবে না। রথে ও ঘোরসওয়ারদের হাতে সাদা পতাকা উড়তে দেখা যাচ্ছে।

নন্দ বললেন,—ঐ পতাকাকে বিশ্বাস কি? আমাদের বোকা বানাবার জন্যও তো ওরা ঐ পতাকা দেখাতে পারে।

বলরাম বললেন,—রাজা কংস উগ্রমতি হতে পারেন, কিন্তু তিনি বীর। কোনো প্রকৃত বীরপুরুষ যুদ্ধে ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করেন না। রণ-ক্ষেত্রে ছলনার আশ্রয় নেওয়া অত্যন্ত হীন কাজ। যদি তা-ই-ই হয়, আমি ওদের প্রত্যেককে আছড়ে মারব!

ঠিক এই সময় হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এলো সুনন্দ কন্যা গৌরী।

নন্দ বিস্মিত হয়ে বললেন,—কী হয়েছে তোর গৌরী। মুখে কপালে কাটা দাগ কেন?

লজ্জারুণ মুখে গৌরী বলল,—ও কিছু নয়। পড়ে গেছি!—তারপর সন্ত্রস্ত কণ্ঠে জানালো, কৃষ্ণ একাকী আছে গোবর্ধন পর্বতের কাছে। তার বিপদ হতে পারে।

নন্দ নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে বললেন,—ডরো মৎ বেটি! কানু ঠিক হ্যায়!

নন্দ জানতেন, কৃষ্ণ কখনই একা থাকেন না। দেবতারা তাঁকে অলক্ষ্যে পাহারা দেন। ঋষি গর্গ বলেছেন, দেবদূতেরা কৃষ্ণের ওপর সব সময় নজর রাখেন। কৃষ্ণ সর্বদাই সুরক্ষিত আর যতক্ষণ কৃষ্ণ আছেন গোকুলে, ততক্ষণ বৃন্দাবনও নির্ভয়।

শাদা রঙের বিচিত্র নকসাকাটা রথটি ক্রমশ স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। রথে উপবিষ্ট রাজপুরুষ নন্দর অপরিচিত। তা হোক। রথী বা ঘোড় সওয়ার, কারোকেই যুদ্ধার্থী মনে হচ্ছে না। কেউ অস্ত্র ধারণ করেন নি।

অগ্রগামী শ্রেণীর অদূরে রথ থামিয়ে সেই সৌম্যকান্তি রাজপুরুষ নেমে দাঁড়ালেন। একজন ঘোড়সওয়ার এগিয়ে এসে ঘোষণা করল, রাজদূত দানপতি অক্রুর গোপপ্রধান নন্দকে অভিবাদন জানাচ্ছেন।

রাজদূত জানাচ্ছেন সামান্য নন্দগোপকে অভিবাদন! নন্দের মুখে বাক্যস্ফূর্তি হয় না। তিনি সুনন্দ প্রমুখ বৃদ্ধ গোপদের দিকে সগর্বে তাকান। দৃষ্টি বিনিময় করে বলরামের মতামত জানতে চান। আর ঠিক এই সময় সকলের পেছনে কে যেন অভিবাদন জ্ঞাপক বিষাণ ধ্বনি করে রাজদূতকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করে। সকলে তাকিয়ে দেখেন, বিষাণবাদক অন্য কেউ নন, স্বয়ং কৃষ্ণ।

—কৃষ্ণ, কৃষ্ণ! বিদ্যুৎ শিহরণের মতো ফিসফাস শব্দ এক মুখ থেকে অন্য মুখে ছড়িয়ে পড়ে।

কৃষ্ণ বলেন,—স্বাগতম, দানপতি অক্রুর।

সঙ্গে সঙ্গে গোপেরা অক্রুরের নামে জয়ধ্বনি দিয়ে ওঠে। সব আশঙ্কা ও ভীতির অবসান হয়। নন্দ ও কৃষ্ণ এগিয়ে গিয়ে অক্রুরকে সসম্ভ্রমে নন্দালয়ে নিয়ে আসেন। সঙ্গে আসে জনতা। নন্দের নির্দেশে কয়েক জন দৌড়ে ভেতরে যায়। অক্রুরকে পাদ্যার্ঘ নিবেদন করে আপ্যায়নের আয়োজন করতে হবে।

কৃষ্ণ ও নন্দকে একান্তে ডেকে নিয়ে অক্রুর জানান তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য। কৃষ্ণকে প্রশংসা করেন কেশী বধের জন্য। বলেন,—আমি কংসের মহামিত্ররূপে পরিচিত বটে, কিন্তু প্রচ্ছন্নভাবে তার মৃত্যু কামনাই করি। হে কৃষ্ণ! তুমি আমার পরমাত্মীয়। মথুরাকে কংস প্রভাব মুক্ত করে এবার তুমি তোমার পিতা ও মাতা বসুদেব ও দেবকীকে নির্ভয় করো। তোমার নেতৃত্বের অপেক্ষায় মথুরার কংসবিরোধী চক্র বসুদেবের পরিচালনায় সম্পূর্ণ তৈরী আছেন। আমাদের লোক ছড়িয়ে আছে অস্ত্রাগারে, কোষাগারে, সৈন্য বাহিনীতে এবং এমনকি রাজার দেহরক্ষী বাহিনী ও রাজান্তঃপুরেও। মথুরার সীমান্ত প্রহরায় নিযুক্ত আছেন বিষ্ণুর সুশিক্ষিত বাহিনী মহাত্মা বিষ্ণুব্রতের অধীনে। সব ব্যবস্থাই প্রস্তুত। কংসের দাস যারা তারাও জানে না এই বিরাট প্রস্তুতির কথা। তবে মহাবল কৃতবর্মার মতো তাঁদের মধ্যেও শক্তিশালী যাদবের অভাব নেই। তাই সব কাজই খুব সতর্কতার সঙ্গে করতে হবে।

মৃদু হেসে কৃষ্ণ বলেন,—আমি সব কিছুই শুনেছি। স্বয়ং দেবর্ষি নারদ আমাকে অগ্রজ বলরামের সঙ্গে আগামীকাল মথুরা যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে গেছেন।

অক্রুর বললেন,—আমি তোমাদের নিতে এসেছি। তবে এসেছি ধনুর্যজ্ঞে কংস তোমাদের বধ করার যে আয়োজন করেছেন, তাকেই সফল করে তোলার নির্দেশ নিয়ে।

কৃষ্ণ হাসলেন।

নন্দ বললেন,—বলরাম কোথায়?

না, বলরাম বা গোরীকে সেই উল্লসিত জনতার মধ্যে দেখা গেল না।

মুখে মুখে রটে গেল কংসদূত অক্রুরের আগমন বার্তা। পল্লবিত হতে থাকল কত কথা। কেউ বলে, ক্রুর অক্রুর এসেছেন কৃষ্ণকে ভুলিয়ে নিয়ে যেতে। মথুরায়

গিয়ে ব্রজনন্দনকে তিনি তুলে দেবেন হিংস্র কংসের হাতে। কেউ বলে, না হে না! কৃষ্ণের বড় লালস। সে নিজেই চায় মথুরাপতি হতে। মানুষের কি চাওয়ার শেষ আছে। গোপেরা তাকে বানিয়েছে মাথার মণি। নেতা। কিন্তু উচ্চাভিলাষী কৃষ্ণের তাতে তৃপ্তি নেই। সে রাজ মুকুট মাথায় পরবে। রাজা হবে মথুরায় গিয়ে। কেউ আক্ষেপ করে বলে, হায়! বিনাকৃষ্ণ বৃন্দাবন যে অন্ধকার হয়ে যাবে। কৃষ্ণ তাকে কংসভয় থেকে মুক্ত করেছে। তাই গাছে ফুটছে ফুল। রাখালের বেণুধ্বনিতে বাজছে গোধূলির প্রশান্তি। নন্দরাণীর চোখে ঝরছে আনন্দাশ্রু আর গোপিনীরা রতি বিলাসিনী হয়ে সর্বাঙ্গে আঁকছে রতিচিহ্ন। কৃষ্ণের বাহুবলে গোপরাজ নন্দ হয়েছেন পরম নিশ্চিন্ত। সেই বৃন্দাবনমালী মথুরায় গেলে বৃন্দাবনের আকাশে আর কখনো কি সোনার থালার মতো চাঁদ উঠবে? রাসমণ্ডলে রসবতী গোপিনীদের অঙ্গের বসন বাতাসে খসে পড়বে কি রমণবিলাসী কৃষ্ণের দুরন্ত আশ্লেষে? ঠিক যেমন করে মন্দ বাতাসে পত্রাচ্ছাদন সরে গেলে ফলবতী বৃক্ষের সুপক্ক সুডৌল অমৃত ফল প্রকাশ পায়, কৃষ্ণের রমণপটু হাতের ছোঁয়ায় তেমনিভাবেই খসে পড়ে যুবতী নারীর কাঁচলি। গোকুলের গোপিনীরা কি কৃষ্ণ বিরহে হাহাকার করবে না?

এসব বিতণ্ডায় কৃষ্ণস্তুতি যেমন, ঈর্ষান্বিত মাতব্বরদের বিরাগও তেমনি প্রকট হয়ে ওঠে।

কথা নেই শুধু একজনের মুখে। বিষাদ প্রতিমা সেই গোরী ধীরে ধীরে নন্দরাণীর কাছে এসে দাওয়ার চকমেলানো থামে ক্লান্ত দেহভার এলিয়ে নিঃশব্দে দাঁড়ায়। তার মাথায় বাঁধা কেশদাম এখন পিঠের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে। চোখের কাজল রক্তাভ গালের ওপর মসীলেখ সৃষ্টি করে এক নোতুন শোভায় সাজিয়েছে সেই গৌরী মুখ। কৃষ্ণগরবে তার চোখের তারাদুটি সর্বদা উজ্জল ও কটাক্ষপটু ছিল, এখন তা দুটি স্তব্ধ দীঘির মতো নির্জন আর স্থির হয়ে গেছে।

যশোদা পেছন ফিরে রোহিণী ও অন্যান্য গোপিনীদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। গোরীর পায়ে শব্দ ছিল না, তাই তার অস্তিত্ব টের পাননি। গোরীকে প্রথম রোহিণীই দেখলেন। রাজপরিবারের মেয়ে রোহিণী গোরীর চেহারা দেখেই বুঝলেন, সংবাদ এমন যার সঙ্গে অবশ্যই কৃষ্ণ জড়িত। তা না হলে সদা-চঞ্চলা গোরীকে এমন শ্বেতপাথরের মূর্তির মতো নিষ্প্রাণ দেখাতো না।

রোহিণী বললেন—আয় গোরী, আমাদের কাছে এসে বোস্। কী হয়েছে তোর?

যশোদা মুখ ফিরিয়ে বললেন—হাঁ রে? কানু ফিরেছে? বাইরে কে এলেন?

গোরী হঠাৎ দুহাতে মুখ ঢেকে দৌড়ে উঠান পেরিয়ে চলে যেতে যেতে বলল,—হম্ নহি জানে। কুছ নহি জানে!

যশোদা ও রোহিণী চিৎকার করে বললেন,—আরে শুন্ গোরী। শুন্। মৎ যা।

কিন্তু কে কার কথা শোনে। যে জলধারা উপল আকীর্ণ পথে ঝুম ঝুম করে বিভিন্ন বিভঙ্গে ধেয়ে বেড়াত, সে যেন হঠাৎ কোনো অবলম্বনহীন খাদেব মুখে এসে দিশাহারা হয়ে ঝপ্ করে অতল গহ্বরে অদৃশ্য হয়ে গেল, কারো পিছুডাকেই বাধা গেল না উন্মাদিনীকে।

যশোদা কপাল চাপড়ে কাঁদতে বসলেন পা ছড়িয়ে। হায়, হায়, কী হল। আমার কানু কোথায়? গোরী কেন এমন কবে চলে গেল গো। ওরে, তোরা একবার খবর কর বাইরে গিয়ে। ও দিদি, আমি কী করব? কোথায় যাব?

রোহিণী যেন সবই বুঝতে পারেন। বোঝেন, সময় হয়েছে। অরিষ্ট, বৃষ, কেশী নিহত হয়েছে একে একে। মথুরা থেকে এসেছেন দানপতি অক্রূর। এবার ব্রজের পালা শেষ। তাঁরও অপেক্ষাব রাত্রি অবসিত হতে চলল। নিশ্চয় এসেছে বসুদেবেব আহ্বান। কৃষ্ণ ও বলরামের সঙ্গে তিনিও ফিরে যাবেন আপন ঘরে। পড়ে থাকবেন যশোদা। পড়ে থাকবে তাঁর সামনে ধু-ধু শূন্য প্রান্তর আর মূক গবাদি পশুর দল। গোঠে গোঠে যখন ধেনু চরবে, যশোরাণী তখন এই দাওয়ায় একাকিনী দাঁড়িয়ে থাকবেন। গোধূলি আব কখনো তাঁকে ব্যাকুল করবে না, কেননা কৃষ্ণও চারণক্ষেত্র থেকে আর কোনাদিন ফিরে এসে যশোদাব আঁচলে তার পরিশ্রান্ত মুখের স্বেদকণা মুছে নিতে আসবে না।

এইসব ভাবতে ভাবতে যশোর সরল সুগোল মুখখানির দিকে তাকিয়ে রোহিণী বেদনা অনুভব করার চেষ্টা করে দেখলেন, ঘরে ফেরার আনন্দ তাঁকে এখন এমনই উতলা করেছে যে, নন্দরাণীর বেদনাকে তিনি অনুভব করতে পারছেন না। অথচ এতোদিন এই বোকাহাবা ও উদার গোপরাণী কত যত্নেই না তাঁকে নিবিড় আত্মীয় বন্ধনে বেঁধেছিলেন। একটা ছোট নিঃশ্বাস শুধু বুক ঠেলে বেরিয়ে এলো রোহিণীর। পরের দুঃখে কেমন করে কাঁদতে হয়, রাজপুরুষের সংসারে যাদের জন্ম, তারা তা জানে না। রোহিণীও যে তেমনভাবে কাঁদতে শেখেন নি। তিনি কী বলে সান্ত্বনা দেবেন সর্বহারা যশোদাকে?

১৮

অক্রূরকে প্রথমে দেখে নন্দর ভালো লেগেছিল। অমন একটা ঝকমকে পোষাক-পরা রাজপুরুষ রথ থেকে নেমেই সবার সামনে নন্দকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন,—এতে নন্দের আর অহ্লাদের সীমা ছিল না। বসুদেবের কথা মনে পড়েছিল। বসুদেব বলেছিলেন, সময় এলে তুমিও মথুরাব রাজবাড়িতে যাবে, নন্দ। ইতিহাসে তোমার নাম থাকবে। অক্রূরের ব্যবহারে নন্দব মনে হয়েছিল, এতো-দিনে সেই সময়ই বুঝি এলো।

তিনি মাথা ঘুরিয়ে জনতার দিকে তাকিয়ে সগর্বে বলেছিলেন,—তোমরা এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিড় বাড়াচ্ছ কেন? যে যার কাজে যাও। ওনাকে বিশ্রাম করতে দাও এখন।—আর এইসব কথা বলার সময় নিজেকে রাজা-উজির ভাবতে ভালো লাগছিল নন্দর।

ভিড় সরে গেলে অক্রূরের সেই অমায়িক রূপ কিন্তু পাল্টে গেল। তিনি গম্ভীর হয়ে গেলেন। কঠিন আদেশের সুরে নন্দকে বললেন,—হাতে আমাদের বেশি সময় নেই। আগামী কালই যাত্রা করতে হবে। কংসর আদেশ, মথুরায় এক ধনুর্যজ্ঞের অনুষ্ঠান হবে। সেখানে যত দই মিষ্টি ক্ষীর ননী লাগবে, সব কিছুর যোগান দিতে হবে গোপেদের। সুতরাং আর আয়েস করবেন না। সবাইকে নিয়ে প্রস্তুত হোন!

কৃষ্ণ ও বলরামকে নিয়ে অক্রূর একটা ঘরে ঢুকে দোর বন্ধ করে দিলেন নন্দর মুখের ওপর। স্তম্ভিত নন্দ সেই বন্ধ-দোরের সামনে দাঁড়িয়ে শিহরিত হলেন। বুঝলেন, এতোক্ষণ তিনি একটা স্বপ্ন দেখছিলেন, যার বন্ধের শব্দে সে স্বপ্ন হঠাৎ ভেঙে গেছে। শিথিল দেহে তিনি সেই দোরের কাছে বসে পড়লেন। প্রথমে দুচোখ ঝাপসা হয়ে এলো, তারপর হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে নিঃশব্দে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলেন। কিছুক্ষণ এইভাবে আঘাতটা সহ্য করে নিয়ে নন্দ আবার উঠে দাঁড়ালেন। চললেন গ্রামের দিকে। কংসর আদেশ। সারা রাত ধরে সবাইকে

নিয়ে কাজ করতে হবে। রাজপুরুষরা ঘরে দোর দিয়ে সভা করছেন। নন্দকে রাজসেবায় ব্যস্ত থাকতে হবে। স্বয়ং অক্রুর এসেছেন রাজার আদেশ নিয়ে।

অনেক রাত পর্যন্ত যাত্রার আয়োজন তদারকি করেছেন নন্দ। গৃহে ফিরে কিছু আর মুখে দেন নি। নিকষ কালো রাতের আকাশে চোখ রেখে বহির্বাটির দাওয়ায় ছায়ার মতো বসেছিলেন তিনি। তাঁর শরীরে ইন্দ্রগোপ নামক এক জাতের ডাঁশ মহানন্দে দংশন করছিল, কিন্তু নন্দের অনুভূতি লোপ পেয়েছে, তিনি কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। চারিদিকের স্তব্ধতায় একটানা বেজে যাচ্ছিল ঝিঁঝি-পোকার পাখনা ঘষার শব্দ।

এক সময় নন্দের মনে হল, আর একটি ভারি ছায়ামূর্তি যেন তাঁর পাশে এসে বসেছে। নন্দ চমকে চোখ ফেরালেন,—এ কী, যশো! ঘুমোওনি?

পৃথিবী রসাতলে ডুবলেও যে যশোদা ভারি শরীর নিয়ে একটি বার গড়িয়ে না নিয়ে পারেন না, তিনি আজ মধ্য রাত্রি পর্যন্ত বিনিদ্র তো বটেই, আবার সামান্য কারণে ক্রন্দনশীলা সেই রমণী আজ পাষাণের মতো নিষ্প্রাণ!

নন্দ যশোকে এক হাতে বেষ্টন করে বললেন,—বড্ড কষ্ট হচ্ছে, না?

যশোদা তাঁর অশ্রুসিক্ত মুখ স্বামীর বুকে চেপে ধরে রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন,—কানু আমার আজ খেতেও আসেনি গো! কালই সে চলে যাবে, বাছার মুখটাও আজ দেখতে পেলাম না সারা দিনে।

নন্দ উত্তর করলেন না। স্বকৃত একটা পাপবোধে তিনি এখন মূক হয়ে গেছেন। কী সান্ত্বনা দেবেন যশোদাকে। কৃষ্ণের আসল পরিচয় তিনি আগেই জেনেছেন কিন্তু যশোদা পাছে কষ্ট পায় এজন্য তাকে জানাতে পারেন নি। আগে জানালেই বোধহয় ভালো হত। হারানোর কষ্টটা আস্তে আস্তে সয়ে যেত যশোদার। কিন্তু তিনি তো ভাবতে পারেন নি কৃষ্ণ একদিন এইভাবে অকৃতজ্ঞের মতো তাঁদের ছেড়ে চলে যাবে। মনে মনে ক্ষীণ আশা ছিল, মথুরায় গেলে কৃষ্ণ নিশ্চয় নন্দ ও যশোদাকেও সঙ্গে নিয়ে যাবে। বসুদেব বলেছিলেন, কৃষ্ণের সঙ্গে তুমি ও যশোদাও অমর হয়ে থাকবে নন্দ। এতোবড় সৌভাগ্য গোয়ালাকুলে আর কখনো কারো ভাগ্যে হবে না। তাতেই নন্দের ধারণা হয়েছিল, কৃষ্ণের উন্নতির অর্থ, নন্দ যশোদারও উত্তরণ। তাঁরাও হবেন রাজপরিবারভুক্ত এবং শ্রীকৃষ্ণের আরাধ্য পিতামাতা। কিন্তু সবটাই ভুল।

অক্রূর শুধু কৃষ্ণকেই নিতে এসেছেন। নন্দের দিকে ফিরে তাকাবার অবসর নেই তাঁর। অবহেলিত নন্দ যেন অক্রূরের খাস তালুকের প্রজা। মালিকী মেজাজ। আর আশ্চর্য, নন্দ দেখলেন, কৃষ্ণের স্বরূপও পাল্টে গেছে। তার চোখেও যেন ভারি তুচ্ছ হযে গেছেন গোপপ্রধান নন্দ। কৃষ্ণ অক্রূরের আদেশ সমর্থন করল এবং অক্রূরকে নিয়ে দ্বার রুদ্ধ করে মশগুল হয়ে গেল রাজকীয় পরামর্শে। সারাদিন পরে ঘরে ফিরে একবার যশোদাকে দেখা দিয়ে আসা তার নিত্যকর্ম, কৃষ্ণ আজ সেকথাও ভুলে গেল!

হতাশ নন্দ তখন মনে মনে নিজেকে তিরস্কার করে বললেন, বেইমানির ফল কখনো ভালো হয় না। মনে মনে যে মুহূর্তে আমি গোপেদের সঙ্গে বেই-মানির ফন্দি এঁটেছি, সেইমাত্র তার সাজা পেয়েছি। কিন্তু বসুদেব? বন্ধুর ছদ্মবেশে তার এই নিষ্ঠুর বেইমানির সাজা কি বিধাতা তাকে দেবেন? একথা ভেবে নিজেই আবার মাথা দুলিয়ে ফিসফিস করে নন্দ নিজেকে বলেছেন,—না! বিধাতাও বড় মানুষের কেনা গোলাম। তিনিও উৎকোচ গ্রহণ করেন। বড় মানুষের পাপের সাজা হয় না।

যশোদা একসময় নিদ্রালু কণ্ঠে জড়িয়ে জড়িয়ে বললেন,—হ্যাঁ গা, কৃষ্ণ নাকি আমাদের ছেলে নয়? সবাই তাকে বাসুদেব বলছে? রোহিণীদিদিকে জিজ্ঞেস করলাম, দিদি বলল, দুঃখ করিস না যশো, তুই কানুর গর্ভধারিণী নোস বটে, তবে তুই-ই তার আসল মা!

নন্দর বুক থেকে যেন একটা পাষাণ নেমে গেল। ঠিক এই রকম কিছু একটা তিনিও বলতে চাইছিলেন, কিন্তু ভাষা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। এখন উৎসাহিত হয়ে বললেন,—রোহিণী বলেছে? ঠিকই বলেছে রে যশো, তুই-ই তো তার আসল মা।

যশোদা হাসলেন। বড় করুণ, বড় উদাস সেই হাসি। বললেন,—আমি এক কোকিলের মা গো, তুমি যেমন রাজপুতের বাপ গোয়ালা রাজা। বলেই আবার উচ্চস্বরে হেসে উঠে পরক্ষণেই কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

নন্দ বললেন,—আর কাঁদিসনে যশো! বসুদেব বেইমানি করেছে। বেইমানি করেছে আমাদের সঙ্গে, কংসের সঙ্গে, মথুরার সমস্ত মানুষের সঙ্গে। তার জন্যেই কংস উন্মাদ হয়ে মথুরার কত মায়ের বুক খালি করে তাদের শিশুকে হত্যা করেছে। আমাদের বুকও খালি হয়ে গেল। তবু আনন্দ কর যশো,

আনন্দ কর! কানু আমাদের রাজা হবে। ছেলে রাজা হয়েছে জেনেই তো বাপ মায়ের সুখ। আজ সুখের দিনে আর চোখের জল ফেলিস না। তাতে যে তোর কানুরই অমঙ্গল হবে রে!

যশোদা আঁচল দিয়ে চোখ মুছে বললেন,—হ্যাঁ। আমি কেন কাঁদব। কানু তো রাজা হবে। সে তার আর এক মা বাপ পাবে। সুখী হোক। ভগমান তাকে ভালো রাখুন। না! আমি কেন কাঁদব গো।

বলতে বলতে মুখে আঁচল গুঁজে উঠে গেলেন যশোদা।

নন্দ দেখলেন, যে ভাবে গোবর্ধন পর্বত একদিন কেঁপে কেঁপে ফেটেফুটে চৌচির হয়ে যাচ্ছিল, যশোদার ভারি শরীরটাও তেমনি ভাবে কাঁপছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নন্দ মনে মনে বললেন,—যাবার আগে গোবর্ধন আর যশো, এই দুটোকেই তুই চুরচুর করে ভেঙে দিয়ে গেলি, বাপ্! তোর উন্নতি হোক!

মানুষের চোখের জলে মাটি ভেজে না, প্রকৃতি বড় নিষ্ঠুর। মানুষের হাহাকারে জ্যোৎস্নার সোনারঙ মুছে যায় না, চাঁদ বড় কর্তব্যপরায়ণ। কারো ব্যাকুল প্রার্থনা শুনে সূর্য কখনো দেরি করে উদিত হয় না, দিনমণির মন বড় কঠিন।

তাই যথানিয়মে বৃন্দাবনের পূব আকাশে রাশিকৃত কৃষ্ণচূড়ার পাপড়ি বিছিয়ে কর্মব্যস্ত সূর্যের রথ ঘড় ঘড় করে এসে পড়ল। সেই শব্দে পাখিরা কলরব করে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে, বাথানে বাথানে গো মহিষরা ডাকাডাকি শুরু করল আর গোপ-শ্রমিকরা ত্রস্ত ব্যস্ত হয়ে শকটে বলদ জুতে হৈ হৈ শব্দে মালপত্তর মজুত করতে শুরু করে দিল।

যশোদা থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে বন্ধ দোরের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে ছিলেন। রাতের আলাপ শেষ করে কৃষ্ণ এইবার বেরিয়ে আসবে। বাছা তাঁর সারা রাত না ঘুমিয়ে কাটিয়েছে! দিনেও ধকল গেছে অনেক। যশোদা তাই দুধ গরম করে সন্দেশের থালা নিয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছেন।

নন্দও দ্বারের কাছে হাজির। তাঁর একটি শেষ প্রার্থনা আছে। দুরু দুরু বুকে সেই প্রার্থনাটাই মনে মনে জপ করছেন তিনি।

দ্বার খুলে অক্রুর কৃষ্ণ ও বলরাম বেরিয়ে এলেন।

নন্দকে দেখেই কৃষ্ণ বললেন,—এই যে, আপনি প্রস্তুত? আর তো দেরি করা উচিত নয়। বেরিয়ে পড়ুন সবাই।

নন্দ জপকরা কথাগুলো ভুলে গেলেন। যাই যাই ভাব করে একটু ইতস্তত করলেন।

অক্রুর ব্যস্তভাবে বললেন,—চলুন দেখি আয়োজনটা তদারক করে আসি।

কৃষ্ণ এদিক ওদিক তাকিয়ে বললেন,—শ্রীদাম সুদামরা প্রস্তুত হয়ে এসেছে?

নন্দ বললেন,—ঐদিকে। তোমরা এগোও, আমি বলাই-এর সঙ্গে দুটো কথা বলেই আসছি।

থামের আড়াল থেকে যশোদা বললেন,—কানু! দুধ আর সন্দেশটুকু মুখে দিয়ে যা, বাবা!

কথাটা শুনে কৃষ্ণ একবার অক্রূরের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। তারপর দ্রুত যেতে যেতে বললেন,—রথে তুলে দিতে বলো! যেতে যেতে খাওয়া সেরে নেবো আমরা।—অক্রুরকে বললেন,—আসুন, দানপতি!

বলরাম এগিয়ে এলেন। নন্দ ও যশোদাকে প্রণাম করে যশোদাকে বললেন,—মা! আমি বুঝি তোমার ছেলে নয়, আমাকে একটা সন্দেশ দেবে না?

শুনে নন্দর দুচোখ জলে ভরে গেল আর হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলেন যশোদা বলরামকে বুকে জড়িয়ে। তার মুখে গুঁজে দিলেন হাতের তৈরী সন্দেশ।

নন্দ দীন কণ্ঠে বললেন,—বাবা বলাই। আমাকে কি তোমাদের সঙ্গে নিতে পার না? আমাদের গরু গাড়ি আস্তে যাবে। তোমাদের রথ হু হু করে ছুটবে। তাই বলছিলুম, তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে গেলে তোমাদের দুটিকে আরও কিছুক্ষণ দুচোখ ভরে দেখতে পাবো, বাবা!

বলরামের চোখ ফেটে জল আসে।

তিনি বলেন,—সে তো খুবই ভালো হয়! আমি এখনই গিয়ে কৃষ্ণকে বলছি।

বাইরে এসে বলরাম দেখলেন, কৃষ্ণ ও অক্রুর ভীষণ ব্যস্ত। কৃষ্ণ তাঁর শিক্ষিত ঝটিকা বাহিনীকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে শেষ নির্দেশ দিচ্ছেন। মথুরায় এই দল যাবে নন্দের মালপত্রের সঙ্গে বোকা-সোকা রাখাল সেজে। গাড়িগুলিতে লুকিয়ে নিয়ে যেতে হবে তাদের লৌহহস্তগুলি আর কিছু অস্ত্রশস্ত্র। মথুরা নগরীতে গিয়ে শ্রমিকদের হাতে গাড়ি ছেড়ে দিয়ে তারা শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে

বসুদেব অনুচরদের বাড়ি বাড়ি গা ঢাকা দেবে। সংবাদ পেলেই বেরিয়ে পড়বে লড়াইয়ের জন্য।

অক্রূরের আশঙ্কা, কংস নিহত হলে মথুরার পথে পথে ছোটখাটো গৃহযুদ্ধ বেধে যেতে পারে। তাছাড়া প্রথমেই কৃষ্ণ বলরামকে অস্ত্রাগার দখল করতে হবে। যদিও সেখানে অক্রূরের গুপ্তচররাও প্রস্তুত, তবু কৃষ্ণবাহিনীর অতর্কিত আক্রমণই হবে অস্ত্রাগার দখলের সর্বোত্তম উপায়। বাধা আসবে, তাই সাবধানে সব কাজ গুছিয়ে তুলতে হবে কৃষ্ণ বাহিনীকে।

বলরাম আসতে কৃষ্ণ ও অক্রূর বললেন,—আপনার দলকে যথাযথ নির্দেশ দিয়েছেন তো?

বলরাম নিরুদ্বিগ্ন কণ্ঠে উত্তর দিলেন,—আমার দলের কাজ তো ধনুর্যজ্ঞের মল্লভূমিতে। আমি নিজেও সেখানে উপস্থিত থাকব। সুতরাং ওদিকটা আপনাদের চিন্তা করতে হবে না।

অক্রূর স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন,—নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। তবে মনে রাখবেন, কংসের মল্লবীরেরাও দুর্দান্ত। বলবীর্যে তারা এক একজন এক একটা ছোটখাটো জরাসন্ধ।

বলরাম হেসে বললেন,—আপনাদের মত করিৎকর্মা ব্যক্তি যখন আমাদের সহায়, বীরত্ব তখন অন্তর্ঘাতের মুখে কতক্ষণ দাঁড়াবে। একা বিভীষণ লঙ্কা ধ্বংসে রামচন্দ্রের জয়ের পথ সুগম করেছিলেন আর আপনারা এতোজন থাকতে আমরা হেরে যাব।

শুনে অক্রূর মাথা নত করলেন। কৃষ্ণ বিরক্ত হয়ে বললেন,—তাহলে আর বিলম্ব কেন, যাত্রা শুরু হোক!

বলরাম বললেন,—অত ব্যস্ততারই বা দরকার কি? আমরা সেখানে না পৌছানো পর্যন্ত কোনো কাজ আরম্ভ হবে না। এ যজ্ঞে যখন কৃষ্ণই উদ্দেশ্য...

অক্রূর ও কৃষ্ণের মনে হল, বলরামের ঠোঁটের কোণে যেন এক টুকরো ব্যঙ্গের হাসি গড়িয়ে পড়ছে।

বলরাম বললেন,—আমাদের সঙ্গে পিতা নন্দ রথে যেতে পারেন। কিছু সময় তিনি আমাদের সঙ্গ পেলে বিচ্ছেদের বেদনা ভুলে থাকবেন।

অক্রূর তিক্ত রস গলাধঃকরণের মতো মুখবিকৃতি করে বললেন,—সে কী! সে কী করে সম্ভব হয়। কংসপ্রজা যাবে কংসের রথে?

বলরাম বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন,—কংসপ্রজা তো আমরাও!

—ভুল করছেন, আপনারা রাজ-পরিবারভুক্ত। আপনারা দুজনেই কংসের ভাগিনেয়। তাছাড়া আপনাদের নিয়ে যেতেই রাজা রথ পাঠিয়েছেন।

কৃষ্ণ এবার গম্ভীর কঠিন কণ্ঠে বললেন,—দাদা! আপনি কি প্রত্যুষেই আপনার প্রিয় সোমরস সেবন করেছেন? আপনি কি ভুলে যাচ্ছেন, বহু আগেই ঋষি গর্গের কাছে আমরা আমাদের সঠিক পরিচয় জেনেছি। জেনেছি, গোপেরা আমাদের প্রজামাত্র এবং তারা দেবনির্দিষ্ট চতুর্বর্গের মধ্যে অন্ত্যজ শ্রেণীভুক্ত! আপনি এদের সঙ্গে নিজেকে অতঃপর আর একাসনভুক্ত করেন কেন? হৃদয়াবেগ নামক ব্যাধি থেকে দেবকার্যে নিযুক্ত ক্ষত্রিয় সমাজকে সাবধানে মুক্ত থাকতে হয়।

অক্রুর বললেন,—সাধু সাধু! আপনার শিক্ষা সার্থক! হে গোবিন্দ! যথার্থই আপনি উপেন্দ্র পদের উপযুক্ত। হে কেশব, আপনার দ্বারা জগতে বহু বিচিত্র অসম্ভব কার্য সাধিত হবে। দেবতারা প্রতিনিধি নির্বাচনে কখনো ভুল করেন না।

দেবতাদের মতোই স্তুতিবাদে তুষ্ট কৃষ্ণ স্মিত হাস্যে তখন বলরামকে বললেন, —আমাদের সামনে এখন একটাই লক্ষ্য, দেবানুমোদিত ধর্মরাজ্য স্থাপন। আমাদের অনুভূতিগুলি আমাদের সংস্কারের দাসত্ব করে। গোপজীবনের সংস্কার ত্যাগ করে ধর্মরাজ্যর সংস্কার সর্বান্তকরণে গ্রহণ করতে না পারলে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার শ্রেয় কর্তব্য পালন বিঘ্নিত হবে। আর আপনি তো জানেন দাদা, চাতুর্বর্ণের ভিত্তির ওপরেই এই ধর্মরাজ্যর দুর্ভেদ্য দুর্গ যুগ যুগ স্থায়ী হবে। সুতরাং মনকে বিচলিত হওয়ার সুযোগ দেবেন না।

বলরাম একটি ভারি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে প্রত্যাবর্তন করলেন। মনে মনে বললেন, একটি অমারাত্রির ঘোরান্ধকার তার রক্তপায়ী বাতুলি-পক্ষ বিস্তার করেছে। হে বৃন্দাবন! তুমি আমার প্রণাম ও চির বিদায়ের প্রীতি সম্ভাষণ গ্রহণ করো! বিফল আমি, স্নেহাতুর পিতা এবং জননীর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারব না।

বলরাম বহিরাঙ্গন থেকেই রথে উঠে বসলেন।

যমুনার জল আজ মৃত্যুর মতো নীল, চরাচর ধুয়ে ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে ভোরের আলো। বৃন্দাবন মথুরার পথে এখনও লোক চলাচল শুরু হয়নি। পথের এক পাশে নদী, অপর পারে অন্ধকার বনাঞ্চল।

তারের বাজনা হাতে একমাত্র এক উদাস সন্ন্যাসী গান গাইতে গাইতে মথুরার দিক থেকে হেঁটে আসছেন।

সন্ন্যাসী দেখলেন, গৌর বরণ এক সুন্দরী কিশোরী বন ঝোপের আড়ালে আড়ালে মথুরার দিকে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। রাই পাগলিনী মূর্তি।

এমন একটি নিঃসঙ্গ ফুটফুটে কিশোরীকে দেখে সন্ন্যাসী থমকে দাঁড়ান। মনে মনে বলেন, আহা! পশ্চিমের চাঁদ যেন নিভে গেছে! নির্দয় সূর্য কি তাকে ফেলে পূব মুখো রথ ছুটিয়েছেন? এতো বিষাদ কেন এমন প্রতিমার মুখে?

সন্ন্যাসী মুখে মুখে গান বাঁধেন। কিশোরীকে এক ঝলক দেখেই তাঁর হাতের বাজনা বেজে ওঠে। গান ধরেন নির্জন পথে!

মোহি তেজি পিয়া মোর গেল বিদেশ।
কোন পরি খেপব বারি ব এস॥
* * * * * * * *
সুমরি সুমরি চিত নাহি রহ থির।
মদন-দহন তন, দগধ শরীর॥[১]

গান শুনে মেয়েটি থমকে দাঁড়ায়। তার দুই চোখে গঙ্গা-যমুনা উথলে নামে। মাথা নুইয়ে প্রণাম জানায় সন্ন্যাসী ঠাকুরকে।

সন্ন্যাসীর হৃদয় থাকলেও মনটান থাকতে নেই। মেয়েটির অন্তর ভেদ করে তাঁর দৃষ্টি চলে। বুঝতে পারেন, এ মেয়ে বড় রিক্ত। জীবন এর কাছ থেকে সর্বস্ব হরণ করেছে। মাথায় হাত রাখেন। বলেন,—শান্ত হো? কিন্তু অভিভূত হলে চলে না তাঁদের। তিনি বেদনার রস নিজের হৃদয়ে আস্বাদ করেন। সজল হয় মন। বুঝি বা ভয় পান নিজের চিত্ত বিকারে। তাই আর দাঁড়ান না। নতুন গানের কলি গুনগুন করতে করতে এগিয়ে যান মেয়েটিকে পেছনে ফেলে।

কিশোরী শোনে, ক্রমশ মিলিয়ে-যাওয়া সেই সন্ন্যাসীর দরদভরা কণ্ঠের আর্তি!

শূন ভেল মন্দির, শূন ভেল নগরী।
শূন ভেল দশদিশ, শূন ভেল সগরী॥
কৈসনে যাওব যমুনা-তীর।
কৈসে নিহারব কুঞ্জ-কুটীর॥[২]

মিলিয়ে যান সন্ন্যাসী দূর পথের বাঁকে। মিলিয়ে যায় গানের কলি। সুরের

রেশটুকু আরও আচ্ছন্ন করে কিশোরীকে। সে ছুটতে থাকে গাছের আড়ালে। বনঝোপের কাঁটায় তার নরম পায়ের পাতা ছিঁড়ে যায়। স্থানে অস্থানে ছিঁড়ে যায় উন্মুক্ত বাজু আর উড়ন্ত বস্ত্রাঞ্চল।

কিছুক্ষণ এই ভাবেই ছুটে যেতে হবে। তারপর একটি প্রশস্ত পথের বাঁকে গিয়ে দাঁড়াবে সে। এ পথেই শকট চলে। এ পথেই বৃন্দাবন থেকে কংসের কর নিয়ে নন্দর দলবল মথুরায় যাবে। আর যাবে রাজার রথ। রথে থাকবেন শ্যামদূর্বাদলের মতো গাত্রাবরণ, টানা টানা হরিণ, চোখ, তীক্ষ্ণ নাসা সুঠাম এক পুরুষ। অক্রূরের সঙ্গে রাজকীয় ফন্দি আঁটতে আঁটতে পেছনে ধুলোর ঝড় তুলে বৃন্দাবন ত্যাগ করতে দেখা যাবে তাঁকে। বিক্ষত তনুমন নিয়ে একটি কিশোরী সে সময় লুকিয়ে থাকবে গাছের আড়ালে। সামনে মিলিয়ে যাবে রথের চূড়ো। দশদিশ হাহাকার করে জঙ্গলকে আরও ঘন করবে। সকল নগরী খাঁ খাঁ শূন্য হয়ে যাবে।

তখন যমুনার জলে ছলাৎ করে একটা ভারি কোনো বস্তুর পতনে মাছ খোঁজা বকেরা ডানা ফট ফট করে উড়ে পালাবে! কেউ কিছু জানবে না অনেক অনেক পরে বৃন্দাবনের মানুষ হয়ত খুঁজে পাবে সেই কিশোরীর ভাসমান শবদেহ অথবা তার শতচ্ছিন্ন কণ্টকাকীর্ণ রঙিন বসনখানি। নীল জলে জেগে থাকা কালো কালো পাথরের গায়ে ছড়িয়ে থাকবে কিশোরীর শরীর অথবা তার লজ্জার শেষ অবলম্বন একখণ্ড ছিন্ন বস্ত্র।

মেয়েটিকে দেখে লোকে বলবে, এ মেয়ে ছিল কানুর রাধা। কানু আর ব্রজে ফিরে আসবে না, তাই তার মানিনী রাধাও ব্রজপুর ত্যাগ করে গেছে।

প্রসঙ্গ কথা ও তথ্য সূত্র

কৃষ্ণের জীবনোপন্যাসে জগজ্জনের নিত্য আরাধ্য রাধাকৃষ্ণকে খোঁজ করলে ভুল করা হবে। ভক্তের ভগবান কৃষ্ণ, গল্পের কৃষ্ণ নন,—গল্পের কৃষ্ণ বাসুদেব,—চতুর রাজনীতিক এবং কূটচক্রী ইতিহাস পুরুষ। এঁর হাতে নেই বাঁশি, ইনি আয়ুধধারী। সীমিত ভূখণ্ডে বিশেষ কালে বিশেষ একটি মানব-গোষ্ঠীর মধ্যে এঁর জন্ম কর্ম বিবাহ যৌনলীলা উত্থান পতন ও মৃত্যু। ইনি লোভের ঊর্ধ্বে নন, পরন্তু আত্মোন্নতিশীল এবং কাজে কাজেই স্বাভাবিকভাবে নির্মম, কুচক্রী এবং হিংসাশ্রয়ী। ব্রহ্মাবর্তে আধিকরণ ও ব্রাহ্মণ্য শাসন অনুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি কুরুক্ষেত্রে ও প্রভাসক্ষেত্রে স্বজনহত্যার শোণিতোৎসবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং ভারতে চাতুর্বর্গীয় সমাজব্যবস্থা পত্তনে যে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে যান, তারই পুরস্কার স্বরূপ ক্ষমতাসীন ব্রাহ্মণ বুদ্ধিজীবীরা তাঁকে পরমেশ্বর পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। কালক্রমে রাজনীতিক বাসুদেব কৃষ্ণ ভক্তজনের আরাধ্য পরমেশ্বর কৃষ্ণের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যান। ব্রাহ্মণ্য চাতুর্য এইভাবে তাঁদের প্রতিষ্ঠার সহায়ক বাসুদেবের হিংস্র হননকারী মূর্তির ওপর পরমেশ্বর কৃষ্ণের ভাবমূর্তি আরোপ করে ইতিহাসের এক নির্মম যুদ্ধাপরাধীকে সর্ব অপরাধের গ্লানি থেকে মুক্ত করে এবং তাঁর দ্বারা অনুষ্ঠিত পাপানুষ্ঠানকে ধর্মীয় কর্তব্য বলে প্রচার করে। এ কাজে মিথ্যার অবাধ আশ্রয় গ্রহণ অনিবার্য। আর তাই বিজয়ী ব্রাহ্মণদের দ্বারা লিখিত পুরাণেতিহাস-গুলিকে তাঁরা সাজিয়ে তোলেন মিথ্যা গল্পকথার অলঙ্কারে। পুরাণের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থেকে সেই অলঙ্কারগুলি বাছাই করে খুলে নিলে যে এক আশ্চর্য ইতিহাসের সন্ধান মেলে, সেটাই ভারতবর্ষের লুপ্ত ইতিহাস, বাসুদেব-কীর্তির ইতিহাস, দেবতা ও ব্রাহ্মণদের কূটচক্রান্তের ইতিবৃত্ত।

হিমালয়ে বসবাসকারী, আর্যাবর্তে ভূমিজ নৃপতিগণের মারণযজ্ঞের পরিকল্পনাকারী ও কুরুক্ষেত্রে ও প্রভাসক্ষেত্রের বিধ্বংসী যুদ্ধে সশরীরে অংশগ্রহণকারী দেবতাদের পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠা পুরাণ মহাভারতের শ্লোকে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছিল, বাসুদেবের দেবত্ব লাভে তা আমাদের সংস্কারে পরিণত হয়েছে। তাই বাসুদেবের জীবনকাহিনী বলতে হলে কিছু ভূমিকার প্রয়োজন। সংস্কারমুক্ত মন ছাড়া বাসুদেব কৃষ্ণের জীবনব্যাপী 'অপরাধপুঞ্জের শিখরচূড়া' দর্শনে আমরা মর্মাহত হতে পারি এবং কবি বুদ্ধদেব বসুর মতো শেষ পর্যন্ত একটা রফা করে বলতে বাধ্য হই, সেই অপরাধ অনুষ্ঠানের মধ্যেও ছিল এক 'মহান ঔচিত্যবোধ'।[১] এই অনুভবের মধ্যে একটা অসহায় পরিতৃপ্তি আছে,

আছে অপ্রিয় দায়িত্ব এড়ানোর প্রশান্তি। তার ফলে যুগধৃত কুসংস্কারের তলায় চিরকাল পিঠ কুঁজো করে বসে থাকতেই হয়। কিন্তু পেছনের অন্ধকার একই রকম থাকলে সামনের চলার পথে সঠিক পদক্ষেপ আর সম্ভব হয় না। অধর্মকে ধর্ম, পাপকে পুণ্য, স্বজন হন্তারককে মহান মুক্তিদাতা বলে ভ্রম হয়। দেবতাকে পরমেশ্বর জ্ঞান করে সে ভুলের সংশোধন থেকে বিরত থাকতে হয় অনেক জেনে বুঝেও।

দেবতা ও পরমেশ্বরের স্বরূপ কী? এ নিয়ে বিস্তর ও বহুধারা গবেষণা হয়ে গেছে এবং হচ্ছে। এ সম্পর্কে আমার আগের বই দুটিতে সম্ভাব্য সকল দিক থেকেই সেইসব আলোচনার সংবাদ দিয়েছি এবং ভারতের লুপ্ত ইতিহাসে দেবতা ও আর্য ব্রাহ্মণদের অদ্ভুত ক্রিয়াকাণ্ড বিশ্লেষণ করেছি।[২] দেবতা ও পরমেশ্বর সম্পর্কে এবং এ বিষয়ে দানিকেনী ভাবভাবনার কথা সেখানে যেমন বলেছি, দানিকেনের 'প্রাগিতিহাসের ঋষি' (অনুঃ অজিত দত্ত) গ্রন্থে যুক্ত আমার নিবন্ধে তেমনি রামমোহন বঙ্কিমের যুগ থেকে দেবতা সম্পর্কে বাঙালীর মননে চিন্তায় যে কিছু আন্দোলন ঘটে গেছে তারও একটি ধারাবাহিক বিবরণী ও বিশ্লেষণ তুলে ধরেছি, যাতে দানিকেন-পাঠকগণ দেশীয় মনীষীদের বক্তব্যের সঙ্গেও সহজে পরিচিত হওয়ার সুযোগ লাভ করেন। সুতরাং তার পুনরালোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন।

এখানে মহাভারত থেকে একটি ছোট্ট সংবাদ তুলে ধরে দেবতা ও পরমেশ্বরের স্বরূপটুকু পাঠকের জ্ঞাতার্থে নিবেদন করছি।

এক সময় সুমেরু পর্বত থেকে [সেকালে হিমালয়ের এই অংশকে বলা হত, স্বর্গ। বিষ্ণুপুরাণ তাকে বলেছেন, ভৌম স্বর্গ] বেড়াতে বেড়াতে দেবর্ষি নারদ গন্ধমাদন [স্বর্গদ্বার] পর্বতে এসে পরিশেষে বদরিকাশ্রমে [দেবলোক] প্রবেশ করে দেখলেন, স্বয়ং দেবতা বিষ্ণু আহ্নিকক্রিয়ায় নিযুক্ত আছেন। ঘটনাটি দেবর্ষিকে অত্যন্ত বিস্মিত করল। মনে মনে নারদ ভাবলেন, 'কি আশ্চর্য! ইঁহারা পরব্রহ্মস্বরূপ। ইঁহাদিগের আবার আহ্নিকক্রিয়া কি? ইঁহারা সর্বভূতের পিতা ও দেবস্বরূপ হইয়া কোন্ দেবতার বা কোন্ পিতৃলোকের আরাধনা করেন, কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।"

১। 'মহাভারতের কথা' দ্রঃ।

২। 'দানিকেনতত্ত্ব ও মহাভারতের স্বর্গদেবতা' এবং 'কুরুক্ষেত্রে দেবশিবির' দ্রঃ।

তখন নারদ বিষ্ণুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ভগ্‌বান! বেদ বেদাঙ্গ ও পুরাণ-সমুদয়ে তোমার গুণ বর্ণিত আছে।...পণ্ডিতেরা তোমাকেই জগতের পিতা ও গুরু বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু তুমি আজ কোন্ দেবতা ও কোন্ পিতৃলোকের আরাধনা করিতেছ?"

প্রশ্নটি বাস্তবিক বড় বিব্রত করল বিষ্ণুকে। তিনি ধরা পড়ে গেছেন দেবর্ষির কাছে। চতুর দেবতারা উন্নত বিজ্ঞানের অধিকারী হয়ে পৃথ্বীবাসীর পরমেশ্বর সেজে বসেছেন, যদিও নিজেরা জানেন, এই ঈশ্বর-সাজার মধ্যে কতবড় ফাঁকি আছে। বিষ্ণু তখন ঢোক গিলে কবুল করলেন, "দেবর্ষে! এক্ষণে যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, উহা নিতান্ত নিগূঢ়, উহা প্রকাশ করা কোনোক্রমেই উচিত নহে।" অর্থাৎ বিষ্ণু স্বীকার করলেন, ঈশ্বর-সাজার ব্যাপারটা দেবতার গূঢ় রাজনীতি, ধর্ম যেমন গূঢ়তত্ত্ব। কিন্তু নারদকে চুপিচুপি বিষ্ণু সেই রহস্যটিও আজ জানাতে বাধ্য হলেন। বললেন, "যিনি অব্যক্ত হইয়াও ব্যক্তভাবে অবস্থান পূর্বক প্রকৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন, সেই পরমাত্মাই আমাদের উৎপত্তির কারণ।" অর্থাৎ স্পষ্টতই স্বীকৃত হয়: জীবাত্মা ও দেবত্মায় উনিশ-বিশ তফাৎ নেই, কিন্তু দেবতা ও পরমেশ্বরে জীবাত্মা ও পরমাত্মা প্রমাণ তফাৎ বর্তমান। বিষ্ণু বলতে বাধ্য হলেন, "আমরা (দেবতারা) সেই পরমাত্মা হইতে সমুৎপন্ন হইয়া জ্ঞানবলে তাঁহাকে দর্শনপূর্বক তাঁহার আরাধনা করিতেছি।" [কাহিনী ও কোট চিহ্নভুক্ত বাক্যগুলি কালীপ্রসন্ন মহাভারতের শান্তিপর্বে / পৃ ৩৩৯ / ৪০ / সাক্ষরতা ১ম সং-এ দ্রষ্টব্য]।

দেবতারাও মানুষের মতোই প্রকৃতিজাত একথা আছে যেমন বেদে উপনিষদে, তেমনি মহাভারতের শান্তিপর্বে সেই এক অদ্বিতীয় পরমাত্মার দ্বারা সৃষ্ট দেবতাদের কথা উক্ত হয়েছে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রমুখ দেব প্রধানদের দ্বারা। বিষ্ণুর কথা আগেই বলেছি। এবার ব্রহ্মা কী বলেন, তা শোনা যাক তাঁরই স্বীকারোক্তি থেকে।

সুমেরু পর্বতের উত্তরদিকে বৈজয়ন্ত নামে এক পর্বত আছে। প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রতিদিন ঐ পর্বতে নিরিবিলি তপারধনা করতেন। একদিন ব্রহ্মার অনুসন্ধানে মহেশ্বর (শঙ্কর) সেখানে উপস্থিত হলেন। ব্রহ্মাকে তপানুষ্ঠানে রত দেখে বিস্ময়াবিষ্ট শঙ্কর জিজ্ঞেস করলেন: ভগ্‌বন! আপনি এই পর্বতে একাকী কী করছেন?

উত্তরে ব্রহ্মা বললেন, "রুদ্র! আমি এই বৈজয়ন্ত নামক পর্বতে বাস করিয়া একাগ্র মনে বিরাট পুরুষকে চিন্তা করিতেছি।"

রুদ্র—"...সেই বিরাট পুরুষ কে ?"

ব্রহ্মা,—"হে রুদ্র ! আমি বহু পুরুষের সৃষ্টি করিয়াছি, ইহা যথার্থ বটে এবং বেদ মধ্যেও ইহার প্রমাণ সংস্থাপিত হইয়াছে ; কিন্তু এক্ষণে যে একমাত্র বিরাট পুরুষের চিন্তা করিতেছি, তিনি ঐ সমস্ত পুরুষের কারণ। ঐ সমস্ত পুরুষেরা ঐ বিরাট হইতে উদ্ভূত...' ।[৩]

ব্রাহ্মণ্য-চাতুর্যের ফলে দেবতা ও পরমেশ্বরের এই জীবাত্মা পরমাত্মা সম্পর্ক লুপ্ত হয়েছে এবং দেবতাকেই পরমেশ্বর প্রতিষ্ঠা দিতে তাঁরা মহাভারত পুরাণে লক্ষ লক্ষ শ্লোক যোজনা করেছেন। তারই জন্য এক এক দেবতার ধ্বজাধারী ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় তাঁদের আরাধ্যকে অন্য দেবতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করতে পুরাণ তো লিখেইছেন, নিজেদের মধ্যে মারকাটও করেছেন। এই দলবাজি থেকে জন্ম নিয়েছে বিভিন্ন ধর্মীয় রাজনীতি। সেই পুরাযুগে এ ধরনের রাজনৈতিক সংঘর্ষকেই বলা হয়েছে ধর্মীয় উত্থান। রাজনীতি ও ক্ষমতা দখলের নাম হয়েছে, ধর্ম, যা ক্ষমতাবানের অনুশাসন মাত্র।

মহাভারতে মূল মহাভারত-কথার অর্থাৎ ভারতযুদ্ধ (কুরুক্ষেত্র) কথার সমাপ্তির পর সকল দেবতার শীর্ষে কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের আয়োজন শুরু। মরণোন্মুখ ভীষ্মের মুখ দিয়ে এই কৃষ্ণ-প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক প্রয়াস করেছেন কৃষ্ণানুগত ভাগবৎ সম্প্রদায়। শান্তিপর্বে তাই কৃষ্ণকেই পরমাত্মা বলা হয়েছে এবং চতুর্ব্যূহ বন্দনার ওপর রচিত হয়েছে শ্লোক। পাশাপাশি বলরামকে বলা হয়েছে জীবাত্মা।[৪] বলরাম যদি ব্রাহ্মণ্য প্রতিষ্ঠার সহায়ক হয়ে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিতেন, সম্ভবত তাহলে তাঁকে ব্রাহ্মণদের পুরাণে পদে পদে হেনস্থা হতে হত না। ব্রাহ্মণ বিরোধী হওয়ায় কৃষ্ণপুত্র শাম্ব চতুর্ব্যূহ থেকে স্রেফ বাদ পড়েছেন।

বোধহয়, অতঃপর এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর যেক্ষেত্রে বহু প্রযত্ন সত্ত্বেও পরমাত্মা পর্যায়ে উঠতে পারলেন না মহাভারতের শেষ পর্যায়ে পৌঁছালে তাঁদের স্বরূপ প্রকটিত করে দিলেন আর্য ব্রাহ্মণরাই ; সেক্ষেত্রে বাসুদেব কৃষ্ণের পরমাত্মা স্বরূপ জোর করে প্রতিষ্ঠা করা হলেও তা আমাদের মনে ধরে নি। আমরা আরও জেনে গেছি, কৃষ্ণ স্বয়ং বিষ্ণুর ঔরসজাত। কুরুক্ষেত্র সমরের পর এইসঙ্গে আরও একটি তথ্য জানা গেল, তা হল, বলরাম যথার্থ বিষ্ণুর ঔরসজাত-

---

৩। মহাভাবত / কালীপ্রসন্ন / শান্তিপর্ব ৩৬৮ পৃ / সাক্ষরতা, ১ম সং দ্রঃ।

৪। ঐ / পৃঃ ৩৪৬।

নন, তিনি শেষ নাগের অংশ এবং তদর্থে দেবপুত্রও নন। বলরামের এবম্বিধ পরিচয় জানার পর কুরুক্ষেত্রে তাঁর দেবগোষ্ঠী বিরোধী ভূমিকাটির রহস্য অনেক সরল ও পরিষ্কৃত হয়ে এসেছে।

সুতরাং এই উপন্যাস পাঠের সময় বাসুদেব কৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা নিয়ে পাঠকমনে কোনো দ্বন্দ্ব ও সন্দেহ রাখার কারণ নেই। ঐতিহাসিকরা একবাক্যে বাসুদেব কৃষ্ণকে ইতিহাস পুরুষ হিসেবেই চিহ্নিত করেছেন। ভারতবাসী এ-তত্ত্ব অবগত ছিলেন বলেই ভারতে আয়ুধধারী কৃষ্ণের পূজা প্রচলিত হয় নি। ভাবের কৃষ্ণ, মুরলীধর রাধাসমন্বিত সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণকেই আমরা পূজা প্রণাম জানিয়ে থাকি।

মহাভারতে ব্রজ কথা নেই। ব্রজপর্ব মহাভারত পরবর্তীকালের রচনা। বাসুদেব কৃষ্ণের সঙ্গে ব্রজলীলার ঐতিহাসিক সম্পর্ক যে বেশ গোলমেলে, বিদ্বান গবেষকদের দৃষ্টি সে বিষয়ে আকৃষ্ট হয়েছিল। এমন কি ব্রজপর্বে বর্ণিত বেশ কিছু কাহিনী বরং খৃষ্টজীবন কাহিনীর দ্বারাই প্রভাবিত, এমন সন্দেহ অমূলক নয় বলেও মন্তব্য করেছেন ভারততত্ত্ব-বিষয়ক সেরা পণ্ডিতরা।

স্যার আর জি ভাণ্ডারকার লিখেছেন, পতঞ্জলির সময়কাল পর্যন্ত গোপাল কৃষ্ণ নামা কোনো কিশোর দেবতার কথা পরোক্ষ ভাবেও উল্লিখিত হয় নি। বাসুদেব কৃষ্ণ সম্পর্কে প্রাপ্ত ইতিহাস জানায়, কংসবধের দায়িত্ব তিনি পালন করেছিলেন, কিন্তু ব্রজপর্বে বর্ণিত অন্যান্য দানবনিধনের কথা সেখানে নেই। মহাভারতের সভাপর্বে অবশ্য শিশুপালের দ্বারা পুতনা প্রভৃতি কতিপয় রাক্ষস রাক্ষসী বধের কথা অকস্মাৎ চমকের মতো উক্ত হয়েছে, কিন্তু পরবর্তী ভীষ্ম পর্বে এ প্রসঙ্গ নেই। ভাণ্ডারকারের মতে, অতএব এ গল্প পরবর্তী প্রক্ষেপ, প্রকৃত ইতিহাস নয়। গোপাল কৃষ্ণের মহিমা প্রচারিত হয়েছে হরিবংশ, বিষ্ণু পুরাণ, ভাগবত পুরাণে। এগুলি মহাভারত পরবর্তী যুগের রচনা। সুতরাং এটাই সম্ভব যে, পরবর্তী পুরাণ যুগে ঘোষপল্লীনিবাসী গোপালক সম্প্রদায়ের কথা কাহিনী প্রচলিত হয় এবং সেই কাহিনীই বাসুদেব কৃষ্ণের আদিজীবন পর্বের সঙ্গে একাকারে বিমিশ্রিত হয়ে যায়।—এ পর্যন্ত বক্তব্য পণ্ডিত সমাজে বিতর্কিত নয়। তবে তাঁর পরবর্তী বক্তব্য সম্পর্কে মতান্তর আছে।

তিনি বলেন, ধেনুকাসুর বধের কাহিনীটি স্পষ্টতই আভীর সম্প্রদায় মধ্যে প্রচলিত রূপকথার দ্বারা প্রভাবিত। আভীর সম্প্রদায় একটি পশ্চিমা বহিরাগত জাতি, যারা পাঞ্জাবের মধ্য দিয়ে মথুরা অঞ্চলে বসতি বিস্তার করে এবং কালক্রমে কাথিয়াবাড় রাজপুতানায় বহুল সংখ্যায় ছড়িয়ে পড়ে। ভাণ্ডারকার-মতে ভারতে আভীরদের অনুপ্রবেশ ঘটে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতক নাগাদ। তিনি বলেন, আভীররা তাঁদের সঙ্গে নিয়ে আসেন কিশোর দেবতার কাহিনী। সে কাহিনী কিশোর দেবতাটিকে নীচকুলোদ্ভব হিসেবেই জানে এবং এই কিশোর দেবতার জন্মকাহিনীও বলে, কিশোরের পালক পিতা জানতেন না তাঁর পালিত সন্তান অন্যের ঔরসজাত। এ কাহিনীতেও শিশুহত্যার গল্প আছে, সেই গল্পই কংসের দ্বারা শূরসেনে ব্যাপক শিশুহত্যার কাহিনীরূপে প্রচারিত হয়েছে। সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক কথা হ'ল, আভীররা খৃষ্ট কাহিনী প্রচার করেন এবং ভাণ্ডারকার লিখেছেন, "It is possible that they brought with them the name of Christ also, and this name probably led to the identification of the boy-god with Vasudeva Krishna······And so the Christ of the Abhiras was recognised as the Sanskrit Krishna".[৫]

আভীর প্রসঙ্গে ভাণ্ডারকারের সঙ্গে অবশ্য একমত হতে পারেন নি পরবর্তী কিছু গবেষক। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার বিভিন্ন যুক্তি উদ্ধার করে আভীর সম্প্রদায়ের বৈদেশিকতা অস্বীকার করেছেন এবং এদেরই শূদ্র ঘোষ সম্প্রদায় হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[৬]

কৃষ্ণের সঙ্গে খৃষ্টের গল্প টানাটানি করার প্রয়োজন আমাদেরও নেই। স্বয়ং খৃষ্টকে নিয়েই অধুনা নানান মতামত। তবে ব্রজপর্ব বলতে বসে ভাগবতের চমকপ্রদ গল্পগুলির অধিকাংশই কেন পরিহারযোগ্য, এ বিষয়ে দু'একটি কথা না বললেই নয়। বর্তমান উপন্যাসে ব্রজভূমিতে কৃষ্ণকীর্তির বাস্তবসম্মত ঘটনা হিসেবে আমি গোবর্ধন ধারণ ও কেশীবধ উপাখ্যান দুটি বেছে নিয়েছি। বিষ্ণু

5. **Vaishnavism and Saivism—R. G. Vandarkar.**
6. **"The Abhiras are said to be sudras and they bear the surname, Ghosa."—Krsna in Hist. and Legend.**

পুরাণ ও হরিবংশে এই দুই ঘটনার বিবরণ ঠিক যেভাবে আছে, সেভাবেই তা পরিবেশন করেছি। দেখা যাচ্ছে, এই দুটি ঘটনা সম্পূর্ণ বাস্তবসম্মত উপায়েই ঘটেছিল এবং পৌরাণিক বিবরণেও বিন্দুমাত্র অলৌকিকতা নেই। অথচ তাকে যে অলৌকিক ঘটনা রূপে প্রচার করা হয়েছে তার কারণ, হয় পৌরাণিক ঘটনা-দুটি বোঝার ভুল, না হলে এই দুই পুরাণের ঢের পরবর্তী ভাগবতের গল্পের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বাস্তব ঘটনার ওপর ব্যাখ্যাকাররা অলৌকিকতা আরোপ করে এসেছেন।

কৃষ্ণের মহিমা প্রচারের উদ্দেশ্যে উদ্দেশ্যমূলক কাহিনীর সমাহার হল ভাগবত।[৭] তারই ওপর নির্ভর করে বাসুদেব কৃষ্ণের ঐতিহাসিক জীবন বৃত্তান্ত খুঁজতে গেলে গোলমাল স্বাভাবিক। বহু ক্ষেত্রে সেই গোলমালই হয়ে এসেছে এবং এখনও সেই ধারার ইতি হয় নি।

অতি আধুনিক কেউ কেউ আবার কৃষ্ণ-বৃত্তান্তের ওপর ইচ্ছামত মেরামতি কাজ করতে গিয়ে যে সব হাস্যকর নবপুরাণের সৃষ্টি করছেন তাতে গোলমাল আরও পাকিয়ে উঠছে। অধীনের নয়া বেদব্যাস হওয়ার শখ বা দুঃসাহস কোনটাই নেই। সেজন্য বঙ্কিমচন্দ্রেরবহু পরিশ্রমলব্ধ বিচার মেনে নিয়ে পুতনা কালিয়দের বাদ দিলাম।[৮]

কেশী ও গোবর্ধন সম্পর্কে কোনো বিতর্কে যাওয়ার প্রয়োজন হয় নি, যেমনটি আছে, তেমনটিই সাজিয়ে দিলাম। কেবলমাত্র এক্ষেত্রে ঘটনা দুটিকে দেখার ও বিশ্লেষণের চোখ পূর্বসূরীদের থেকে আলাদা। এখানে ইতিকথার অঙ্গ থেকে রূপকথার অলঙ্কারগুলি খুলে নিয়েছি।

ব্রজকথায় আদিরসের যথেচ্ছ অবতারণা করার সুযোগ ছিল। আমাদের পুরাণকারেরা এবং কৃষ্ণকাব্যের রসিক কবিরা তো বটেই, আধুনিক শ্রীকৃষ্ণ-কথাকাররাও এ সুযোগের অনাদর করেন না। রাজনীতিক কৃষ্ণকে তাই কোথাও দেখা যায়, নগ্ন গোপিনীদের সঙ্গে অতি বৃদ্ধ বয়সে নিতান্ত লম্পটের মতো প্রমোদ সরোবরে কেলি করতে। আবার কোথাও বা যদুদের উন্মত্ত যৌন লালসার চিত্রসমৃদ্ধ হয়ে আধুনিক কৃষ্ণ কাহিনীকে বাজারে চালু হতে দেখি। কিন্তু কোনো বিশিষ্ট রাজনীতিক অথবা যদুদের মতো একটি রাজনীতি সচেতন জাতিকে কেবলমাত্র নারীদেহ ভোগী লম্পটের চরিত্রে আবিষ্কার করে আমাদের সকল

---

(৭) ৮ম/৯ম শতক।

(৮) কৃষ্ণচরিত্র শৈশব ও কৈশোরলীলা দ্রঃ।

জিজ্ঞাসার তৃপ্তি হয় না। বহু বিশিষ্ট রাজনীতিকের চারিত্রদোষ আছে বলে আমরা জানি, কিন্তু যখন তাঁদের রাজনৈতিক জীবনালেখ্য রচনার প্রয়োজন হয়, তখন লাম্পট্যের কথা গৌণ হয়ে পড়ে, তাঁদের যুগের ইতিহাসটি চিত্রায়িত করার জরুরী প্রয়োজনই অনুভব করেন আলেখ্যকার। কেননা সেই চরিত্র যখন ইতিহাস-পুরুষ, তখন তাঁকে মধ্যস্থ করে যুগচিত্রায়ণ ও দেশকাল-পাত্রের ইতিবৃত্ত রচনার দাবিই প্রথম দাবি হয়ে দাঁড়ায়। এই ব্যাপারটি যেখানে অস্বীকৃত, সেখানে লেখকের পক্ষে তাঁর রচনাকে বিশেষ সময়কালের আলেখ্য রূপে দাবি করা অন্যায়, কেননা তার দ্বারা পাঠক পাঠিকা বিভ্রান্ত হন। এইসব খুঁটিনাটি মনে রেখে ব্রজপর্বের অতি-পরিচিতি রসাল আদিরসভাণ্ডটিকেও সযত্নে শিকেয় তুলে রাখতে হয়েছে। কৃষ্ণ-জীবনের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ঘটনাবলীই শুধু এখানে আলোচ্য করেছি। সেই সূত্রে কৃষ্ণের কৈশোর প্রেমের একটি কাহিনী কৃষ্ণজীবন চিত্রায়ণের খাতিরেই এসে পড়েছে এবং সেখানে কিশোরী নায়িকাটিকে কল্পনার তুলিতে এঁকে নিতে হয়েছে; কেননা, বলাই বাহুল্য, সে গোপীশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধিকা নয়, যেহেতু বাসুদেব কৃষ্ণের জীবনে কখনো কোনকালে কোনো রাধার অস্তিত্ব ছিল না।

কোনো আদি পুরাণেই রাধার কথা নেই। এমন কি ভাগবতকারও রাধার কথা জানতেন না। রাধার আবির্ভাব ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে। কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে রাধাকে নিয়ে রসিক কবি যৌনরস সৃষ্টির স্রোত বহিয়ে দিয়েছেন, সেই পুরাণটি পণ্ডিতগণের বিবেচনায় নিতান্ত অর্বাচীন। প্রাচীন ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ এখন আর পাওয়া যায় না। পদ্ম পুরাণে রাধা নামের উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু ব্রজ-বৃন্দাবন প্রসঙ্গে এই রাধারাণী উল্লিখিত হন নি। অনুরূপভাবে মৎস, বরাহ, বায়ু, নারদীয় প্রভৃতি পুরাণে ইতস্ততভাবে যে রাধা নামের উল্লেখ দেখা যায় সেই রাধা কৃষ্ণকীর্তনীয়াদের দ্বারা সৃষ্ট কৃষ্ণের নর্মসহচরী ব্রজবালা নন। সম্ভবত এইসব ক্ষেত্রে রাধানাম প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। পূর্ববর্তী পণ্ডিতজনের বক্তব্য বিচার করে ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাই মন্তব্য করেছেন: "পুরাণে রাধার যত উল্লেখ আধুনিক কালে দেখিতে পাই তাহা অধিকাংশই অর্বাচীন কালের যোজনা; —সাহিত্যকে অবলম্বন করিয়াই আবির্ভাব ও ক্রমপ্রসার।"[৯] আসলে রাস মণ্ডলেই রাধার সৃষ্টি। সে রাসও বাস্তব ব্রজভূমির রাস।

রাস ছিল নরনারীর মণ্ডলাকার নৃত্যোৎসব। এই রাস নৃত্যে নৃত্যরত

(৯) শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ দ্রঃ।

পুরুষ নৃত্যরতা রমণীর সঙ্গে কণ্ঠলগ্ন হয়ে উৎসব শেষে রাত্রি উদ্‌যাপন করতেন। এই রীতি প্রচলিত আছে আজও কিছু কিছু আদিবাসী সমাজে। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি তাঁর পূজা পার্বণ গ্রন্থে রাসযাত্রা প্রসঙ্গে লিখেছেন : মণ্ডলাকারে নৃত্যের নাম রাস। নরনারীর মণ্ডলাকারে নৃত্যের প্রথা সাঁওতালদের মধ্যে প্রচলিত আছে। নাম, কারাম্। হয়ত গোপগোপীদের মধ্যেও এমনি নৃত্য প্রচলিত ছিল।

লৌকিক এই রাসলীলা কৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গে কাব্য কথার মাধ্যমে একাকারে মিশে অনন্ত বৃন্দাবনে জীবাত্মা (রাধা) ও পরমাত্মা'শ্রীকৃষ্ণের (ঐতিহাসিক বাসুদেব কৃষ্ণ নন) মিলনোৎসব রূপে বৈষ্ণব শাস্ত্রে প্রচারিত হয়েছে। বর্তমান উপন্যাসটি যেহেতু পরমাত্মা মুরলীধর কৃষ্ণের ভাগবত পুরাণ নয়, নিতান্তই পার্থিব এক কৃষ্ণনামা ঐতিহাসিক পুরুষের কৈশোরের রাজনৈতিক উন্মেষ-কালীন জীবনালেখ্য, তাই রাসোৎসবকে পার্থিব উৎসব হিসেবেই এখানে বর্ণনা করা হয়েছে এবং পার্থিব অর্থেই রাধা শব্দের ব্যবহার হয়েছে। তদর্থে গোপিনী মাত্রেই তাদের আপনাপন প্রিয় পুরুষের রাধা। কেননা রাধ্ ধাতু আরাধনার্থে —যিনি আরাধিকা তিনিই রাধা।

ব্রজের কৃষ্ণ অর্থাৎ ভক্তের ভাবলোকে বিভিন্ন অলৌকিক ক্রিয়াকারী ঐশীশক্তি সম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণ ও কূট রাজনীতিক যাদব বাসুদেব কৃষ্ণ যে স্বতন্ত্র, সেকথা গোস্বামী শাস্ত্র-সম্মত। বৈষ্ণবের কৃষ্ণ বেণুধারী চির কিশোর এবং সেই পরমাত্মা কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি স্বরূপিণী শ্রীরাধিকা চির-কিশোরী ও পরমেশ্বরের নিত্যলীলা সঙ্গিনী। ভক্তের দৃষ্টিতে তাই ব্রজ ও বৃন্দাবন তার ভৌগোলিক সীমায় আর আবদ্ধ নেই, ভক্তের বৃন্দাবন আধ্যাত্মিক ব্রহ্মাণ্ডরূপে প্রতিভাত হয়েছে। বৈষ্ণবের কৃষ্ণলোকের নাম সেজন্যই গো-লোক যা দেবলোকেরও উর্ধ্বে। ৮ম শতকের কাছাকাছি সময়ে রচিত স্কন্দ পুরাণের বিষ্ণুখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ উল্লিখিত হয়েছেন 'আত্মারাম' নামে, শ্রীরাধা সেই আত্মারামের 'আত্মাস্বরূপিণী। কৃষ্ণ রাধার যুগল ভাবমূর্তি প্রকৃতপক্ষে চৈতন্য ভক্তমানসে সৃষ্ট জীবাত্মা পরমাত্মার প্রতীকী রূপ। চৈতন্য-পূর্ববর্তী পুরাণ ও কাব্যে রাধাকৃষ্ণের শুদ্ধ ভাবরূপ নেই, রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পুরাণ-কাব্য সেখানে অবাধ ও বহুলাংশে বিকৃত যৌনাচার চিত্রণে সমধিক উৎসাহী। চৈতন্য পরবর্তী ও সমসাময়িক কাব্যে রাধা কৃষ্ণ সম্মিলন ক্রমশ একটি আধ্যাত্মিক ও তাত্ত্বিক রূপ পরিগ্রহ করেছে।

ভক্তের ভাবলোকে আরাধ্য রাধাকৃষ্ণকে যাঁরা কূটনীতিক বাসুদেব কৃষ্ণের

সঙ্গে একাকারে মিশিয়ে দিয়েছেন, গোল বাধিয়ে গেছেন তাঁরাই। বহু অন্যায়-কারী 'কপটাচারী ও লম্পট এক ইতিহাস পুরুষের অবয়বে এঁরা আরোপ করেছেন পরমেশ্বরের শুদ্ধ স্বরূপ। তাই মিল হয় নি, গরমিল ও গোঁজামিলে বিভ্রান্ত হয়েছেন ইতর জন। বাসুদেব কৃষ্ণের ঐতিহাসিক সত্তা তালেগোলে হারিয়ে গেছে এবং চাতুর্বর্ণীয় সমাজ প্রতিষ্ঠতারা এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছেন বর্ণভেদ -ঈশ্বরাদিষ্ট বলে প্রচার করে। পরমেশ্বরের দৃষ্টিতে ভেদ বিভেদ নেই। জীব মাত্রেই তাঁর প্রিয়। সেই জীবলোকে একটি শ্রেণীর (ব্রাহ্মণ) পরশ্রমভোগী জীবন-যাপনের সুব্যবস্থা করার জন্য পরমেশ্বর নরদেহ ধারণ করে ধর্ম সংস্থাপন করতে মর্ত্যে আগমন করেছিলেন, এই উদ্দেশ্যমূলক প্রচারের অন্তরালে, ধর্ম নয়, কত নিকৃষ্ট রাজনীতি যে আত্মগুপ্ত ছিল, তার বিশদ আলোচনা করেছি আমি পূর্ববর্তী গ্রন্থদ্বয়ে। সেই আলোচনার কথা মনে রেখে পাঠককে যদুবংশ ধ্বংসকারী বাসুদেব কৃষ্ণের ঐতিহাসিক স্বরূপটি দর্শন করতে বলব। মনে রাখা দরকার, রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব আমরা যে মহান প্রেমিক শ্রীচৈতন্যের কাছ থেকে প্রাপ্ত হয়েছি, সেই চৈতন্যদেব নিজে কোনো বর্ণভেদ মানতেন না, এবং তাঁর জীবন সাধনাই ছিল মানুষে মানুষে ভেদজ্ঞান লোপ করে বিশ্বেশ্বরের অনন্ত প্রেমময় সত্তাকে বিশ্বব্যপী অনুভব করা। শ্রীরাধিকা জীবাত্মার প্রতীক। শ্রীচৈতন্য স্বয়ং রাধার ভাবমূর্তি। পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার সেই প্রেমময় লীলা অনন্তকাল অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে ভক্তের মানস-বৃন্দাবনে। পরমাত্মাকে পরম পুরুষ জ্ঞানে প্রেমের আসনে বসিয়ে ভক্ত রসিক প্রেমসাধনায় মশগুল হয়েছেন। এই সাধনতত্ত্বটি নরনারীর প্রেমলীলার প্রতীকে ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। বৈষ্ণব কবির কাব্যে রাধাকৃষ্ণের বিভিন্ন ভাববৈচিত্র্যের প্রেমগীতি আছে, বাসুদেব জীবনের কূট রাজনীতির কোনো অধ্যায় সেখানে কাব্যের আলম্বন বিভাব হিসেবে গৃহীত হয় নি। ভাবজগতের এই রাধা সামান্য নারী মাত্র নন, তিনিই ভক্তের সত্তা এবং পরমেশ্বরের সঙ্গে আত্মলীন অভিন্না। রাধাভাব কেবলমাত্র চৈতন্যেরই নয়। প্রত্যেক বড় সাধকেরই সাধন ভাব।

সুতরাং মুরলীধর পরমেশ্বর কৃষ্ণের বাম পার্শ্বর্তিনী যে রাধিকা বিগ্রহ, সেটি কোনো পার্থিব নারীর মূর্তি নয়, তিনি পরমেশ্বরেরই হ্লাদিনী শক্তির প্রেমময় প্রকাশ। তাঁদের ভেদাভেদটি অচিন্ত্যনীয়। ব্রহ্মবৈবর্তে রাধাকৃষ্ণ-লীলা পার্থিব নরনারীর প্রণয়বিকারে পরিণতি লাভ করলেও পুরাণকার এই রাধাকৃষ্ণের অপার্থিব মহিমা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, যথা ত্বঞ্চ তথাহঞ্চ ভেদোহি নবয়োধ্রুবম্।

তোমাতে আমাতে ভেদ নেই। যথা ক্ষীরে ধাবল্যং যথাগ্নৌ দাহিকা সতি॥
যথা পৃথিব্যাং গন্ধশ্চ তথাহং ত্বয়ি সন্ততম্ ।[১০]

অতএব না কৃষ্ণ, না রাধা—আমাদের আরাধ্য কৃষ্ণরাধার সঙ্গে মহাভারত পুরাণের বাসুদেব কৃষ্ণকে একাকারে মিশিয়ে ফেলা যায় না। যাঁরা এই অপকর্মটি করেছেন সমাজে শ্রেণীবিভাগ ও শোষণকে ধর্মানুমোদিত করাই ছিল তাঁদের কূট উদ্দেশ্য।

ঘোষপল্লীর আভীরগণ অথবা ছাগ-পালক গুর্জর সম্প্রদায়—ব্রজের এই পশুপালকরা ছিল যাযাবর। যাযাবরদের মধ্যে অবাধ যৌনাচার ছিল স্বাভাবিক রীতি। স্বভাবতই গোপেরা সে দোষে নির্দোষ ছিল না। কৃষ্ণের সঙ্গে গোপিনীদের অবাধ ও বিকৃত যৌন সম্পর্কের পৌরাণিক কাহিনী সেই জন্যই চৈতন্য পূর্ববর্তী যুগ পর্যন্ত বহুলভাবে প্রচারিত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে তার চূড়ান্ত রূপ এবং এমনকি জয়দেবেও তার কাব্য সুষমামণ্ডিত অস্তিত্ব বর্তমান। গোপীজনবল্লভ কৃষ্ণের স্ত্রী-সঙ্গ-দোষ মথুরা দ্বারকায় ক্ষমতায় আরোহণের পর অবাধ ও উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠে। কৃষ্ণ-মাহাত্ম্য প্রচারকরা সেই কলঙ্কিত কাহিনী চাপা দেওয়ার জন্য কৃষ্ণের যৌনক্রীড়াকে পুরুষ-প্রকৃতির লীলা রূপে তুলে ধরেন। ভাবের রাজ্যে যা পবিত্র মানসলীলা বাস্তবে তা যৌন কদাচার। বাস্তব বাসুদেব কৃষ্ণ সেই ধরনের কদাচারী ছিলেন এবং ঢাকা দেওয়ার শত চেষ্টা সত্ত্বেও মহাভারতে তাঁর সেই কদর্য রূপ প্রকট হয়ে পড়েছে। নারীকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করে রাজনৈতিক সিদ্ধি লাভে কৃষ্ণ ছিলেন সিদ্ধহস্ত। নারীরত্ন উপহার দিয়ে অক্রূরকে তিনি দলে টেনেছেন। পাণ্ডবদের যৌতুক পাঠিয়েছেন সেবাদাসী। নিজের দল রাখার জন্য দ্বারকায় বসিয়েছেন তিনি গণিকাপল্লী।[১১]

কর্ণকে পাণ্ডবপক্ষে আনার জন্য কৃষ্ণ তাঁকে প্রলোভিত করার উদ্দেশ্যে বলেন, কর্ণ রাজি হলে মধ্যরাত্রে তাঁর কাছে পাণ্ডবরা দ্রৌপদীকে প্রেরণ করবেন।[১২]

(১০) শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম জগদীশচন্দ্র ঘোষ।

(১১) হরিবংশ দ্রঃ। এ সম্পর্কে ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার লিখছেন, "**Whatever might have been the number of his wives, he allowed a host of public woman to reside in his city. The Harivamsa naively writes that Krishna allowed these women to entertain the Yadavas so that there might not arise any feud anongst them on account of women.**" (**Krishnas' life at Dvaraka**)

(১২) 'কুরুক্ষেত্রে দেবশিবির' দ্রঃ

কৈশোর জীবন থেকে কৃষ্ণকে আমরা নারীর লজ্জাহরণকারী রূপেই পুরাণে কাব্যে বর্ণিত হতে দেখেছি। কৃষ্ণ বিজিত রাজ্যের রমণীকুলকে বন্দী করে এনে আপন হারেমে পুরেছেন। ষোলশ বন্দিনী রমণী কৃষ্ণ হারেমে রক্ষিতা ছিলেন। কৃষ্ণের ভাবমূর্তি সৃষ্টির প্রয়োজনে তাঁদেরও অতঃপর স্বর্গীয় দেবীর অংশজা বলে প্রচার করেছেন কৃষ্ণধ্বজাধারীরা। বাসুদেব যত্রতত্র বিবাহ ও পুত্রোৎপাদনে তৎপর ব্যক্তি ছিলেন। ষোলশ রক্ষিতা ছাড়াও এই বিলাসী পুরুষের প্রধানা মহিষীদের গর্ভে জন্ম গ্রহণ করে ৪৯ টি পুত্র। পুরাণে তিনি লক্ষ পুত্রের জনক হিসেবে কথিত। নারীঘটিত ব্যাপারে কৃষ্ণের আসক্তি বৃদ্ধ বয়সেও এমনই প্রবল যে, নিজ হারেমের নর্মসহচরীরা পুত্র শাম্বের রূপমুগ্ধ, একথা শুনে ক্ষিপ্ত বাসুদেব পুত্রকে অভিশপ্ত করেন। সুতরাং কৃষ্ণকৃত 'অপরাধপুঞ্জ' দর্শনের জন্য পাঠক মনের প্রস্তুতি দরকার। নাহলেই তাঁরা শিহরিত হবেন। কিন্তু বাসুদেব কৃষ্ণে এমন কোনো মহত্ত্ব আবিষ্কার-যোগ্য নয়, যা তাঁকে পরমেশ্বরতুল্য মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। ব্রাহ্মণ্য শোষণ প্রতিষ্ঠায় কৃষ্ণের অবদান তৎকালের ক্ষমতাবান ব্রাহ্মণদের দ্বারা পুরস্কৃত হয়েছিল, কৃষ্ণকে তাঁরা দিয়েছিলেন অবতার প্রতিষ্ঠা। ক্ষমতবান বহু অন্যায়কারী ইতিহাসে এইভাবেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন সেই যুগে, যে যুগে রাজনীতি ছিল ধর্ম নামে আখ্যাত। আজও ইতিহাসে এভাবেই ব্যক্তিপূজা ও ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠার আয়োজন সমানে চলছে।

বর্তমান উপন্যাসের কয়েকটি চরিত্র সম্পর্কে অতঃপর সংক্ষেপে দুএকটি কথা বলে রাখা দরকার।

মহাভারত পুরাণে গর্গ প্রসঙ্গ আছে যৎসামান্য। গর্গ ছিলেন বৈবাহিক সূত্রে যাদবকুলের জামাতা। তিনি যদুদের কুলগুরু পদে অভিষিক্ত হঁন। তথাপি কিন্তু ভারতে পুরাণে গর্গের উল্লেখ প্রায় নেই বললেই চলে। বহু তৃতীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ নেতার জন্য পুরাণ মহাভারতে যে অপ্রয়োজনীয় কথা-বিস্তার লক্ষ্য করা যায়, গর্গ প্রসঙ্গে তা চোখেই পড়ে না। তাই তাঁর সম্পর্কে জানা যায় খুবই অল্প ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে এই লক্ষণীয় নীরবতা বস্তুত সন্দেহজনক। গর্গকন্যা গার্গী অথবা গর্গপুত্র কৃষ্ণশত্রু কালযবন ইতিবৃত্তে যতখানি জায়গা পেয়েছেন। গর্গ সেটুকুও পান নি। ফলে স্বভাবতই সন্দেহ জাগে,—তবে কি শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্মণ্য

স্বার্থ পরিপূরণে সহায়ক শক্তি হিসেবে নিজেকে ব্যবহার করেন নি? পুঁথি পাঠে তাঁর এই অপহ্নব কি এই কারণে যে, তিনি মানসিক ভাবে পুরোপুরি ব্রাহ্মণ্য আগ্রাসনকে সাদর অভ্যর্থনা জানাতে অক্ষম ছিলেন?

যদুদের মধ্যে ব্রাহ্মণবিরোধী ও পাণ্ডববিরোধীর সংখ্যাই ছিল সমধিক। একথা জীবন সায়াহ্নে নারদের কাছে সুস্পষ্টভাবে কবুল করে গেছেন বাসুদেব কৃষ্ণ স্বয়ং।[১৩] নারায়ণী সেনা-বণ্টনের সাজানো গল্পেও তা প্রমাণিত হয়েছে।[১৪] এবং যদুদের এই ব্রাহ্মণ বিদ্বেষের জন্যই প্রভাসক্ষেত্রে যদুবংশ ধ্বংস করেছেন দেবতা ব্রাহ্মণ এবং স্বয়ং কৃষ্ণ।

যে সব পণ্ডিত ব্যক্তি ও আধুনিক কৃষ্ণকাহিনী লেখকদের ধারণা, যদুবংশ ধ্বংসের কারণ সুরা ও নারীসঙ্গ, তাঁরা মৌষল পর্বের বুদ্ধবোধ রূপকথায় অবোধ শিশুর মতো মুগ্ধ। ঘটনার যুক্তিসঙ্গত বিশ্লেষণে অনাগ্রহী।

পুরাণের এহেন বিচার ও ব্যাখ্যার ফলে ভারতকথার গ্রন্থিমোচন আর সম্ভব হয় না। এমন দু'একজন স্বপ্রতিষ্ঠিত বেদব্যাসের ধারণায় তাই বিক্রমশালী বলরাম চিরাচরিত ভাবে প্রতিভাত হন মধুপায়ী জৃম্ভনত্যাগী অলস স্থূলমগজ ব্যক্তি হিসেবে। কেউবা দেখেন, মথুরার পথে পথে লম্পট যাদবেরা মেয়ে মানুষ কি মিষ্টি, এই কথা ভাবতে ভাবতে যৌনমদে মাতাল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং সে দৃশ্য কৃষ্ণমনে বিমর্ষ বেদনার সৃষ্টি করছে। বলা বাহুল্য, বাসুদেব কৃষ্ণই বরং স্বাধীনচেতা যাদবগণকে ভ্রষ্টচরিত্র ও নৈতিকভাবে দুর্বল করার জন্য বিভিন্ন প্রযত্ন গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং যাদবদের অধঃপাতে তাঁর বিষাদগ্রস্ত হওয়ার কোনো কারণ ছিল না। প্রভাসক্ষেত্রে 'পৃথিবীর ভারাবতরণের' শেষ খেলা হয়েছে স্বজনহননের দ্বিতীয় মাতলামির মধ্যে। পৌরাণিক তথ্যে প্রকাশ, ইন্দ্র স্বয়ং উত্তেজক পানীয় প্রেরণ করেন প্রভাস ক্ষেত্রে, যে প্রভাসে কৃষ্ণের পরামর্শে সমবেত হন যাদব নেতারা। ইন্দ্র প্রেরিত সেই বিষবৎ পানীয় গ্রহণের পর যাদবেরা তাঁদের মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন ও শুরু হয়ে যায় স্বজন-হননের বিভীষিকা।[১৫] কৃষ্ণ চরিত্রে কোথাও কখনো বিষণ্ণতার লক্ষণ নেই। তিনি স্বচক্ষে নিজের পুত্রদের সেই আত্মহননকারী ঘরোয়া যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দিতে দেখেও তা নিবারণের চেষ্টা করেন নি, বরং নিজেই সংহারক মূর্তি ধারণ

(১৩) মহাভারত / শান্তিপর্ব।

(১৪) লেখকের কুরুক্ষেত্রে দেবশিবির দ্রঃ।

(১৫) পদ্মপুরাণ।

করে দ্বিতীয় কুরুক্ষেত্র রণে ব্রাহ্মণ্য শক্তির প্রতিষ্ঠায় এবং ব্রহ্মার পরিকল্পনা রূপায়ণে স্থির মস্তিষ্কে কাজ করে গেছেন। পুত্র প্রতিম অভিমন্যু বধ ও ঘটোৎকচ বধেও কৃষ্ণকপটতা সুস্পষ্ট। [এসব কথা পরবর্তী পর্বে আলোচনা করব]। এমন রোবট সদৃশ মানুষ ইতিহাসে দুর্লভ। কুরুক্ষেত্র ও প্রভাসের রণক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্তে পা ধুয়ে বহিরাগত ব্রাহ্মণরা আর্যাবর্তে শ্রেণীভেদ প্রধান তথাকথিত ধর্মরাজ্য স্থাপন করেন। কুরুক্ষেত্র ও প্রভাসক্ষেত্রকে তাই তাঁরা পুণ্যং তীর্থক্ষেত্র রূপে প্রচার করে গেছেন। যে দুটি জায়গায় ভারতবাসী উন্মত্তের মতো ভায়ের বুকে তরবারি গুঁজে দিয়ে দেবস্বার্থ ও ব্রাহ্মণ্য অভিসন্ধি পূরণ করেছে, ভারতবর্ষীয়দের তীর্থক্ষেত্র হয়েছে সেই দুই শ্মশানভূমি! ভারতের ইতিহাসের ধারায় আজও তাই অক্লেশে স্বজনহত্যার উৎসব চলে, কেননা তা আমাদের সংস্কারের ধারায় পবিত্র কর্ম হিসেবে গণ্য হয়ে এসেছে। এইসব অতি কাঠোর সত্যোচ্চারণে কেউ যদি ক্ষুব্ধ ও বিষণ্ণ হন, তবে আমি নিরুপায়। কৃষ্ণকৃত অপরাধের মধ্যে কোনোরকম গোলমেলে 'মহান ঔচিত্য' [১৬] আবিষ্কার করতে আমি অক্ষম।

গর্গকে যদুবংশ সিরিজে একটি প্রধান চরিত্র হিসেবে তাই আমি খুঁজে নিয়েছি। ব্রাহ্মণ্য পুরাণে গর্গের অনুল্লেখ এই ধারণা সৃষ্টি করে যে, তিনি প্রাথমিক পর্যায়ে দেবক-বসুদেব গোষ্ঠীর পাতা ফাঁদে পা দিলেও তাঁর মধ্যে স্বদেশ-হিতৈষণার ভাগই ছিল বেশি, এবং পরবর্তীকালে এই যদুকুলগুরু কৃষ্ণ তথা ব্রাহ্মণদের অন্যায় আচরণ সমর্থন করতে পারেন নি। এজন্যই কি মৌষল পর্বে অন্যান্য মহর্ষিদের মধ্যে গর্গকে পাওয়া যায় না? গর্গের উল্লেখ পাই, শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধে। বসুদেব তাঁকে প্রেরণ করেন কৃষ্ণ বলরামের নামকরণ করতে। কিন্তু কৃষ্ণ বলরাম মথুরায় আসার পর গর্গ নন, তাঁদের শিক্ষার ভার অর্পিত হয় সন্দীপনি মুনির ওপর। সান্দীপনি ছিলেন ব্রহ্মাবাদী ব্রাহ্মণ। যাদবদের গৃহবিবাদের মূলে যে পরস্পরবিরোধী মানসিকতা ছিল, সম্ভবত গর্গ তার দ্বারা ক্রমশ প্রভাবিত হন।

গর্গের স্বর্গগমনের কথা পুরাণে নেই। ব্রহ্মার সভায় দেব ষড়যন্ত্রের সংবাদ নারদ সংগ্রহ করে কংসকে জানান বলে কথিত। কিন্তু এই পৌরাণিক তথ্য যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় না। যে নারদ দেবপক্ষীয়, তিনি দেবতাদের পরম পরাক্রান্ত শত্রু কংসকে দেবষড়যন্ত্রের খবর পৌঁছে দিয়ে যাবেন কোন্

(১৬) মহাভারতের কথা / বুদ্ধদেব বসু দ্রঃ।

স্বার্থে! কুরুক্ষেত্র ও প্রভাসক্ষেত্রে বহু যুগের পরিকল্পনা ও কূটচক্রান্তের ফলে দেবতারা সুরবিরোধী ভারতীয় রাজন্যবর্গ ও জনগণকে নিশ্চিহ্ন করতে সক্ষম হন। একাজ যে কত কঠিন ছিল ব্রহ্মার পরিকল্পনা থেকে প্রভাস ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ্য প্রতিষ্ঠার পূর্ণ সাফল্য পর্যন্ত সময়কালের দিকে তাকালেই তা বোঝা যায়। সুতরাং এমন একটি যুদ্ধপর্বের রাজনীতি কেউ শত্রুপক্ষকে জানিয়ে যায় না। অথচ হিমালয়ে দেবতাদের সভা-বৈঠক যে ঘন ঘন বসতো তার তাত্ত্বিক প্রমাণ পুরাণে মহাভারতে অজস্র ছড়ানো আছে। এসব কারণে নারদের জায়গায় আমি গর্গকে উপস্থাপিত করেছি। দেবতাদের বক্তৃতার মাধ্যমে দেবরাজনীতিটুকু পরিস্ফুটনের চেষ্টা আছে। দেবলোকের বর্ণনা অনায়াসেই পৌরাণিক বলে গ্রহণ করা যায়। হিমাচল স্বর্গের পৌরাণিক বর্ণনা অনুসরণেই আমি স্বর্গ ও নরকের মানচিত্র আবিষ্কার করেছি গাড়বাল হিমালয়ের স্তরে স্তরে।[১৭] সুতরাং গর্গ বর্তমান উপন্যাসে যেভাবেই উপস্থিত হ'ন তার দ্বারা পৌরাণিক তথ্য খণ্ডিত হয় নি বলেই আমার বিশ্বাস।

ক্রোধজিৎ বা নমুচি পুরোপুরি উপন্যাসের প্রয়োজনে সৃষ্ট। মথুরার রাজনীতি এই চরিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করার সুযোগ নিয়েছি। হরিবংশে কংসের আক্ষেপ তাঁর পাশে উপযুক্ত মন্ত্রী বা চরপ্রধান নেই। দেবক-বসুদেবের ষড়যন্ত্র তাঁকে রাজনৈতিকভাবে বেকায়দায় ফেলেছে। তিনি এমন কি অক্রূরের প্রতিও আস্থাবান নন। বোঝা যায়, কংসের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছিল বেশ দীর্ঘকাল ধরে। এই সময় দেবকগোষ্ঠী রাজানুগত রাজপুরুষদের হাত করেছেন, প্রয়োজনে কৌশলে তাঁদের ক্ষমতাচ্যুতও নিশ্চয় করা হয়েছিল। অন্তরালবর্তী কূটনীতিকে জীবন্ত করার প্রয়াসে ক্রোধজিতের সৃষ্টি। জরাসন্ধের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ও কথোপকথনে মথুরা-মগধ সম্পর্ক পাঠকের কাছে সহজে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়েছে।

বলরাম দেবপুত্র নন। তাই যতবড় বীরই তিনি হোন না কেন, ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে তাঁর কীর্তি অনুল্লিখিত আছে। অথচ কৃষ্ণের বহু রাজনৈতিক সাফল্যের মূলে বলরামের অবদান যে অকিঞ্চিৎকর নয়, পুরাণকারদের তা পদে পদে স্বীকার করতে হয়েছে। অবহেলিত বলরামকে এভাবেই দেখার চেষ্টা আছে। তাঁর বেদনা পুরাণকাররা অনুভব না করলেও যে কোনো নিবিষ্ট পাঠক সেই বেদনার স্পর্শ পান কৃষ্ণজীবন পর্যালোচনার মধ্যে। বলরাম চরিত্রটি তাই পৌরাণিক তথ্যানুসারে যেমনটি হওয়া উচিত সেভাবেই উপস্থাপিত হয়েছে।

রোহিণী, কাব্যে উপেক্ষিতা আর একটি নিঃস্ব নারী চরিত্র। কোনো শক্তিশালী লেখক রোহিণীর অন্তর্বেদনাকে নিয়ে কাহিনী সৃষ্টি করতে চাইলে তার যথেষ্ট সুযোগ আছে বলে মনে করি। এই চরিত্রটিকে আভাসিত করে কর্তব্য সেরেছি।

গোপেদের যাযাবর গোপালক জীবনে ঘটনাবর্তের ঢেউ ভাঙে বেলাভূমে সাগরের উৎপাতের মতো। বেশিক্ষণ তাদের স্মরণে থাকে না কোনো ঘটনাই।

(১৭) লেখকের পূর্ববর্তী গ্রন্থদ্বয় দ্রঃ।

সরল বিশ্বাসী এরা। ঘোর অশিক্ষায় তাদের গায়েও গো-বাস ছড়ায়। এমন মানবযূথকে গো-গণের সমতুল জ্ঞান করে দেবতারা তাঁদের মধ্যেই গোবিন্দের প্রাথমিক অলৌকিক প্রতিষ্ঠার আয়োজন করেন। গো-তুল্য এই মানব সম্প্রদায়ের চোখে দেবগণ দ্বারা শিক্ষিত কৃষ্ণের ক্রিয়াকাণ্ড অলৌকিক বোধ হয়েছে। কিন্তু শিশুপাল প্রমুখ তৎকালের শিক্ষিত নৃপতিবর্গ গোবর্ধন ধারণের গল্পগাছা বিশ্বাস করেন নি। পৌরাণিক তথ্য অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করলেই রহস্যটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভারি আশ্চর্যের কথা, পণ্ডিতরা এদিকে কখনো দৃকপাত করেন নি। কৃষ্ণচরিত্রে এক বিরাট পুরুষ আবিষ্কারের রোমহর্ষক উত্তেজনায় সম্ভবত যুক্তিবাদী বঙ্কিমও এমনই ওতপ্রোত হয়ে পড়েন যে হরিবংশে গোবর্ধন বিদারণ-সম্পর্কিত ঘটনাবলীর উল্লেখ তাঁর বিচারক দৃষ্টিও এড়িয়ে যায়। এক্ষেত্রে পৌরাণিক তথ্যাবলী হুবহু অনুসরণ করে আমি যে পাঠ গ্রহণ করেছি তাতে গোবর্ধন রহস্য তার রহস্যকুহেলী ভেদ করে যথার্থ চেহারায় প্রকাশিত হয়েছে।

দেবতারা আমাদের মতোই দ্বিপদ দ্বিহস্ত এবং মগজধারী জীব। মহাভারত বলেন, তাঁরা নির্লোম ও আঁখিপক্ষ্মহীন। এঁরা পায়ে বৃষচর্মের জুতো পরতেন। জুতো ও ছাতার প্রচলন করেন সূর্যদেবতা।[১৮] দেবভাষা হল সংস্কৃত। এই দেবতাদের গোষ্ঠী-পরিচিতি তাত্ত্বিক প্রমাণসহ পূর্ববর্তী গ্রন্থাবলীতে আলোচনা করেছি। 'ব্রহ্মার পরিকল্পনা' অনুসারে গোপসম্প্রদায়ের মধ্যে দেবসেনারা এসে ঘাঁটি গাড়েন ছদ্মবেশে, তথ্যসূত্রে তার উল্লেখ আছে। কৃষ্ণ ও বলরাম এবং কিছু গোপতরুণ যে এঁদের কাছেই যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করেন, তাতে সন্দেহ নেই। ঘটনাবলী সাজিয়ে তাঁদের কার্যকলাপ প্রদর্শন করেছি। এই ঘটনাবলীকেও সুতরাং অ-পৌরাণিক ভাবার কারণ নেই।

ভাষা ব্যবহারে কোথাও কোথাও গুরুগম্ভীর ও অপ্রচলিত শব্দ এসে পড়েছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই শব্দগুলিকে কোটচিহ্নভুক্ত করেছি। শব্দগুলি হুবহু পুরাণ ও মহাভারত থেকে নেওয়া। অসাবধানতায় কোথাও কোথাও কোটাচিহ্ন বাদ পড়ে গিয়ে থাকবে। কংসর সভায় অন্ধক ও কংসের বক্তৃতা প্রায় সর্বাংশেই হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণ থেকে উদ্ধৃত। বসুদেব, সাত্যকি, কৃতবর্মা, অক্রূরের সভাপর্বে আচরণ ও সংলাপ পৌরাণিক ঘটনাবলী ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে লেখক কর্তৃক সাজানো।

গোপেদের সংলাপে ভাঙা হিন্দীর ব্যবহার করেছি বিশেষ ভৌগোলিক পরিবেশটিকে স্মরণে রাখার জন্য।

দেবদূতগণের চরিত্র ও কার্যকলাপ কাহিনী বিন্যাসের প্রয়োজনে তৈরী করে নিতে হয়েছে।

(১৮) মহাভারত / অনুশাসন পর্ব।

তথ্যসূত্র

পৃ ৫—(১) পুরাণ-বর্ণিত ভৌম স্বর্গ গন্ধমাদনের পার্বত্য পথে পথে পাহারা দিতেন যমপ্রহরীরা, অথর্ববেদে পরিষ্কার লেখা আছে, যমানুচরদের সঙ্গে থাকত এক জাতের হিংস্র কুকুর :

যৌ তে শ্বানৌ যম রক্ষিতারৌ চতুরক্ষৌ পথিষদী নৃচক্ষ সা।
তাভ্যাং রাজন্ পরিধেহ্যেনং স্বস্ত্যস্মা অনমীবং চ ধেহি ॥

অর্থাৎ, "যমপুরীর রক্ষক, চারটি চক্ষুযুক্ত যে কুকুরদুটি পিতৃলোকে যাবার পথে অবস্থান করছে, তারা গমনশীল মানুষের দ্রষ্টা। হে পিতৃগণের অধিপতি যমরাজ, তোমার কুকুরদুটি ঐ প্রেত-পুরুষকে রক্ষা করুক। তোমার লোকে গমনকারী এ পুরুষের অবিনাশ ও বাধাহীন স্থান দাও।" [অনু—হরফ সং। অথর্ব ১৮ কা, ২ অনুবাক, ২য় সূক্ত]। ঐ ৩য় সূক্তে অপার্থিব দর্শন সারমেয়গুলির বর্ণনায় বলা হয়েছে, ভয়ঙ্কর চতুরক্ষ ঐ কুকুরগুলির নাক ছিল লম্বা ধরনের। অন্য একটি সূক্ত থেকে আরও জানা যাচ্ছে যে অপ্সরাগণ নানাজাতের পালিত কুকুর নিয়ে দেবায়তন হিমালয়ের স্বর্গলোকে পরিভ্রমণ করতেন।

এই প্রার্থনায় ভয়ঙ্কর অপার্থিব সারমেয়দের কবল থেকে হিমালয়ে গমনকারী পুরোহিতদের রক্ষা করার আবেদন উচ্চারিত হয়েছে।

স্বর্গ বলতে মহাভারতে প্রথমত হিমালয়ের মেরু পর্বতকে উল্লেখ করা হয়েছে। এই স্বর্গে দেবতাদের ছাড়পত্র নিয়ে দেবানুগত রাজা ও পুরোহিতেরা প্রায়ই গমনাগমন করতেন। দেববিরোধী ভারতীয় রাজন্যবর্গ বারম্বার এই স্বর্গ আক্রমণ করেছেন। যুধিষ্ঠির হিমালয় স্বর্গ থেকে কতিপয় দেব-প্রধানের সঙ্গে উড়ন্ত রথে চড়ে মহাকাশ পথে চিরকালের জন্য প্রস্থান করলে স্বর্গের ধারণা পাল্টে যায়। তখন পূর্বোক্ত সকলের স্বর্গে যাতায়াতের বিবরণ অস্বীকার করে নারদ জানান, যুধিষ্ঠিরই একমাত্র যিনি সশরীরে স্বর্গে গেলেন। হিমালয়ের স্বর্গ অভিধা নাকচ হয়ে যায় এবং পরবর্তী বিষ্ণু পুরাণে স্পষ্টতঃ হিমালয়কে ভৌম স্বর্গ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। হিমালয়েই দেবশত্রুদের বন্দী অবস্থায় যম প্রহরীরা অশেষ যন্ত্রণা দিতেন। দেবতাদের সেই যন্ত্রণাগারকেই নরক বলা হয়েছে। স্বর্গ ও নরকের স্বরূপ বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছি দানিকেনতত্ত্ব ও মহাভারতের স্বর্গদেবতা গ্রন্থে। সেখানে এটাও দেখানো হয়েছে যে, পৃথিবীর সকল পুরাণেই দেবায়তন নির্দিষ্ট হয়েছে পর্বতে এবং পুরাপিতারা দেবশিবির সেই পর্বতগুলিকেই স্বর্গলোক বলে অভিহিত করেছেন।

পৃ ৬—(২) দেবতারা বৃষচর্মের পাদুকা এবং খড়ম বা কাষ্ঠ পাদুকা (দ্রুপদ) ব্যবহার করতেন। অথর্ব বেদের ঋষভ সূক্তে এই তথ্য পাওয়া যায়।

মিশরীয় দেবতাদের বিচিত্র সাজ-পোষাকের বর্ণনা থেকে জানা যায়, যোদ্ধা দেবতারা খাটো মাপের চাপা পোষাক পরতেন। তাঁদের দেখতে ছিল পুরা পুরুষদের মতোই। তাঁরা পরিপাটি কুঞ্চিত শ্মশ্রু ধারণ করতেন। পোষাকের সঙ্গে একটি রোমশ লেজও রাখা হত প্রলম্ব ফিতের আকারে। তাঁদের এই লাঙ্গুল প্রীতি ফারাওরাও গ্রহণ করেন এবং নব সাম্রাজ্যকাল পর্যন্ত তাঁরাও দেবতাদের মত পোষাক ও লেজ ধারণ করতেন। দেব নারীরা গোড়ালি পর্যন্ত ঢাকা পোষাক পরতেন। দেবতারা মাথায় পরতেন পরচুল। Egyptian Mythology/Verohica Ions দ্রঃ]

পৃ ৯—(৩) বর্ণাশ্রম প্রধান ধর্মানুশাসন বহিরাগত দেবতাদের দ্বারা আনীত সমাজ ব্যবস্থা। দেব-রক্ষিত আর্যব্রাহ্মণরা এই চাতুর্বর্গ ভেদ-প্রধান এক ধর্মরাজ্য সংস্থাপন করেন দেবতাদের শক্তি ও সাহায্যে। এক ধর্ম অর্থাৎ দেবানুশাসন প্রধান রাজ্য স্থাপনায় কৃষ্ণ রাজনৈতিক মস্তিষ্কের কাজ করেন এবং দেবানুগত পাণ্ডবরা দেশীয় সমাজ ব্যবস্থা ধ্বংস করে পুরোহিত-শোষিত সেই এক ধর্মরাজ্য স্থাপনার জন্য কুরুক্ষেত্রে বহিয়ে দেন ভারতীয় ক্ষত্রিয়দের শোণিত স্রোত। প্রতিষ্ঠিত হয় বহিরাগতের বশংবদ পুরোহিত শ্রেণীর প্রাধান্য। দেবতার নামে পৃথিবীব্যাপী তাঁরা অধিকার করেন প্রচুর বিত্ত সম্পদ ভূমি ও ক্রীতদাস। নিজেদের জন্য পুরোহিত সব রকম রাজনৈতিক ও সামাজিক সুবিধার ব্যবস্থা করে নেন। অবাধ যৌনাচার, এমন কি বিজিত শূদ্র শ্রেণীর প্রাণ হরণের যথেচ্ছ অধিকারও ব্রাহ্মণ মালিকরা ভোগ করতেন ['কুরুক্ষেত্রে দেবশিবির' দ্রঃ]

(৪) দেবতারা আর্যব্রাহ্মণদের সঙ্গে নমস্কার বিনিময় করতেন সাধারণ সামাজিক প্রথা হিসেবে।

পৃ ১২—(৫) স্কন্দ পুরাণ কাশীখণ্ডে অগস্ত্য লোপামুদ্রাকে বলেছেন, কাশী বিধাতার সৃষ্টি নয়—"ন সা মুদ্রা কাপীহ জগতীতলে। বারাণস্যাঃ প্রদৃশ্যেত তৎ কর্তা ন যতো বিধি।" এই উক্তির দ্বারা দেবতা শঙ্করের সঙ্গে পরমস্রষ্টা পরমেশ্বরের পার্থক্যই সুস্পষ্ট করা হয়েছে। আন্যান্য জীবের মতো দেবতারাও পরমেশ্বর সৃষ্ট অপার্থিব জীব বা লোকপাল, এই সংবাদ উপনিষদে সুস্পষ্ট উল্লিখিত আছে [দানিকেনতত্ত্ব ও মহাভারতের স্বর্গদেবতা দ্রঃ]

পৃ ১৩—(৬) লেখকের উপরোক্ত গ্রন্থ দ্রঃ।

পৃ ১৪—(৭) লোকশ্রুতি অনুসারে বদ্রিনাথের পথে (২৪ কি মি আগে ও বদ্রিনাথ থেকে ছ হাজার ফুট নিচে) অবস্থিত পাণ্ডুকেশ্বর শতশৃঙ্গ পর্বতের অংশবিশেষ। ধৃতরাষ্ট্র ভ্রাতা পাণ্ডু এই পর্বতে দেবস্তাবক আর্যব্রাহ্মণদের আশ্রয়ে তাঁর দুই মহিষী কুন্তী ও মাদ্রীকে নিয়ে জীবনের শেষ পর্যায় অতিবাহিত করেন। এখানেই সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপায়ে বিভিন্ন দেবতাদের সঙ্গে সঙ্গমের ফলে পঞ্চ পাণ্ডবের জন্ম হয়। বিশদ বিবরণের জন্য লেখকের উপরোক্ত গ্রন্থ দ্রঃ।

পর্ব—২

পৃ ১৬—(১) স্বর্গলোক হিমালয়ের পথ সুগম করতেন অশ্বিনীকুমারদ্বয়। অথর্ববেদের সূক্তে বলা হয়েছে, 'অশ্বিনা পন্থাং কৃণুতাং সুগং।' এরা বহুতর প্রাযুক্তিক বিদ্যায় দক্ষ এমন কি চিকিৎসাবিজ্ঞান ও শল্যচিকিৎসায়ও পারদর্শী ছিলেন। এঁদের রচিত চিকিৎসা-সারতন্ত্র-নামে গ্রন্থেরও সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁরা পৃথিবীর পরিমাপ করেছিলেন অর্থাৎ মানচিত্র তৈরী করেন।

পৃ ১৬—(২) মহাভারতম্‌, হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ।

পৃ ১৭—(৩) বদ্রিনাথ অঞ্চলে নরপর্বত এলাকায় উর্বশী পর্বত নামে একটি অনুচ্চ পর্বত আছে। হয়ত একদিন সেখানেই ছিল দেবনর্তকী স্বর্বেশ্যা উর্বশীর আবাস। এই নরপর্বতে দীর্ঘকাল দেবতাদের শিক্ষাশিবিরে বাস করে যান অর্জুন। দেবমিত্র-জোটের যোদ্ধা ইন্দ্রপুত্র অর্জুনের মনোরঞ্জনের জন্য ইন্দ্রের আদেশে রাত্রিকালে উর্বশী যান অর্জুন শিবিরে। স্বর্গলোকের অন্তর্ভুক্ত নরপর্বত এলাকাটি স্বর্গ-সমীপবর্তী দেবসংরক্ষিত অঞ্চল ছিল। এখনও বদ্রিনাথের পাণ্ডারা বলেন, অলকানন্দার এপারে যে নরপর্বত এলাকা, সেটা মর্ত্যলোক এবং পরপারের নারায়ণ পর্বত এলাকা (এদিকেই বদ্রিনাথ মন্দির) স্বর্গলোক। নর পর্বত থেকে স্বর্গে যেতে হয় অলকানন্দার পুল পার হয়ে। পাণ্ডারা বলেন, স্বর্গে পদার্পণ করলেই যাত্রী শুদ্ধ।

পৃ ১৭—(৪) স্কন্দপুরাণে সুমেরু ও নারায়ণপর্বত একই পর্বত হিসেবে চিহ্নিত অলকা ও গৌমুখ হিমবাহকে নারায়ণ পর্বত দুভাগে করেছে। অলকাপুরী হিমবাহ উপত্যকা শতপন্থ ও গৌমুখ পর্যন্ত বিস্তৃত। অলকানন্দার উৎপত্তি ঐ অলকাপুরী হিমবাহ থেকে। বদ্রিনাথ মন্দিরের পাদপ্রক্ষালন করে অলকানন্দার উচ্ছল নীল জলধারা দেবপ্রয়াগে গঙ্গার সঙ্গে সঙ্গত হয়ে আর্যাবর্ত বিধৌত করে নেমে গেছে। অলকাপুরীতেই ছিল কুবের যক্ষ ও গন্ধর্বগণের আবাস।

পৃ ১৮—(৫) ইন্দ্র সম্ভবত কুমাওন অঞ্চলে থাকতেন। নৈনিতাল পর্বতে ইন্দ্রর রাজধানী ছিল বলে কথিত আছে। নৈনিতালের প্রাচীন নাম তাই ইন্দ্রপ্রস্থ। ইন্দ্র আর্যাবর্তের সঙ্গে হিমালয়ের বাণিজ্যবিষয়ক মন্ত্রণালয় নিয়ন্ত্রণ করতেন অথর্ববেদে তাঁকে বণিক আখ্যা দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, ইন্দ্রমহং বণিজং চোদয়ামি স ন এতু পরএতা নো অস্তু।—আমি পরমৈশ্বর্যযুক্ত ইন্দ্রকে বাণিজ্য কর্তারূপে প্রেরণ করছি। বণিকরূপে প্রেরিত ইন্দ্র আমাদের কাছে আসুন ও আমাদের পুরোগামী হোন। [অথ/৪ক সং ৩।১৫]।

পৃ ২২—(৬) লেখকের পূর্ববর্তী গ্রন্থদ্বয় দ্রঃ।

পৃ ২২—(৭) ঐ।

পৃ ২৩—(৮) ঐ।

প—৩

পৃ ২৫—১। ঋক, যজু ও অথর্ববেদে রুদ্রদের সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়। এঁরা ছিলেন খর্বকায় পার্বত্য জাতি কপর্দী গোষ্ঠী। কেশী ছিল হরিদ্রাভ এবং ঝাঁকড়া। ঝাঁকড়া চুলের জন্যই কপর্দী নাম। শিখা নীলবর্ণে অলঙ্কৃত থাকত। এজন্য তাঁদের অন্য নাম শিখণ্ডী। পেশা চাষবাস ও পশুপালন। প্রচণ্ড শক্তিশালী ও বীর। সঙ্গে সর্বদা পিনাকধনু থাকত। অভিজাতরা পাগড়ী পরতেন। শিবপশুপতি শঙ্কর ছিলেন এঁদের নেতৃত্বকারী দেবতা। অনার্য পশুপতি থেকে শঙ্কর শিব (যজুর্বেদ) ভূতপতি বা পশুপতি (অথর্ব) এবং মহেশ্বরে পরিণত হন। বর্ধনকারী শক্তিরূপে তিনি রুদ্র এবং নিধনকারী শক্তিরূপে শর্ব অভিধায় পূজিত।

পৃ ২৫—(২) সূর্যপুত্র অশ্বিনীকুমাররা দুইভাই পরস্পরের দেহের সঙ্গে একত্র সংযুক্ত ছিলেন। তাঁরা সর্বগুণান্বিত। বিশেষত চিকিৎসাবিদ্যা ও প্রাযুক্তিক বিদ্যায় সবচেয়ে অগ্রগণ্য দেবতা।

সংযুক্তদেহী যমজভ্রাতা কোনো অলৌকিক আশ্চর্য প্রাণী নয়। এই পৃথিবীতে মর্ত্যমানবের মধ্যেও অনুরূপ যমজভ্রাতা জন্মগ্রহণ করেন শ্যামদেশে (থাইল্যাণ্ডে) ১৮২১ খৃঃ। চিকিৎসাশাস্ত্রে তাই বুকে বুকে জোড়া যমজকে বলা হয়, 'স্যায়ামিজ টুইনস', যমজ ভাই, চ্যাং ও ইং। উচ্চতায় দুজনে এক ইঞ্চি কম বেশি ছিলেন। পাঁজর বন্ধনটি ছিল শক্ত এবং সেটিকে চার ইঞ্চির পর্যন্ত টেনে প্রসারিত করতে অভ্যাস করেন এঁরা। পশ্চিমা দুনিয়া এঁদের ভাঙিয়ে অর্থাৎ প্রদর্শন করে

ফলাও বাণিজ্য করেছে সেযুগে। এঁরাও বিত্তশালী হয়েছেন। এঁরা ১৮৩৯ সালে মার্কিন দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। ১৮৪৩-এ বিবাহ করেন চার্চে গিয়ে। চ্যাং এর স্ত্রী অ্যাডিলেড। ইংএর বিবাহ হয় সারার সঙ্গে। চ্যাং-এর ৭টি মেয়ে ৩টি ছেলে। ইং-এর ৭টি ছেলে ও ৩টি মেয়ে হয়। দুই স্ত্রীকে তাঁরা দুটি আলাদা বাড়ি ভাড়া করে রাখেন। তাঁরা চুক্তিমত যুগলদেহে পালা করে এক এক জনের বাড়ি যেতেন। তাঁদের মৃত্যু বড় করুণ। চ্যাং ছিলেন মদ্যপ। অতিরিক্ত মদ্য পানে অসুস্থ চ্যাং মারা গেলে সুস্থদেহী ইংকেও মরতে হল এক ঘটার মধ্যে। [শ্রীউমাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের একটি প্রতিবেদন থেকে/ 'আজকাল'/২২. ১১. ৮১]।

পৃ ২৬—(৩) লেখকের 'কুরুক্ষেত্রে দেবশিবির' দ্র ।

পৃ ২৭—(৪) জাতীয় শ্রীবৃদ্ধিতে তাঁর বিশেষ ভূমিকা ও বীরত্ব স্মরণ করে হরিবংশে' কংস-পরিচিতিতে বলা হয়েছে, 'কংসো নাম বিশালাক্ষো ভোজবংশ-বির্ধনঃ'। বিশাল আয়ত নয়নের অধিকারী কংস ছিলেন ভোজকুলের শ্রীবৃদ্ধিসাধক। যাদবদের অন্যতম শাখা ভোজবংশ। উগ্রসেন ভোজবংশেরই উত্তর পুরুষ। কংস নিহত হলে সমস্ত মথুরাপুরী শোকে স্তব্ধ হয়ে যায়। রাজ্যের সেই শোকস্তব্ধ রূপ দেখে বিষ্ণুপন্থীদের সঙ্গে কংসহত্যাকারী কৃষ্ণও সশঙ্ক হয়ে পড়েন। অবস্থা সামাল দেওয়ার জন্য তিনি তখন বিষ্ণুপন্থীদের পরামর্শ দিয়ে বলেন,—আপনারা শোকাকুল রমণী, মথুরাপুরীর নাগরিক, শিল্পী, ব্যবসায়ী সকল মানুষকে সান্ত্বনা দান করুন। বলা হয়েছে, পরিস্থিতি অবলোকনে শঙ্কিতচিত্ত কৃষ্ণ স্বদলীয় যাদবগণের সঙ্গে 'কংসর নিধনে মলিনমুখ হইয়া অনুতাপ করিতে করিতে চিন্তামগ্ন রহিয়াছেন' [বিষ্ণুপর্ব/৩১/২]। কূট রাজনীতিক কৃষ্ণ অপরাধ অনুষ্ঠানের পর বারম্বার এই একই জাতের অভিনয় করেছেন। দুর্যোধনকে অন্যায় যুদ্ধে নিহত করার পরেও তাঁকে এই রকম অনুতপ্ত হতে দেখা যায়। [কুরুক্ষেত্রে দেবশিবির দ্রঃ] রাজনৈতিক অভিনয় কুচক্রীদের এক মহাস্ত্র। ঔরঙ্গজিব এই কলাবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। আমাদের সমকালেও আমরা এমন অভিনেতা রাজনীতিবিদদের প্রায়ই দার্শনিক বনে যেতে লক্ষ্য করি। তাই কৃষ্ণের বিষণ্ণতা রাজনৈতিক কৌশলমাত্র।

নিহত কংসর শবদেহ ঘিরে বিলাপকারিণী যদু রমণীরা কংসর বীর চরিত্র স্মরণ করে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন। কংসকে যে চক্রান্ত করেই বধ করা হয়, কংসমাতার শোকাকুল বিলাপোক্তিতে পুরাণকার সে সত্য প্রকাশ করেছেন।

কংসমাতা বলেছেন,—পুত্র শূরব্রতে যুক্ত জ্ঞাতীনাং নন্দিবর্ধন।—আমার ছেলে ছিল শূরসেনে বীরব্রতধারী এবং সে বন্ধুবর্গের আনন্দ বর্ধন করত। এমন জনপ্রিয় পুত্রকে,—তথৈব জ্ঞাতিলুব্ধস্য মম পুত্রস্য ধীমতঃ। জ্ঞাতিভ্যো ভয়মুৎপন্নং শরীরান্তকরং মহৎ। অর্থাৎ সেই বন্ধু ও জ্ঞাতিবৎসল মহৎ ধীমান পুত্র আজ তারই প্রিয় বন্ধুগণের লোভের শিকার হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হলো। কংসমাতা স্বামী উগ্রসেনকেও ভর্ৎসনা করে বলেন,—হা পুত্র। তোর এই বৃদ্ধ পিতা আজ কৃষ্ণের বশীভূত হতে বাধ্য হলেন। আমি তাঁকে এই ভাবে পরতন্ত্রপরায়ণ রূপে কেমন করে সহ্য করব!—ইমং তে পিতরং বৃদ্ধং কৃষ্ণস্য বশবর্তিনম্। কথং দ্রক্ষ্যামি শুষ্যন্তং কাসারসলিলং যথা। [হরি/বিষ্ণুপর্ব/৩১/৫৪]। এই অধ্যায়ে পুরাণকার এ তথ্যই প্রকাশ করেছেন যে, তৎসমকালে কংস অনুরাগীর সংখ্যাই ছিল প্রচুর। তাই কংসবধে গোপন চক্রান্ত করতে হয়েছে, এবং জনমত ঠাণ্ডা রাখার জন্যই চতুর কৃষ্ণ উগ্রসেনকে পুতুলরাজা হিসেবে মথুরার সিংহাসনে বন্দী করে রেখেছেন। উগ্রসেন পুত্রের দ্বারা কখনো বন্দী হন নি। ও গল্প পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণদের প্রচার মাত্র। এ তথ্য বর্তমান উপন্যাসে অন্যত্রও লক্ষিত হবে।

পৃ ২৯—(৭) শঙ্কর ছিলেন পৃথ্বীবাসী অনার্য দেবতা। আপন প্রতাপে তিনি আর্যদের জনগোষ্ঠীর মধ্যে নিজের স্থান করে নেন ও অনুরাগী শৈবদের মাধ্যমে নিজের পূজার প্রচলন করেন। এই অধিকার অর্জনের জন্য ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্রের সঙ্গে তাঁকে সংগ্রামেও অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। বিভিন্ন পুরাণে তার একাধিক প্রমাণ ছড়িয়ে আছে। সবচেয়ে সুবিদিত কাহিনী দক্ষযজ্ঞ। এ সম্পর্কে পণ্ডিতজনের সিদ্ধান্ত ও বিতর্ক আমার পূর্ববর্তী গ্রন্থদ্বয়ে আলোচনা করেছি।

পৃ ২৯—(৮) এই বক্তব্যের সমর্থনে পৌরাণিক তথ্যপ্রমাণসহ আমার যুক্তি পূর্ববর্তী গ্রন্থদ্বয়ে বিস্তারিত করেছি। পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এ বিষয়ে ডঃ কল্যাণ কুমার গাঙ্গুলীর বিতর্ক প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন, "There were people who held the sons of Dhritarastra as the legimate hiers to the kingdom···Duryodhana had certainly better claim than Yudhisthira to be consecrated as the crown prince. Some pa'ace intrigue and political manoeuvre had helped in raising the c'aims on behalf of the Pandus. Yudhisthira was certainly the eldest prince in the family but he was not an *aurasajata*

son of the king Paudu as Duryodhana was of his father...."
[Some Aspects of Sun worship in Ancient India দ্রঃ]। ডঃ সুকুমার সেন সিংহাসনে পাণ্ডবদের দাবি নাকচ করে মন্তব্য করেছেন যে, কুন্তীর সঙ্গে শাস্ত্রমতে পাণ্ডুর বিবাহ হয় নি। সুতরাং পাণ্ডবরা ছিলেন হস্তিনাপুরের সিংহাসনে অনধিকারী। ['ভারতকথার গ্রন্থিমোচন' দ্রঃ]।

পৃ ৩১—(৭) অংশ শব্দের অর্থ—ভাগ, খণ্ড, দেবতার ভাগ, দেবতার ঔরস [চলন্তিকা]। পুরাযুগে দেবতারা পৃথিবীব্যাপী বিভিন্ন ভূখণ্ডের মালিক হয়ে বসেন। পুরোহিতরা তাঁদের প্রতিনিধিস্বরূপ বিপুল সম্পত্তির মালিক হন এবং এভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয় পুরোহিততন্ত্র; শুধু ভারতেই নয়, পৃথিবীর অন্যান্য স্থানেও। রাজারা রাজদণ্ড লাভ করেন দেবতাদের হাত থেকেই। এবং পুরোহিত ও রাজশক্তির সহায়তায় এক এক গোষ্ঠীর দেবতাকে বানানো হয় জগদীশ্বর, প্রচলিত হয়, সাম্প্রদায়িক দেব আরাধনা। [কুরুক্ষেত্রে দেবশিবির দ্রঃ]।

প—৪

পৃ ৩৭—(১) কাহিনীটি সুন্দরভাবে সংক্ষেপে উপস্থাপিত করেছেন *Veronica Ions*। লিখেছেন, "Vishnu .made use of two Yadavas loyal to him. They were Devaka, an uncle of Kansa, and Basudeva to whom Devaka's six elder daughters were married. Vishnu ordained that the seventh daughter, Devaki, should also be married to Basudeva"—*Indian Mythology*.

পৃ ৪২—(২) কংস জন্ম সম্পর্কে হরিবংশে এমনই একটি মুনিতে বানানো গল্প আছে। কংস জারজ সন্তান, এমন কথা পূর্বাপর ইতিবৃত্তে কোথাও উচ্চারিত হয় নি। কংসজন্মে কলিমা লেপনের উদ্দেশ্যে কোনো অর্বাচীন কথক হঠাৎ এমন একটি অদ্ভুত জন্মকাহিনী হরিবংশে গেঁথে দিয়েছেন। কাহিনীটি যে উদ্দেশ্যমূলক ও ভিত্তিহীন—গ্রন্থনার দুর্বলতাই তা প্রমাণ করে। প্রথমত, এই কাহিনী নারদ ছাড়া আর কেউ জানতেন না। জীবনের কোনো সময়ই কংসকে তাঁর জন্ম নিয়ে চিন্তিত হতে দেখা যায় নি, তাঁর শত্রুরাও এ কাহিনী প্রচার করেন নি। কথক আমাদের বিশ্বাস করতে বলেছেন যে, কংসশত্রু দেবপক্ষের ঋষি

নারদের মুখে এই কাহিনী শুনে কংস নাকি তা বিশ্বাস করেছিলেন। এমন অলীক বিশ্বাস কংসের মতো রাজপুরুষের কাছে আশা করা যায় না। দ্বিতীয়ত কংস কখনই যে কাহিনীর উল্লেখ করেন নি কোথাও, সেই গোপন জন্মরহস্য-কথা তিনি নাকি তাঁর জীবন সায়াহ্নে সামান্য এক মাহুত (মহামাত্র) কে বলে যান। রাজা কংসের পক্ষে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ গোপন বিষয় সামান্য এক মাহুতের সঙ্গে আলোচনা করা সম্ভব নয়। তৃতীয়ত, এই জন্মকাহিনীর সত্য-মিথ্যা তিনি তাঁর জননীর কাছে জেনে নিতে পারতেন, কিন্তু সে চেষ্টাও তাঁকে করতে দেখা যায় নি। সুতরাং এই কাহিনীটি যে কংসমাতার পবিত্র চরিত্রে কালিমা লেপনের জন্যই রচিত, তা বুঝতে কোনো বুদ্ধিমান পাঠকেরই অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। সেকালে পরশ্রমভোগী ব্রাহ্মণরা এমনি অজস্র মিথ্যা গল্প পুরাণে মহাভারতের ঠেসেছেন নির্বিচারে! তারই ফলে তাদের কলেবর বৃদ্ধি হয়েছে লক্ষ শ্লোকে।

পৃ ৪৩—(৩) লেখকের 'কুরুক্ষেত্রে দেবশিবির' দ্রঃ।

পৃ ৪৪—(৪) বসুদেবের মহিষীর সংখ্যা একাধিক। কিন্তু বসুদেবপুত্র হিসেবে পরিচিত কৃষ্ণ ও বলরাম কেউই বসুদেবের ঔরসে জন্ম লাভ করে নি। অন্য পুরাণে অবশ্য বসুদেবের ঔরসজাত সন্তানদের নামের তালিকা আছে। হরিবংশ অনুসারণে লিখিত এই উপন্যাসে সে তথ্য ব্যবহারের প্রয়োজন দেখি নি।

পৃ ৪৪—(৫) হরিবংশের তথ্যাবলী থেকে জানা যায়, বিষ্ণু স্বয়ং পাতাল বা দাক্ষিণাত্যে যান। সেখানে হিরণ্যকশিপু-ভ্রাতা কালনেমির ঔরসজ ছটি শিশুভ্রূণ জলপাত্রে (টেস্ট টিউবে? রক্ষিত ছিল। তারা কালরূপিণী নিদ্রার দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল (বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় জিয়ানো?)। [হরিবংশ৷ বিষ্ণুপর্বে ২ অ/২৫]। সদ্যস্ফুট সেই ছটি জীবনকে দেবধাত্রী যোগনিদ্রার হাতে তুলে দিয়ে বিষ্ণু আদেশ করেন—গচ্ছ নিদ্রে ময়োৎ সৃষ্টা দেবকীভবনান্তিকম্॥ [ঐ/২৭] অর্থাৎ হে নিদ্রে! আমার আজ্ঞাক্রমে দেবকীগৃহে গমন করো এবং সেখানে গিয়ে এই ষড়গর্ভ দানবশিশুগুলিকে এক এক করে দেবকীগর্ভে স্থাপিত করো: —ষড়গর্ভান্ দেবকীগর্ভে যোজয়স্ব যথাক্রমম্॥ [ঐ/২৮]।

বিষ্ণু পুরাণেও একই কথা লিখিত আছে: হিরণ্যকশিপো. পুত্রাঃ ষড়-গর্ভা ইতি বিশ্রুতাঃ। বিষ্ণুপ্রযুক্তা তান্ নিদ্রা ক্রমাদ্ গর্ভে ন্যযোজয়ৎ॥ [বিষ্ণু পু ৫মাংশে ১ম অ/৬৯]।

আধুনিক বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির প্রেক্ষাপটে আজ আর, বোধহয়, এই বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকাণ্ডকে কেউ ঈশ্বরের অলৌকিক কার্য বলে গণ্য করবেন না, অনায়াসেই ব্যাপারটিকে বাস্তবসম্ভব বলে বুঝতে চেষ্টা করবেন।

পৃ ৪৫—(৬) গর্গ না শুনে থাকুন, আমরা আজ ভ্রূণ স্থানান্তরের ঘটনাকে আর অলৌকিক ব্যাপার মেনে বিস্মিত হই না। পরীক্ষাপাত্রে (টেস্ট টিউবে) ঔষধে-জারিত ভ্রূণ থেকে শিশুজন্মের খবর আমরা দেশে-বিদেশে পেয়েছি। দেশী-বিদেশী চিকিৎসকগণ সম্ভব করে তুলেছেন নতুন জীবাণুর সৃষ্টি। এক পুরুষের শুক্র কৃত্রিম উপায়ে বন্ধ্যা নারীর গর্ভে প্রবিষ্ট করিয়ে তাকে সন্তানবতী করে তোলাতেও সফল হয়েছে বিশ শতকের বিজ্ঞান।

ক্যালিফোর্নিয়ার সংবাদপত্রে এখন হামেশাই একটি চমকপ্রদ বিজ্ঞাপন চোখে পড়ছে: 'বন্ধ্যা নারীর হয়ে গর্ভ ধারণের জন্য উপযুক্ত মহিলা চাই'। ব্যাপারটি চমকপ্রদ। যে নারীর সন্তান ধারণের ক্ষমতা নেই, আজ সেই বন্ধ্যা নারীও অন্যের গর্ভে বর্ধিত নিজ স্বামীর ঔরসজাত ভ্রূণের সাহায্যে সন্তান লাভ করছেন। ইংলণ্ডে এমন ঘটনা নিয়ে প্রকাশ্য বিচারালয়ে মামলাও হয়ে গেছে। এক মহিলা অন্যের স্বামীর ঔরসে গর্ভ ধারণ করলে গর্ভধারিরণীব কাছে বন্ধ্যা নারী তাঁর স্বামীর ঔরসজাতকে দাবি করেন চুক্তিমতো। কিন্তু গর্ভধারিণী তাকে প্রত্যার্পণে অস্বীকৃত হন। তাই নিয়ে চলেছিল প্রকাশ্য বিচার।

বাইবেলে হিব্রু দেবতা সদাপ্রভু কর্তৃক সন্তান ধারণে অক্ষম নব্বই বছরের নারী সারাকে সন্তান প্রদানের কাহিনী একই রকম কৌতুহলোদ্দীপক। গল্পটি এই রকম:

আব্রাহামের কাছে একদিন ঈশ্বর সদাপ্রভু এলেন জুতোজামা পরিহিত দুই দেবদূতকে সঙ্গে নিয়ে। আব্রাহাম ঈশ্বরসহ দেবদূতদের দই রুটি ও গোবৎসের কচি মাংস পরিবেশন করে আপ্যায়ন করলেন। দেবতারা আব্রাহামের তাঁবুর দ্বারে উপবেশন করলেন। ঈশ্বর বললেন, আব্রাহাম! তোমার স্ত্রী সারার একটি ছেলে হবে। তাঁবু দ্বারে দাঁড়িয়ে নব্বই বছরের বুড়ি সারা একথা শুনে হেসে ফেলেন। মনে মনে ভাবেন, এই বুড়ো বয়সে তিনি আবার বুকের দুধ খাইয়ে ছেলে মানুষ করবেন নাকি? এমন অসম্ভব কথাও কেউ বলে। এখন তাঁর "স্ত্রী ধর্ম নিবৃত্ত" হয়েছে। তাছাড়া স্বামীও বৃদ্ধ ও অক্ষম। সদাপ্রভু তখন আব্রাহামকে বললেন, "সারা কেন এই বলিয়া হাসিল যে, আমি কি সত্যিই প্রসব করিব, আমি যে বুড়ী? কোন কর্ম

কি সদাপ্রভুর অসাধ্য ?" [আদিপুস্তক/বাইবেল/১৮ ॥ ১—১৪]। বস্তুত সারা তো জানত না যে, যে সদাপ্রভু উড়ন্ত আকাশযানে ঘুরে বেড়ান, সেই বিজ্ঞানী দেবতাদের পক্ষে অসম্ভব কাণ্ড ছিল না বৃদ্ধার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করা। ইদানীং ভারতীয় চিকিৎসকেও প্লাস্টিক সার্জারি করে অসুন্দরকে সুন্দর, বৃদ্ধকে নবীন যুবক বানিয়ে দিচ্ছেন। বিদেশে গর্ভ স্থানান্তর নিত্য ঘটনা। সুতরাং বিজ্ঞানী সদাপ্রভু অনায়াসেই সারাকে গর্ভবতী করেছিলেন ভ্রূণ স্থানান্তর করে, অথবা ভ্রূণ প্রোথিত করে।

পৃ ৪৫—(৭) দেবকীর সপ্তম গর্ভে বিষ্ণুর [মতান্তরে শেষনাগের] ঔরসে বলরামের জন্ম। বিষ্ণু নিজে যোগনিদ্রাকে বলেছেন,

সপ্তমো দেবকীগর্ভো যোঽংশঃ সৌম্যো মমাগ্রজঃ।
স সংক্রাময়িতব্যস্তে সপ্তমে মাসি রোহিণীম্ ॥ ৩১ ॥
সঙ্কর্ষনাত্তু গর্ভস্য স তু সঙ্কর্ষণো যুবা।
ভবিষ্যত্যগ্রজ ভ্রাতা মম শীতাংশু দর্শনঃ ॥ ৩২ [হরিবংশ/বিষ্ণু/২য়]

অর্থাৎ দেবকীর সপ্তম গর্ভে আমারই সৌম্য অংশ জন্মগ্রহণ করবে (বিষ্ণু-ঔরসে সপ্তম গর্ভ উৎপন্ন হবে, সে পূর্বে উৎপাদিত হওয়ায় (অষ্টমে কৃষ্ণজন্ম হেতু) আমার (বিষ্ণুপুত্র কৃষ্ণের) অগ্রজ হবে। গর্ভ সাত মাস পূর্ণ হলে যোগ-নিদ্রা সপ্তম মাসে সেই গর্ভ আকর্ষণ করে তাকে রোহিণীর গর্ভে স্থাপন করবেন।

দুর্ভাগিনী রোহিণী স্বামীর দ্বারা গর্ভবতী হওয়ার সুযোগ পান নি। বলরামকে তিনি মাত্র মাসখানেক গর্ভে ধারণ করেন। এজন্য রোহিণীর মাতৃত্বের কোনো খবর নেই। কৃষ্ণ বলরামের মা রূপে নন্দজায়া যশোদাই আমাদের কাছে সমধিক পরিচিত।

পৃ ৪৫—(৮) দেবতা ও ব্রাহ্মণদের কাছে দানযজ্ঞবিরোধী অসুর-দানব গোষ্ঠী বিধর্মী হিসেবে সব সময়ই হননযোগ্য। দেব-উদ্দেশ্য সাধনে তাই কালনেমির ষড়্গর্ভ সন্তানদের দেবকীপুত্ররূপে কংসের হাতে গোপনে তুলে দেওয়া হয়। এইভাবে একই উপায়ে বধ করা হয় দুই শত্রু দানবপুত্র এবং কংসকে। কংস পরিচিত হন শিশুঘাতকরূপে। যদিও প্রকৃতপক্ষে বিষ্ণু ও দেবকই শিশুঘাতক। কিন্তু তারও থেকে অন্যায় কাজ যশোদাকন্যাকে হত্যার উদ্দেশ্যে কংসঘাতকের হাতে তুলে দেওয়া। নন্দের সঙ্গে বন্ধুত্বের ছলে নন্দের একমাত্র সন্তানকে হত্যা করান বসুদেব—অথচ পুরাণে ভাগবতে এঁরাই মহান চরিত্র হিসেবে কথিত।

পৃ ৪৫—(৯) বিষ্ণুপুরাণে কৃষ্ণজন্মের সময় সম্পর্কে বলা হয়েছে :

প্রাবৃটকালে চ নভসি কৃষ্ণাষ্টম্যামহং নিশি।

উৎপৎস্যামি নবম্যাঞ্চ প্রসূতিং ত্বমবাপ্স্যসি ॥ [বিষ্ণু/১৭/১.৭৭]

"বর্ষাকালে (শ্রাবণ মাসে) কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী নিশীথ সময়ে আমি জন্মগ্রহণ করিব এবং তুমিও নবমীতে জন্মগ্রহণ করিবে।" [অনু/আর্যশাস্ত্র সং]। প্রচলিত মতে কিন্তু কৃষ্ণজন্ম হয় ভাদ্র মাসে মধ্যরাত্রে কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে। হরিবংশের বিষ্ণুপর্বে [২.৩৫] সংশ্লিষ্ট পদটির অনুবাদে আর্যশাস্ত্র সং লিখছেন: "ভাদ্র-মাসের কৃষ্ণপক্ষের নবমী তিথিতেই তোমার (যোগনিদ্রার) জন্ম হইবে।" অর্থাৎ ভাদ্রের অষ্টমী তিথিতে কৃষ্ণের জন্ম।

পৃ ৪৫—(.০) বিষ্ণুপুরাণের তথ্য: "বসুদেব বিষ্ণুকে বহন করত অতিশয় গভীর ও নানা ঘূর্ণিতে পূর্ণা যমুনা নদী জানু পরিমিত জলেই পার হইলেন এবং কংসের নিমিত্ত কর লইয়া যমুনা-তটে সমাগত নন্দ প্রভৃতি গোপবৃন্দকে দর্শন করিলেন। হে মৈত্রেয়! সেই সময়ই যোগনিদ্রা কর্তৃক জনসমূহ মোহাচ্ছন্ন হইলে বিমোহিতা যশোদাও সেই কন্যাকে প্রসব করিয়াছিলেন। অতিশয় কান্তিমান বসুদেব শয্যায় বালককে রাখিয়া কন্যা গ্রহণ করত শীঘ্র প্রত্যাগমন করিলেন।' [বিষ্ণুপুরাণ / ৫ অ / :৮-২১]।

এই অংশে আমরা কয়েকটি চমকপ্রদ সংবাদ পেলাম। (১) প্রচলিত গল্প, বসুদেব যখন কৃষ্ণকে নন্দালয়ে নিয়ে আসেন তখন প্রচণ্ড বর্ষণে যমুনা প্লাবিত ছিল এবং শেষনাগ বসুদেবের মাথায় ছত্রধারণ করে—এমন বানানো গল্পের কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। হরিবংশ বিষ্ণুপুরাণই কৃষ্ণজীবনের আদি ইতিবৃত্ত। ভাগবত নিতান্তই আধুনিক। গল্পটি ভক্তি-অন্ধ মুনিদের দ্বারা পরবর্তীকালে প্রচারিত। (২) নন্দ সেই মধ্যরাত্রে দলবলসহ কংসের কর নিয়ে মথুরা যাচ্ছেন। ঘরে প্রসব-বেদনাতুর যশোদাকে একাকী রেখে তাঁর এই সদল যাত্রার কারণ কি? তবে কি বুঝতে হবে যে, বিষ্ণু ও বসুদেবের ষড়যন্ত্রেই সে রাত্রে নন্দকে মথুরা পাঠানো হয়েছিল যোগনিদ্রা ও বসুদেবের পক্ষে নন্দজায়ার শিশুকন্যাটিকে চুরি করার সুবিধার জন্য? এই সময় নন্দকে বন্ধুত্বের ছলে বসুদেব নিজের আয়ত্তে এনেছিলেন। (৩) যোগনিদ্রা বিশেষ ঔষধ প্রয়োগে কংসপ্রহরীদের আচ্ছন্ন করেছিলেন, এবং আদৌ কংস কারাগারে বন্দী ছিলেন না। ছিলেন নিজগৃহে নজরবন্দী।

পৃ ৪৬—(১১) ইন্দ্রজালের বর্ণনা আছে অথর্ববেদে [অ ৮/৮]। এই প্রসঙ্গে দাহিকাশক্তিসম্পন্ন এক জাতের বিষাক্ত গন্ধযুক্ত পূতিরজ্জুর উল্লেখ করা হয়েছে।

এই গ্যাস-তার ধীরে ধীরে পুড়তে থাকলে তার ধোঁয়ায় শত্রুরা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ত। [স্বর্গলোক ও দেবসভ্যতা / শ্রী রাজ্যেশ্বর মিত্র দ্রঃ]। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে অর্জুন কর্তৃক কুরুবীরদের মোহাচ্ছন্ন করার ঘটনাটি। ইন্দ্রই ছিলেন এই ইন্দ্রজালের উদ্ভাবক। আর এক ধরনের ইন্দ্রজাল ব্যবহৃত হত। সূক্ষ্ম জাল দিয়ে শত্রুদের বেঁধে ফেলা হত। উন্নত বৃক্ষের মাথায় ও মাটিতে এইসব অদৃশ্যপ্রায় জাল বিছানো থাকত। জালে মাছ ধরার মতোই দেবতারা শত্রু ধরতেন।

পৃ ৪৬—(১২) দেবকীর প্রতি 'দেবগর্ভা' অবিধা প্রয়োগের দ্বারা তাঁর দেব (বিষ্ণুর)—ঔরসে গর্ভ-ধারণের বিষয়টিকেই স্বীকৃতি জানানো হয়েছে। বিষ্ণুপুরাণে স্পষ্টত বলা আছে,—'দেবকীগর্ভে ভগবতশ্চ প্রবেশঃ।" দেবতারা এই কারণেই দেবকীর স্তুতি করে বলেছেন,—বিষ্ণুর গর্ভধারিণী তুমিই 'দেবগর্ভা'।

প—৬

পৃ ৬৩—(১) দেববিরোধী অ-সুরশক্তি নিধনের জন্য হিমাচল স্বর্গে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর যে পরামর্শ সভা বসেছিল সেখানে দেবর্ষি নারদও উপস্থিত ছিলেন। ঐ বৈঠকে বিষ্ণু জানতে চান, অসুর বিনাশ কার্যে তাঁর ভূমিকা কি হবে। ব্রহ্মা বলেন, বিষ্ণুকে তাঁর শক্তির দ্বারা দেবকীগর্ভে এক অংশাবতার সৃষ্টি করতে হবে। তিনিই ব্রজের গোপালক সম্প্রদায়কে রক্ষা এবং মথুরাধীশ কংসকে হত্যা করবেন। ব্রহ্মা আরও বলেন, যে দেবতারা বিষ্ণুর অনুগত, তাঁরাও ব্রজে 'গোপ হইয়া সর্বদা আপনার সহায়ক হইবে'। [হরিবংশ / ৫৪ ৪৫]

দেবগণের অংশাবতার বলতে কী বোঝায় এ বিষয়ে পূর্ববর্তী গ্রন্থে একাধিক-বার আলোচনা করেছি। বুঝেছি, অংশাবতার দেবতার অংশ অর্থাৎ ঔরসজাতকেই বলে। কৃষ্ণ বিষ্ণুর ঔরসে দেবকী-গর্ভজাত ও তদানুসারে তিনি দেবপুত্র এবং বিষ্ণুর অংশাবতার। কৃষ্ণের সহায়তার জন্য ব্রহ্মার পরিকল্পনানুসারে গোপ সম্প্রদায়ের মধ্যে গোপবেশে দেবতাদের বসবাস ছিল, হরিবংশ এ সংবাদই আমাদের কাছে হাজির করেছেন।

দেবী ভাগবতে বলা হয়েছে, দেবী মহামায়া পৃথিবীর ভারাবতরণের কাজে দেবতাদের নিয়োগ করে বলেন, তোমরা সস্ত্রীক নিজ নিজ অংশে গোকুলে ও মথুরায় জন্মগ্রহণ করে বিষ্ণুর সহায়তা করো। [৪র্থ স্কন্দ ২০ অ]।

পৃ ৬৪—(২) গোবর্ধন ছিল মথুরার অন্তর্ভুক্ত বনভূমি বৃন্দাবনের একটি অনুচ্চ পাহাড়। এই পাহাড়ের কোল ঘেঁষে প্রবাহিত ছিল যমুনা নদী। অবশ্য শূর-সেনের সেই রাজধানী মথুরা [যার তৎকালীন নাম, মধুপুরী, মদোরা বা 'দেবতা-দের নগর'] বর্তমান মথুরা নয়। যমুনার প্লাবনে পৌরাণিক মথুরা জলমগ্ন হলে রাজধানী উত্তরদিকে স্থানান্তরিত হয়। (Historical Geography of Ancient India / Dr. B. C. Law / Societe Asiatique de Paris)।

পৃ ৬৯—(৩) হরিবংশে উক্ত এক জাতের পতঙ্গ।

প—৭

পৃ ৭৭—(১) বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ, শ্রীমদ্ভাগবত—তিনটি পুরাণেই কিশোর কৃষ্ণের মুখে একটি অবিশ্বাস্য দীর্ঘ বক্তৃতা সংযুক্ত করা হয়েছে। কৃষ্ণ কিছুদিন বৃন্দাবনের বাইরে কোনো এক অজ্ঞাত স্থানে ছিলেন। বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্তন করেই গো-গিরি-ব্রাহ্মণ পূজার ওপর তিনি চমকপ্রদ প্রলম্ব বক্তৃতা করেন। ইন্দ্রযজ্ঞ বন্ধ করে প্রচলন করেন, গিরিযজ্ঞের। প্রশ্ন, এই বক্তৃতা তাঁকে শেখালো কে এবং ইন্দ্রযজ্ঞ বন্ধের সাহসই বা তিনি পেলেন কোত্থেকে? নন্দই বা এমন একটি প্রস্তাব মেনে নিলেন কোন্ সাহসে? এসব প্রশ্নের উত্তর পুরাণকারই দিয়ে গেছেন। বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্তন করে কৃষ্ণ যে এমন একটি নাটক করবেন, ঘটনা পারম্পর্যে মনে হয়, নন্দ তার আভাস আগেই পেয়েছিলেন বসুদেবের বা গর্গের কাছে। তাই গোপবৃদ্ধদের আশঙ্কা ও আপত্তি সত্বেও কিশোর কৃষ্ণের আদেশকেই তিনি রূপায়িত করার হুকুম দেন। তাছাড়া এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত কেবলমাত্র কৃষ্ণের বক্তৃতার ফলেই গহীত হওয়া সম্ভব ছিল না। পরবর্তী পর্বে স্বয়ং ইন্দ্রের আগমনে ও কৃষ্ণকে উপেন্দ্র পদে অভিষিক্ত করে যাওয়ার ঘটনায় তা প্রমাণিত হয়েছে।

ঘটনাসূত্রে জানা যায়, বসুদেবের ইচ্ছায় যদুকুলগুরু গর্গ কৃষ্ণের প্রাথমিক শিক্ষার ভার নেন। সুতরাং এটাই স্বাভাবিক যে, গিরিযজ্ঞ প্রবর্তনের মাধ্যমে কৃষ্ণের অলৌকিক প্রতিষ্ঠা স্থাপনার উদ্দেশ্যে দেবতারা কৃষ্ণকে গর্গের আশ্রমে নিয়ে যান ও সেখান থেকে কৃষ্ণ ঐ বক্তৃতা মুখস্থ করে আসেন। পাছে মুখস্থ ভুল হয়ে যায় তাই বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্তন করেই টাটকা তা গল্‌গল করে উগরে যান কৃষ্ণ। এমন একটি বক্তৃতা নিবেদনের আগে উপযুক্ত পরিবেশ তৈরী করে

নেওয়ার মতো ধৈর্যও তাঁর পক্ষে ধারণ করা সম্ভব হয় নি। ঘটনাটি আপাত অবিশ্বাস্য হলেও, ঘটনাপ্রবাহ লক্ষ্য করলে, কৃষ্ণের ও নন্দের এই আচরণ অস্বাভাবিক মনে হয় না।

শ্রীমদ্ভাগবতে প্রকাশ, কৃষ্ণের অলৌকিক কার্যাবলী দর্শনে বিস্মিত গোপেরা যখন নন্দকে বিভিন্ন প্রশ্নে উত্যক্ত করছেন, তখন নন্দ তাঁদের বলেছেন, "…হে গোপগণ, এঁর কার্যাবলী দেখে আশ্চর্যান্বিত হবার কারণ নেই। গর্গ সাক্ষাৎ আমাকে এই আদেশ দিয়ে স্বস্থানে চলে গেলে আমি সেই থেকে শ্রীকৃষ্ণকে নারায়ণের অংশ বলেই মনে করি, কারণ তিনি আমাদের ক্লেশ দূর করেন।" [১০ম স্কন্ধ / ২৬ অ / ১৫-২৩ / হরফ সং]।

অতএব এটা সুস্পষ্ট যে গোপসমাজে কৃষ্ণের প্রতিষ্ঠার জন্য ব্রহ্মার আদেশে দেবপক্ষীয় গর্গ আগেই নন্দকে যেমন তৈরী করে গেছলেন, কৃষ্ণকেও তেমনি তিনিই তৈরী করে পাঠান।

পৃ ৭৮—(২) হরিবংশ থেকে জানা যায়, কৃষ্ণ-অনুরাগিণী গোপবালারা কৃষ্ণকে মুগ্ধ করার মানসে, "নিজ নিজ অঙ্গে ……শুষ্ক করীষচূর্ণ [গোময়-চূর্ণ] অঙ্গরাগরূপে লেপন করতেন।" অর্থাৎ আভীর রমণীদের অঙ্গরাগ ছিল গোময়চূর্ণ।

"করীষপাংসুদিগ্ধাঙ্গস্তাঃ কৃষ্ণমনুবব্রিরে।
রময়ন্ত্যো যথা নাগং সম্প্রমত্তং করেণবঃ॥

[বিষ্ণুপর্ব / ২০-৩০ / আর্যশাস্ত্র সং]

পৃ ৮২—(৩) হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত সর্বত্রই বলা হয়েছে : ইন্দ্রোৎসব বন্ধ হলে ক্রুদ্ধ দেবরাজ গোকুলের ওপর সাতদিন ধরে প্রবল বর্ষণ সৃষ্টি করেন বর্ষণের সঙ্গে ইতস্তত শিলাপাতও হতে থাকে। বর্ষণের সঙ্গে ইন্দ্রকে জড়িয়ে পুরা-উপাখ্যান আছে একাধিক। ঘটনাটিকে সুতরাং কাকতালীয় বলে সহজে উড়িয়ে দিলে পুরাতথ্যের প্রতি সুবিচার করা হবে না। এ জাতীয় ঘটনার সম্ভাব্যতা নিয়ে বরং অন্যভাবে চিন্তা করাই সমুচিত। দেখতে হয়, এমন দুর্যোগ সৃষ্টি কি উন্নততর বিজ্ঞানের দ্বারা সম্ভব? কেননা বাইবেলেও হিব্রু দেবতার এ হেন প্রতাপের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। অর্থাৎ দেহবান দেবতারা এমন দুর্যোগ ঘটাতে পারতেন।

লণ্ডনের সৈন্যাপত্য বিদ্যাসংক্রান্ত আন্তর্জাতিক শিক্ষালয়ের প্রতিবেদনে প্রকাশ : অত্যাধুনিক বিজ্ঞান প্রাকৃতিক দুর্যোগ সৃষ্টির ওপর আধিপত্য কায়েম করতে চলেছে। শীঘ্রই দেবতাদের মতো মানুষও ব্যবহার করবে বাতাবরণাস্ত্র।

বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির সাহায্যে শত্রুদেশের ওপর নামিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে প্রবল বর্ষণ অথবা শিলাপাত, বহিয়ে দেওয়া যাবে তুষার ঝঞ্ঝা। নষ্ট করতে পারবে তা ক্ষেত ভরা সরস ফসল, শুকিয়ে দিতে পারবে প্রাণচঞ্চল বনভূমি। বিজ্ঞানী আবহস্রষ্টারা এমন অনেক বৈজ্ঞানিক খেলা রপ্ত করেছেন ও করতে চলেছেন যা ইতিপূর্বে অলৌকিক ও ঐশ্বরিক বলেই গণ্য হ'ত। [প্রমাণ/দানিকেন। অনু: অজিত দত্ত]।

বিজ্ঞানীরা প্রাকৃতিক এমন অনেক ব্যাপার তাঁদের নিয়ন্ত্রণে আনছেন ও এনেছেন, যে সংবাদগুলি ঠিক ঠিক সাধারণের কাছে পৌছালে দেবতাদের পুরাকীর্তি একান্তভাবেই বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিবিদ্যার নজির বলেই আমাদের ধারণা হবে। পুরাণ-কথাকে আর পুরানো মনে হবে না। দেবতাদের অলৌকিক ক্ষমতা আয়ত্ত করে আজ পৃথিবীর অনেক অজ্ঞাত স্থানে বিশ শতকের মানুষ-দেবতারা সৃষ্টি-ধ্বংসের আয়োজনে সর্বপ্রযত্নে গবেষণা কর্মে নিযুক্ত আছেন।

একটি সাম্প্রতিকতম সংবাদ নজরে এলো। সোভিয়েত লিতারেতুরানাইয়া গজেতার সংবাদদাতা আইওনা আন্দ্রোনভ 'মৃত্যুর স্মৃতিকাগার' নামক একটি প্রবন্ধে জানিয়েছেন, মার্কিনী বিজ্ঞানীরা লাহোরে এমন এক ধরনের মারাত্মক বিষাক্ত মশার বর্ণ-সঙ্কর সৃষ্টি করেছেন যাদের কামড়ে আক্রান্ত মানুষ পীত জ্বর বা কাম্‌লারোগে মারা যায় অথবা একেবারে উন্মাদ হয়ে যায়। মানুষের ওপর এই মারাত্মক বীভৎস পরীক্ষাও হয়ে গেছে ঐ লাহোরেই। বিজ্ঞানীরা শত্রুদেশের ওপর মশক অভিযান চালনার জন্যই এ ধরনের মশকবোমার সৃষ্টি করেছেন। প্রকাশ, লাহোর বিজ্ঞানাগারে এই বিষাক্ত মশার দৈনিক উৎপাদন হচ্ছে; বিশ হাজার মশক। এই কারখানা সরেজমিনে তদন্ত করে সাংবাদিক আন্দ্রোনভ মন্তব্য করেছেন: "দেখে মনে হয়, মার্কিন অধ্যাপক স্যামুয়েল কোহেন, যিনি পশ্চিম ইউরোপকে পেন্টাগণের অগ্রঘাঁটিতে পরিণত করার জন্য নিউট্রন বোমা বানিয়েছেন, তার সঙ্গে এদের [মশক স্রষ্টা "উন্মাদ ধর্ষকামী" বিজ্ঞানীদের] মানসিক আত্মীয়তা রয়েছে। হাইড্রোজেন বোমার জনক মার্কিনী অধ্যাপক এডওয়ার্ড টেলার। যিনি তাপ পারমাণবিক ঝঞ্ঝার সাহায্যে সমাজতান্ত্রিক দেশ-গুলিকে ধ্বংস করার ডাক দিয়েছেন, তিনিও একই পথের পথিক। এইসব অধ্যাপকদের ডাক্তারী মতে উন্মাদ বলা যায় না; এরা হলেন সোজা কথায় যুদ্ধ অপরাধী।"

পুরা কাহিনীতে দেবতারা নির্মম যুদ্ধবাজরূপে চিত্রিত। বহু দুর্গ ধ্বংসকারী ইন্দ্রের বিখ্যাত খেতাব ছিল, পুরন্দর। এই ইন্দ্রকেও কি যুদ্ধ অপরাধী বলা যায় না? এই দেবতাদের হাতে কি সেদিন বাতাবরণাস্ত্র ছিল?

পৃ ৮২—(৪) যাঁ হাতে কৃষ্ণকর্তৃক গোবর্ধন-ধারণের গল্পটি সৃষ্টি করা হয়েছে শ্রীমদ্ভাগবতে। সেখানে পৌরাণিক তথ্যাদি গায়েব হয়ে গেছে। ঐতিহাসিক বাসুদেব কৃষ্ণকে ঐতিহাসিক বিষ্ণুর অবতার রূপে প্রতিষ্ঠা করার জন্য অজস্র রূপকথার [বঙ্কিম মতে উপন্যাসের] সৃষ্টি করেছেন ভাগবত। এই ভাগবত হরিবংশ বিষ্ণুপুরাণ থেকে কয়েক শতক পরে লিখিত। কিন্তু প্রাচীন হরিবংশে কৃষ্ণ বা বিষ্ণুর ভাগবত প্রতিষ্ঠার আয়োজনে যথেচ্ছভাবে তথ্য গায়েবের চেষ্টা নেই। আছে বরং বাস্তব-সম্মত বর্ণনা। মাঝে মধ্যে কৃষ্ণ ও বিষ্ণুকে ঈশ্বরোপম প্রতিষ্ঠা দানের যে চেষ্টা লক্ষিত হয়, মূল পৌরাণিক আখ্যানের সঙ্গে তার যোগসূত্র অত্যন্ত ক্ষীণ। হরিবংশে উল্লিখিত অলৌকিক উপন্যাসগুলি মূল কাহিনীর সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করতে পারে নি। সেগুলিকে প্রক্ষিপ্ত মনে হওয়ার যথেষ্ট কারণ তাই অস্বীকার করা যায় না। ভাগবতে কৃষ্ণের ভাগবত-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যথেচ্ছভাবে অলৌকিক কথা কাহিনীর অনুপ্রবেশ ঘটেছে। হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণে কৃষ্ণের গোবর্ধন ধারণের গল্পটি প্রক্ষিপ্ত হলেও সেখানে গোবর্ধন বিদারণের বিবরণ আছে বিস্তারিতভাবে। আজকের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের আলোকে ঐ প্রাচীন পুরাণ দুটিতে বিবৃত গোবর্ধন বিদীর্ণ করার ঘটনা পাঠ করলে স্পষ্টতই একটি পর্বত বিস্ফোরণের ঘটনা চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যা প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত বাস্তব সম্মত।

হরিবংশ-এর বর্ণনা এই রকম:

> ভূমেরুৎপাট্যমানস্য তস্য শৈলস্য সানুষু।
> শিলা প্রথিশিলাশ্চেলুর্বিনিপেতুশ্চ পাদপা॥
>
> [হরি / বিষ্ণুপর্ব / ১৮/৩২]

অর্থাৎ, "যে সময় এই পর্বত (গোবর্ধন) পৃথিবী হইতে উৎপাটিত হইতেছিল, সেই সময় তাহার উপরে যে সব শিলা ইতস্ততঃ পতিত ছিল, সেই সব শিলা চারিদিকে পতিত হইল।"

বলা হয়েছে, "সেই পর্বত আন্দোলিত হইল এবং প্রস্তররাশি বিদীর্ণ হইয়া পতিত হইতে লাগিল।" [ঐ/১৮-৩৪]

"পর্বতের তখন কিছু কিছু শিখর যেন শিথিল হইয়া গিয়াছিল, কিছু

শিখরের অর্ধাংশ খণ্ডিত হইয়াছিল এবং কিছু শিখর মেঘের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছিল।" [ঐ] মেঘের মধ্যে বলতে বিস্ফোরণের ফলে সৃষ্ট ধূম্রজালের আড়ালে পাহাড়ের কিছু অংশ ঢাকা পড়ার কথা বলা হচ্ছে। পাহাড় ফাটানোর আরও বর্ণনা, যেমন :

বিষমৈশ্চ সমীভূতৈঃ মমৈশ্চাত্যন্ত দুর্গমৈঃ।
ব্যাবৃত্তদেহঃ স গিরিরন্য এবোপলক্ষ্যতে ॥ [ঐ/৪৪]

যাঁরা পাহাড় ব্লাস্টিং করার পর জায়গাটি লক্ষ্য করেছেন তাঁরাই জানেন, ব্লাস্টিংএর পর বিদীর্ণ শিলাময় পর্বতের চেহারা কেমন হয়। পুরাণকার সে চেহারা প্রত্যক্ষ করে জানাচ্ছেন : "সেই পর্বতের বিষমভূমি সম হইয়া এবং সমভূমি বিষম হইয়া অত্যন্ত দুর্গম হইয়া উঠিল। ইহাতে তাহার প্রকৃত রূপের এতাদৃশ বৈপরীত্য (উলটপালট) হইল যে, সেই পর্বত যেন অন্য এক পর্বতের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল।

"এই সময় তাহার গুহারূপী মুখ মেঘরূপ আস্তরণে যেন আচ্ছাদিত ছিল।" [অনু/আর্যশাস্ত্র সং]।

গুহা বানানোর এই অতি বাস্তব চিত্রটি সযত্নে আঁকার পরেও পুরাণকার গোবর্ধন ধারণের গল্প নিশ্চয় নিজে ফাঁদেন নি। পরবর্তী বুদ্ধিমানে নির্বোধ পাঠকের জন্য গোবর্ধন ধারনে রূপকথাটি গুঁজে দিয়েছেন।

বিজ্ঞানী দেবতারা বিস্ফোরকের সাহায্যে পাহাড় ফাটিয়ে পার্বত্য পথ, গুম্ফা, জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা ইত্যাদি করতেন, বৈদিক সাহিত্যে একাধিক ক্ষেত্রে তার উল্লেখ পাওয়া যায়। হিমালয়ে গমনাগমনের পথ বিস্মৃত অতীতকাল থেকেই ছিল। পার্বত্য পথ সুগম করতেন অশ্বিনীকুমাররা। নদী নির্ঝরিণীর গতিপথও দেবতারা কৃত্রিম উপায়ে পরিবর্তিত করে দিতেন। কথিত আছে, মহাদেব যখন কৈলাসবাসী তখন তাঁর আবাসস্থলের ওপর ভেঙে পড়ে গলিত তুষার স্রোত, এই স্রোতস্বিনীর প্রবাহমুখ ছিল কৈলাসের উত্তরে এক হিরণ্যশৃঙ্গশালী (বরফের ওপর সূর্যালোক পতনে স্বর্ণকান্তি) সর্বৌষধিগিরি। সেখানে থেকে স্রোতধারার উৎপত্তি। মহাদেব ঐ পতিতধারাকে নিরুদ্ধ করেন, যার ফলে সৃষ্টি হয় একটি ছোট হ্রদের, নাম রাখা হয়, বিন্দুসর। গঙ্গাবতারণের উদ্দেশ্যে রাজা ভগীরথ এই বিন্দুসরের উভয় তীরে বসবাস করেন ও বেশ কয়েক বছরের সাধনায় গঙ্গার জলধারা মুক্ত করে আর্যাবর্তে নিয়ে আসেন। [মৎস্য পুরাণ/২১ অ] এসব ইঞ্জিনীয়ারিং তখন বহুল প্রচলিত। কতিপয়

বিজ্ঞানীর আয়ত্তাধীন ছিল এ জ্ঞান। জ্ঞানকে এঁরা গোপনীয় মন্ত্রগুপ্তির সিন্দুকে তালা বন্ধ করে রাখতেন এবং নিজেদের বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকাণ্ডকে বলতেন অলৌকিক ঐশ্বরিক দৈববিধি।

হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণে গুহা শব্দের স্পষ্ট উল্লেখ বর্তমান। স্বয়ং কৃষ্ণই বলছেন, "আমি দিব্য বিধির (দেবতাদের প্রযুক্তিবিদ্যার দ্বারা) এই পর্বতের গৃহ নির্মাণ করিয়াছি।··· ইহার মধ্যে বর্ষার জল ও বায়ু প্রবেশ করিতে পারিবে না। এই গুহা গো-সকলের উত্তম আশ্রয়।"

এতদ্দৈবৈরসম্ভাব্যং দিব্যেন বিধিনা ময়া।

কৃতং গিরিগৃহং গোপা নির্বাতং শরণং গবাম॥ [ঐ/১৮·৫৪]

গুহার কথাই বলা হয়েছে বারম্বার, কোথাও ছাতার মতো মাথার ওপর গোবর্ধন ধারণের গপ্পো নেই। অথচ ঐ গপ্পোটাই পরবর্তীকালে ভাগবত মাহাত্ম্যে আমাদের মজ্জাগত হয়ে গেল। পণ্ডিতরা কেউ গোবর্ধন রহস্য ভেদ করলেন না, প্রচার করলেন গোবর্ধনধারী রূপে ইতিহাস-পুরুষ বাসুদেবকে এবং সৃষ্টি করলেন মানবমনে ভিত্তিহীন কুসংস্কার।

সোজা বাস্তবসম্মত বর্ণনার পর হরিবংশ কিন্তু স্পষ্টতই বলেছেন: "এই পর্বত কৃষ্ণের বাম হস্তের তলের উপর স্থাপিত ছিল। ভূতল হইতে তাহার মূলভাগের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল।"—[ঐ/১৮-৩৮]। এ বর্ণনায় কিছুমাত্র অলৌকিকতা নেই। গুহামুখ মূলভাগ থেকে বিচ্ছিন্নই থাকে এবং সেই গুহামুখে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণ যদি তার ঢালু ছাদের নিচে বাঁ হাতটি রেখে কৃতিত্ব প্রদর্শন করে থাকেন তবে গো-তুল্য গোপেরা তাঁকে অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন ভেবে পূজা তো করবেন-ই; বিশেষত তাঁর ভাবমূর্তি গড়ার জন্য বুদ্ধিমান দেবতারা যখন কৃষ্ণনামে জয়ধ্বনি দিয়ে চতুর্দিক মুখরিত করেছেন এমন একটি সময়, মানুষ যখন প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে দিশেহারা, স্বাভাবিক বিচার বোধ যখন তার মগজে ঠিক ঠিক কাজ করছে না।

এটি পার্বত্য গুহা এবং তা পার্বত্য ছাতা নয়, স্পষ্ট স্বীকৃতি আছে তারও। কৃষ্ণ বলেছেন, ঐ পার্বত্য আচ্ছাদনের নিচে 'জল ও বায়ু প্রবেশ করিতে পারিবে না'। বস্তুত গুহার অভ্যন্তরে জল ও বায়ুর প্রবেশ সহজ নয়, কিন্তু তা যদি ছাতা হ'ত, তবে ছাতার নিচের মাটিতে জলও গড়াতো এবং ছত্রধারীর গায়ে সমীরণ-স্পর্শ অবরুদ্ধ হত না। পুরাণকার অস্পষ্টতা রাখেন নি কোথাও। ব্যাপারটি মেঘলা করেছেন বাসুদেব স্তাবকরা আর তাই সেই স্পষ্ট জিনিসকে

সুস্পষ্ট করতে আমাদের যুক্তির কসরৎ করতে হচ্ছে পাতার পর পাতা। কুসংস্কারের শেকড় উৎপাটনের কাজটি এমনিই পরিশ্রমসাধ্য। এই কাদাজল দুপাশে যতই সরিয়ে দেওয়া হোক আবার তা চুইয়ে চুইয়ে সাফা জায়গা কর্দমাক্ত করে তুলবেই, আর কায়েমী স্বার্থের সুবিধেই সেখানে। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে দৈবী ইমেজ সৃষ্টির প্রয়োজন আছে। সমাজের বুদ্ধিমান মোড়লরা তাই এমনভাবে ভারতকথার গ্রন্থিমোচন করেন যা কাদাজল জমা করতেই সচেষ্ট। জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে সুবিধাভোগী শ্রেণীর যথেচ্ছাচারকে দৈবী আশীর্বাদ ধন্য বলে প্রচার করাই তাঁদের চতুর উদ্দেশ্য। তাই দেখা যায়, পুরাতত্ত্বের গোলমেলে ব্যাখ্যাকারই সরকারী পুরস্কার খেতাব অর্জন করেন, আর নিষ্ঠার সঙ্গে সত্যসন্ধানে যাঁরা নিযুক্ত থাকেন তাঁদের ভাগ্যে জোটে লাঞ্ছনা, মৃত্যু ও কারা যন্ত্রণা। এটাই ইতিহাস এবং সে ট্র্যাডিশনই চলছে। তাই চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে একজন ভগবানকে খুঁজে বার করতে না পারলে তার্কিকের পড়াশুনা করার অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়। কবি শেলীকে এমনি চোখ-রাঙানীর শিকার হতে হয়েছিল কায়েমী স্বার্থের পৃষ্ঠপোষক বিশ্ববিদ্যালয়ে। [কুরুক্ষেত্রে দেবশিবির দ্রঃ]।

বৈষ্ণব কবি নরহরি চক্রবর্তী তাঁর 'ব্রজ পরিক্রমা' গ্রন্থে গোবর্ধন মাহাত্ম্য লিখেছেন পরম ভক্তি সহকারে। সেখানেও গোবর্ধন গুহার উল্লেখ আছে। কবির মনে হয়েছে, সেটি দিব্য গুহা। ভক্তি ও বিশ্বাসে কী না হয়, অশ্রুজলে বাস্তব ধেবড়ে গিয়ে অদ্ভুত রহস্যপুরীর সৃষ্টি হতে পারে মসীলিপ্ত পুঁথির পাতায়। মুস্কিল এই, স্বয়ং শ্রীচৈতন্যও গোবর্ধন পর্বতে একটি পার্বত্য গুহা দর্শনে ভক্তির আবেশে আপ্লুত হয়েছিলেন, অতএব সে গুহাকে দিব্যগুহা না মেনে উপায় নেই।

গোবর্ধন গুহায় নন্দ যশোদাসহ কৃষ্ণের মূর্তি স্থাপিত করেছিলেন ভক্তজন। কবি নরহরি চক্রবর্তীর ভক্তি গীতিতে তাই তা বর্ণিত হয়েছে এইভাবে:

পর্বত উপরে দেখ পুত্রের সহিতে।
শ্রীনন্দ যশোদা শোভা অপূর্ব গোফাতে॥ [গুহাতে]
অহে শ্রীনিবাস এথা শ্রীচৈতন্য রায়।
করিতে দর্শন গিয়া প্রবেশে গোফায়॥

বলা বাহুল্য, কৃষ্ণের ছাতাটি গুহারূপেই তার শৈলাকার অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল, তবু ভাগবত বললেন, সেটি ছাতা এবং কৃষ্ণ তা ছত্রাকারে ধারণ

করেছিলেন। যে শ্রীরাধার অস্তিত্ব প্রাচীন পুরাণে নেই, সেই রাধাকেও শ্রীকৃষ্ণসহ ঐ গোকায় লীলা করতে দেখলেন ভক্তজনে, এবং তাঁরা পর্বত ভজনা শুরু করলেন এইভাবে :

শ্রীরাধাসহিতো গুহায়ু রমতে তান্ শৈলবর্ষান্ ভজে ॥

গল্প এভাবেই গড়ায় এবং বুদ্ধিমানে গল্পকেই গোপজনের জীবনের সঙ্গে মিশিয়ে দেন এমনভাবে যার আঠালো রসে আস্বাদনকারী গোপকুল মুগ্ধ ও বদ্ধ হয়ে পড়েন। যাক, যথা মতি তথা যাক গো-কুল গোকুলে। আমরা যেমন বুঝি তেমনি বলি :

পুরাপুঁথি পাঠে আমরা বুঝেছি, পুরাকালে বিজ্ঞানী দেবতারা যে বিস্ফোরকের ব্যবহার বহুল পরিমাণেই করেছেন তার প্রমাণও তাঁরা রেখে গেছেন বিভিন্ন পুরাণে। আমার পূর্ববর্তী গ্রন্থদ্বয়ে বাইবেলীয় ঈশ্বর সদাপ্রভু এবং তাঁর দেবদূতগণ ব্যবহৃত বিস্ফোরক, হাতবোমা ও কাঁদুনেবোমার নজীর উদ্ধার করে দেখিয়েছি। এখানে অথর্ববেদে উল্লিখিত 'ধূমাক্ষী' অস্ত্রের উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। গোলাকার এই বোমাটি শত্রুব্যূহের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়ে ফেটে যেত ও ধোঁয়ার সৃষ্টি করত। গোবর্ধন বিদীর্ণ করার জন্য এই জাতের বিস্ফোরক ব্যবহার করা হয়ে থাকতে পারে এবং আজকের ডিনামাইট সেদিন দেবভাষায় অন্য নামে অভিহিত হয়ে থাকলে তা নিয়ে তর্ক বৃথা। বাইবেলোক্ত সদোম ঘোমোরাহ ধ্বংসের কাজে দেবতারা এক সীমিত ভূখণ্ডে আণবিক অস্ত্রের ব্যবহার করেছিলেন বলে আধুনিক বিজ্ঞানীর ধারণা।

বাইবেলে লক্ষ্য করেছি। দেব-দূতেরা কাঁদুনে গ্যাস বা টিয়ার গ্যাস সেল ছুঁড়ে দেন দেববিরোধী জনতার হামলা প্রতিরোধ করতে। কুরুক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে শক্তিশালী বিস্ফোরক ও আগ্নেয়াস্ত্র, রোবট ও সাইরেনের মত বৈজ্ঞানিক উপায়ও অবলম্বিত হয়েছিল বলে পুঁথি প্রমাণ উদ্ধার করা আজ অসম্ভব নয়। দ্রোণপর্বে উল্লিখিত কয়েকটি অস্ত্র সম্পর্কে কিছু বৈজ্ঞানিকের অভিমত, সেগুলি বিভিন্ন জাতের আণবিক অস্ত্রই ছিল। [কুরুক্ষেত্রে দেবশিবির দ্রঃ]। গোবর্ধন গর্ভে গুহা নির্মাণের বর্ণনা এমনই যে তাকে কষ্ট করে প্রমাণ করারও দরকার হয় না। এসব দেবকীর্তি বোমার জন্য শুধু একটু কুসংস্কার মুক্ত মন ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির প্রয়োজন।

প—৮

পৃ ৮৯—(১) হরিবংশ/বিষ্ণুপর্বে ১৮-৫৪।

পৃ ৯৩—(২) বিষ্ণুপুরাণ/পঞ্চমাংশ—১৩/৮।

পৃ ৯৩—(৩) ব্রহ্মার পরিকল্পনা [কুরুক্ষেত্রে দেবশিবির দ্রঃ] রূপায়ণে বিষ্ণু ও কৃষ্ণের ছিল বিশেষ ভূমিকা। বস্তুতপক্ষে ঐ পরিকল্পনা অনুসারেই দেববিরোধী পার্থিব শক্তিকে ধ্বংস করা হয়েছিল কুরুক্ষেত্রে ও প্রভাসক্ষেত্রে। যদুবংশ ধ্বংসের আয়োজন ও পরিকল্পনার শুরু কৃষ্ণজন্মের আগেই হয়েছে দেব-সভায়। ব্রহ্মা বিষ্ণুকে বলেছিলেন,— আপনার অংশে দেবকীর গর্ভে দুই পুত্রের উৎপত্তি হবে (কৃষ্ণ ও বলরাম)। এই সময় ব্রহ্মা আরও বলেন যে, বিষ্ণুপুত্র কৃষ্ণকে সাহায্য করার জন্য গোব্রজে দেবতাদের ছদ্মবেশে পাঠানো হবে :

ত্বদ্‌ভক্তাঃ পুণ্ডরীকাক্ষ তব চিত্তবশানুগাঃ।
গোষু গোপা ভবিষ্যন্তি সহায়াঃ সততং তব ॥ [হরিবংশে/৫৫/৪৫]

পৃ ৯৩—(৪) নাহং দেবো ন গন্ধর্বো ন যক্ষো ন চ দানবঃ।
অহং বো বান্ধবো জাতো নাস্তি চিন্তামতোঽন্যথা ॥ [ঐ/১৩-১২]

কৃষ্ণ দেব-ঔরসজাত। কিন্তু তাঁর পরিচয় গোপন করেছেন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে। রাজনৈতিক কারণেই তিনি বলেছেন, গোপেরা যেন তাঁকে বন্ধুরূপেই গণনা করেন, তিনি দেবতা গন্ধর্ব অথবা যক্ষ নন। দেবতা ও মানুষকে কেবলমাত্র চোখে দেখে চেনা মোটেই সহজ ছিল না। এখানে এ সত্যই প্রমাণিত হল। মহাভারতে এই সন্দেহের প্রকাশ ঘটেছে অনেকের কথায় একাধিক ক্ষেত্রে। তাই যার কার্যকলাপে মানুষ বিস্মিত হত, তাকে তারা দেবতা ভেবে সমীহ করত।

প—৯

পৃ ৯৮—(১) শ্রীমদ্ভাগবত/১০ম স্কন্ধ/২৭ অ.হরফ সং।

পৃ ৯৮—(২) বিষ্ণুপুরাণে ঋষি পরাশর জানাচ্ছেন, সকল যুদ্ধ ও শক্তির পর ইন্দ্র স্বয়ং গো-ব্রজে এসে কৃষ্ণকে 'উপেন্দ্র' ও 'গোবিন্দ' খেতাবে ভূষিত করে যান। কৃষ্ণের প্রতিষ্ঠার জন্য ব্রহ্মার পরিকল্পনায় ব্রজবাসীর মাথায় ক্ষয়ক্ষতির বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয় এই ভাবে।

কৃষ্ণকে ইন্দ্র বলেন :

স ত্বাং কৃষ্ণাভিষেক্ষ্যামি গবাং বাক্য প্রচোদিতঃ।

উপেন্দ্রত্বে গবামিন্দ্রো গোবিন্দস্ত্বং ভবিষ্যসি ।। [বি/৫.১২.১২]

অভিষেকের পর ইন্দ্র বলেন, "পৃথিবীর ভার হরণের জন্য আমার অংশ [আমার ঔরসে জাত/দানিকেনতত্ত্ব ও মহাভারতের স্বর্গদেবতা দ্রঃ] পৃথার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহার নাম অর্জুন ; তাহাকে আপনি সর্বদা রক্ষা করিবেন। .. আপনার ভূভারহরণরূপ [অসুরনিধন] কার্যে অর্জুন সাহায্য করিবে ।" [ঐ/আর্ষশাস্ত্র/১৬-১৮ শ্লো]।

হরিবংশের বিষ্ণুপর্বে ১৯ অধ্যায়ে কৃষ্ণকে ইন্দ্রের প্রভুরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। ভাগবতে বাসুদেব কৃষ্ণকে পরমেশ্বর-স্বরূপের সঙ্গে একাত্ম করে দেখানোর চেষ্টা আছে। এভাবেই ইতিহাসের কৃষ্ণ লাভ করেছেন পরমেশ্বর প্রতিষ্ঠা। হরিবংশে অবশ্য ইতিবৃত্তকে পুরোপুরি গায়েব করার চাতুরী নেই। সেখানে ইতিহাসই মুখ্য বর্ণনীয়, কৃষ্ণাবতার প্রতিষ্ঠা পরবর্তী প্রক্ষেপের ফল।

ইন্দ্র আপন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে বিষ্ণুর অংশজ কৃষ্ণের প্রতিষ্ঠাকে ভাগাভাগি করে নেন। বলে যান,—"আমার আরাধনার জন্য বর্ষার যে চারিমাস বিহিত আছে, তাহার পরস্থিত অর্ধভাগ শরৎকাল (দুমাস) আমি তোমাকে প্রদান করিলাম।" [হরিবংশ/বিষ্ণুপর্ব/১৯ অ দ্রঃ]।

পৃ ৯৯—(৩) বিষ্ণুর ঔরসে গর্ভবতী হওয়ার জন্যই সম্ভবত দেবকী 'দেবগর্ভা' নামে খ্যাত হয়েছেন। সেই সুবাদেই কৃষ্ণ দেবপুত্র হয়েও মর্ত্যনারীর গর্ভজাত, ঠিক যেমন পাণ্ডবরা দেবতার ঔরসে পৃথ্বী নারীর গর্ভে জন্মলাভ করেন।

পৃ ১০০—(৪) হরিবংশ/১৯.৭।

পৃ ১০০—(৫) ঐ/৯২-১০১।

পৃ ১০১—(৬) লেখকের পূর্ববর্তী গ্রন্থদ্বয়ে পৌরাণিক রহস্যময় রশ্মিরথগুলির আলোচনা দ্রঃ।

প—১১

পৃ ১২০—(১) সে যুগে জুজুৎসু ছিল সুপরিচিত যুদ্ধ কৌশল। কেবলমাত্র শারীর শিক্ষার দ্বারা অমিত বলবীর্যের অধিকারী হতেন প্রাচীনগণ। প্রসঙ্গত চৈনিক তাওইজম ও কুং ফু পদ্ধতির কথা স্মর্তব্য। যাকে বলে ক্যারাটে পদ্ধতির যুদ্ধ, সম্ভবত বাসুদেব কৃষ্ণের দল ছিলেন তাতে বিশেষ পারদর্শী। কংস

হত্যার সময় প্রদর্শনী অঙ্গন থেকে লাফ দিয়ে কংসের মঞ্চে উপস্থিত হন কৃষ্ণ এবং কেবলমাত্র দুটি হাত দিয়েই কংসের মতো এক বীরকে তিনি হত্যা করেন। কেশী বধের সময় কৃষ্ণ সম্ভবত লৌহহস্ত ব্যবহার করেছেন। সে প্রসঙ্গ যথাসময়ে আলোচনা করব।

পৃ ১২১—(২) হরিবংশে গো-ব্রজের সুন্দর কাব্যময় বর্ণনা আছে। বসুদেবের কাছ থেকে গোপন নির্দেশ নিয়ে নন্দ বৃন্দাবনে এসে দেখলেন: স্থানটি হিংস্র পশু সমাকীর্ণ। যমুনাতটে বৃন্দাবন তখন একটি দুর্ভেদ্য বনাঞ্চল। সেখানে বিস্তীর্ণ চারণক্ষেত্র এবং জলাশয়ে নামার জন্য সুসম ঘাট ছিল। "গৃধ্র ও মাংসভক্ষী বন বিড়ালাদির পশ্চাতে বাজপাখী এবং বসা ও……শৃগাল, ব্যাঘ্র সিংহাদির দ্বারা সে-স্থান পূর্ণ ছিল।"

বৃন্দাবনে গিয়ে নন্দগোপ ঘোষপল্লীর সুরক্ষার ব্যবস্থা করলেন। কেমন ব্যবস্থা? বলা হয়েছে: "সে স্থানে চারিদিক কণ্টকের বেড়ায় পূর্ণ ছিল। সীমান্তভাগ বহু বড় বড় বৃক্ষে আবৃত ছিল।" আর "ভূতলে করীষের (ঘুঁটের) রাশি পতিত ছিল। কুটীর ও মঠসমূহ কটের (মাদুর/চাটাইয়ের) দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল।" এবং "এই ব্রজে কাক-পক্ষ (জুলপী) ধারী বালকগণ খেলা করিতেছিল।" বাথানগুলিরও সুব্যবস্থা করা হয়। তাই বলা হয়েছে, "গোবাট (গোবাস) সমূহের দরজায় কাষ্ঠের অর্গল যোজিত ছিল। মধ্যে গোগণের বাসের ও বিশ্রাম করিবার জন্য পর্যাপ্ত স্থান ছিল। এরূপ বহু গোশালায় ব্রজভূমি পরিপূর্ণ ছিল।" এবং "বহু গোপকন্যা মস্তকে কুম্ভ লইয়া যাতায়াত করিতেছিল। তাহাদের স্তনের অগ্রভাগ বস্ত্রের দ্বারা বাঁধা ছিল এবং তাহার উপর বস্ত্রাঞ্চল পতিত ছিল। যমুনার তীরগামী পথ ধরিয়া জল আনয়নকারিণী এই গোপকন্যাদিগের দ্বারা ব্রজ আবৃত ছিল।" [বিষ্ণুপর্ব ৬ অ/১৪-২৭/অনু—আর্যশাস্ত্র]।

পৃ ১২২—(৩) জয়দেব বিরচিত। জয়দেব আলোচ্য কালের বহু পরবর্তী। তত্রাচ কেবলমাত্র গীতিমাধুর্যের জন্য তাঁর পদটি এখানে ব্যবহার করলাম। এই সূত্র উল্লেখের কারণ, কাল-ব্যবধান সম্পর্কে পাঠককে সতর্ক রাখা। পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক উপন্যাসে কাল-ব্যবধানের প্রশ্নটি সম্পর্কে সযত্ন সতর্কতা বজায় না রাখলে পাঠক বিভ্রান্ত হন। কালিক ব্যবধান ঘুচিয়ে দেওয়ার লৈখিক স্বাধীনতা এজাতীয় রচনায় গ্রহণ করা অনুচিত বলেই আমার বিশ্বাস। তাই যখন কোনো কৃষ্ণকাহিনীতে পড়ি, কৃষ্ণ বা বেদব্যাস বনে বসে বিষণ্ণ মনে পুরাণ-

কারদের কথা ভাবতে লাগলেন এবং কোনো লেখক যখন কৃষ্ণ ও দ্বৈপায়নের ভাবনায় পরবর্তী পুরাণকারদের ভাবনা অথবা নিতান্ত অর্বাচীন গবেষকদের বক্তব্য যোজনা করে খুশিমত মহাভারত ব্যাখ্যার আসর সাজিয়ে বসেন তখন শুধু বিরক্তি নয় পাঠকমন প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। যা কৃষ্ণ বা দ্বৈপায়নের যুগে ছিল অচিন্তনীয়, কোনো স্বপ্রতিষ্ঠিত আধুনিক 'বেদব্যাস' (!) তাই তাঁদের চিন্তায় চাপিয়ে দিলে ব্যাপারটা সহ্য করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এজন্য এক্ষেত্রে টীকা সহযোগে এবম্বিধ ব্যবহারের ব্যাখ্যা পাঠকের সামনে তুলে ধরা উচিত। এখানে কল্পনা করে নিচ্ছি, জয়দেবের অনুরূপ ভাবনায় সমৃদ্ধ কোনো পদ হয়ত সেকালের কবিতেও রচনা করেছেন। এই পদ ব্যবহারের দ্বারা গৌরীর মানসিকতাকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে মাত্র।

পৃ ১২৫—(৪) কার্তিক পূর্ণিমাই রাস পূর্ণিমা। এটি একটি বাৎসরিক উৎসব। এক সময় কার্তিক পূর্ণিমায় বর্ষারম্ভ হত। রাসোৎসবের সময় ছিল রাত দুটো। রাসোৎসবের সময় সূর্য বিশাখা নক্ষত্রের সঙ্গে মিলিত হন। বিশাখার অন্য নাম ছিল রাধা। যজুর্বেদ ও অথর্ববেদেও বিশাখার রাধা নাম পাওয়া যায়। দুটি তারা নিয়ে বিশাখা। এই তারার মিলনোৎসবই রাসোৎসব। স্ত্রী ও পুরুষ একত্র হয়ে মণ্ডলাকারে নাচে। এখনও উত্তর ভারতে এবং সাঁওতালদের মধ্যে স্ত্রী পুরুষের মণ্ডলাকার নৃত্য প্রচলিত আছে। [যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি/ পূজা পার্বণ/বিশ্বভারতী প্রকাশন দ্রঃ]।

রাস সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। তাঁর লেখায় জানতে পারি : "রাস একটি ক্রীড়া বিশেষ। অদ্যাপি ভারতবর্ষের কোনো কোনো স্থানে ঐরূপ ক্রীড়া বা নৃত্য প্রচলিত আছে। রাসের অর্থ কি তা শ্রীধর স্বামী বুঝাইয়াছেন…"

"রাস শব্দ হরিবংশে ব্যবহৃত হয় নি। তৎপরিবর্তে হল্লীষ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। · হেমচন্দ্রাভিধানে 'হল্লীষ' অর্থ এইরূপ…

"মণ্ডলেন তু যন্নৃত্যং স্ত্রীণাং হল্লীষকন্তু তৎ।"

বাচস্পতি তারানাথ লিখিয়াছেন—

'স্ত্রীণাং মণ্ডলিকাকারনৃত্যে।' অতএব 'হল্লীষ' ও রাস একই কথা, নৃত্য বিশেষ।" [কৃষ্ণচরিত্র]।

বাসুদেব কৃষ্ণ এভাবেই ঘোষপল্লীতে রাসোৎসবে যোগ দেন। পরবর্তীকালে এই রাসোৎসব জীবাত্মা পরমাত্মার শুদ্ধ স্বরূপ রাধাকৃষ্ণের রাসলীলার রূপকে পরিণতি লাভ করেছে।

পৃ ১২৮—(৫) মাধুর্যের খাতিরে এখানে মীরাবাই-এর গানটি ব্যবহার করেছি। মীরাবাই পরমেশ্বর কৃষ্ণের আরাধনা করতেন এবং তিনি এক কৃষ্ণজ্যোতির দর্শন লাভ করেন। মীরা ছিলেন রাজপুত এবং রাঠোর বংশীয় এক-রাজপুত্রী। মেওয়ার ছিল শক্তির পূজারী, কিন্তু মেওয়ারের রাজপত্নী মীরা বৈষ্ণবী। এই নিয়ে সংঘর্ষ। শেষে রাজগৃহ ত্যাগ করে স্বামীপ্রদত্ত অর্থে ধর্মশালা স্থাপন করে মীরা তাঁর আরাধনা চালিয়ে যান। দ্বারকায় তাঁর জীবনাবসান ঘটে। মীরার জীবনেও বাসুদেব কৃষ্ণ পরমেশ্বর কৃষ্ণের জায়গা দখল করেছিলেন। ইতিহাস-পুরুষকে পরমাত্মাজ্ঞানে পূজা প্রণাম জানানোর বিমুগ্ধ রীতি ইতিহাসের ধারায়ই প্রবাহিত হয়ে এসেছে এবং বিভ্রান্তিরও কারণ ঘটিয়েছে।

প—১২

পৃ ১৩১—(১) রাজসভায় খেদোক্তি করে কংস বলেছিলেন : "অনমাত্যস্য শূন্যস্য চারান্ধস্য মমৈব তু।'—আমার সুযোগ্য মন্ত্রী নেই, আমি রিক্ত। আমার গুপ্তচররূপ নয়ন নেই, আমি অন্ধ। [হরিবংশ / ২২অ / ২২] তাঁর এই উক্তি প্রমাণ করে, কংসকে ঘিরে নেপথ্য চক্রান্ত তখন কিভাবে তার পরিধি বিস্তার করেছিল।

পৃ ১৩৩—(২) যাদবদের পিতৃপুরুষেরা ছিলেন নাগ দেবতার উপাসক। ডঃ বি. সি.ল ডঃ রায়চৌধুরীর বক্তব্য সমর্থন করে লিখেছেন, "The Mathura-Naga Statuette Inscription amply proves the prevalence of serpent-worship in Mathura which is imortant in view of the story of Kaliyanaga and his suppression by Krisna." [*Hist. Geog. of Ancient Ind.*]।

পৃ ১৪০—(৩) ইন্দ্র ব্যক্তিবিশেষ নন, 'ইন্দ্র' পদাধিকারের খেতাব, যেমন ধর্ম বা ধর্মরাজ। [দানিকেনতত্ত্ব. ও মহাভারতের স্বর্গদেবতা দ্রঃ]।

পৃ ১৪১—(৪) 'In Vedic Brahmana and Sutra periods Magadha was considered to have been out side the pale of Aryan and Brahmanical culture and was, therefore, looked down pon by Brahmanical writers.'

—*Dr. B. C. Law.*

প—১৩

পৃ ১৪৩—(১) শোন ও গঙ্গার সঙ্গমে গিরিব্রজ ছিল মগধের রাজধানী

[বর্তমান গয়া পাটনা জেলা]। গিরিব্রজ বা রাজগৃহ পাঁচটি পর্বত দ্বারা বেষ্টিত ও প্রাচীর দ্বারা সংরক্ষিত ছিল। ছিল দুর্ভেদ্য দুর্গ এবং ৩২টি নগর দ্বার। এ ছাড়াও ছিল ৬৪টি খিড়কি পথ। একটি বিশেষ দ্বার সন্ধ্যার প্রাক্কালেই বন্ধ করে দেওয়া হত। স্বয়ং রাজারও তখন সে দ্বার দিয়ে প্রবেশাধিকাব ছিল না। বণিক, বিদ্বান ও বিত্তবানে নগরী ছিল জমজমাট। উপাস্য দেবতা, নাগ ও যক্ষ। রাজা ও প্রজারা ছিলেন ধর্মানুগত এবং তাঁদের স্বধর্মীয় পুরোহিত সম্প্রদায় ছিল।

পৃ ১৪৫ (২) জরাসন্ধ গিরিব্রজ থেকে নিরানব্বই যোজন দূরে অবস্থিত মথুরার উদ্দেশ্যে যে দূরক্ষেপণাস্ত্র প্রয়োগ করেন, দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধে জার্মানী সে ধরনেরই নিয়ন্ত্রিত দূরক্ষেপণাস্ত্র বা গাইডেড মিজাইল ব্যবহার করেছিল।

প—১৪

পৃ ১৫২—(১) দেবকীপুত্রই যে কংসকে নিহত করবেন, বিষ্ণুপুরাণ ও হরিবংশে এ সম্পর্কে দুরকম তথ্য পাওয়া যায়। বিষ্ণুপুরাণ বলেন, ভগ্নী দেবকীর প্রতি স্নেহপরায়ণ কংস যখন নবপরিণীতা দেবকীকে রথে করে নিয়ে যাচ্ছেন, তখন দৈবীবাণী শোনা যায়: মূঢ়! যাঁকে তুমি পতিসহ রথে তুলে নিয়ে যাচ্ছ তাঁর অষ্টম গর্ভের সন্তান তোমার প্রাণ হরণ করবে।

যামেতাং বহসে মূঢ় সহ ভর্ত্রা রথে স্থিতাম্।
অস্যাস্তে চাষ্টমো গর্ভঃ প্রাণানপহরিষ্যতি ॥

হরিবংশের তথ্য: দেবর্ষি নারদ হিমালয় থেকে অবতরণ করে গোপনে কংসকে জানান,—দেবতাদের গুপ্ত মন্ত্রণাসভায় কংসবধের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান কংসবধের কারণ হবে। দৈববাণী অপেক্ষা দেবর্ষির আগমন অনেক বেশি বাস্তবসম্মত। কিন্তু ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই তথ্যকেও গ্রহণযোগ্য বলে মেনে নেওয়া যায় না। নারদ কংসশত্রু দেবর্ষি। তিনি দেবতাদের চক্রান্ত কংসের কাছে ফাঁস করবেন কোন যুক্তিতে? কংসকে কায়দা করতে বিষ্ণুর কম সময় লাগে নি। কংস ছিলেন পরাক্রান্ত পুরুষ। তাঁর কাছে পরাজিত হয়েছেন দেবরাজ ইন্দ্র এবং দেব-সেনাধ্যক্ষ শঙ্কর। সুতরাং নারদের পক্ষে এ হেন কংসকে সাবধান করে যাওয়ার গল্পটি, অবিশ্বাস্য। এসব কারণে দেবতাদের মন্ত্রণা সভায় নারদের বদলে গর্গকে নিয়ে গেছি। দেব-ষড়যন্ত্রের খবর কংস নিশ্চয় কোনো বিশ্বস্ত অনুচরের মাধ্যমে পেয়েছিলেন। আমি তাই তেমন ইঙ্গিতই রেখেছি।

প—১৬

পৃ ১৭৮—(১) কেশীকে অশ্বরূপী দানব বলা হয়েছে। আর্য বুদ্ধিজীবীরা

অনার্য অথবা দেববিরোধী বীরপুরুষদের মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি দিতে কুণ্ঠিত ছিলেন। অনার্যদের বর্ণনা করা হয়েছে তাদের নিজস্ব টোটেম অনুসারে। নাগ দেবতার উপাসকদের সরাসরি নাগ বা সর্প, বরাহ টোটেমধারী অথবা লাঙ্গুল টোটেমধারীকে সরাসরি বরাহ, বানর (অর্ধনর) প্রভৃতি অবজ্ঞাসূচক অভিধার দ্বারা বর্ণনা করেছেন তাঁরা। ফলত অনার্য জাতির মানুষেরা পরবর্তী চিত্রকর, গল্পকার কথক ও নাট্যকারদের দ্বারা সেভাবেই যুগে যুগে বর্ণিত হয়েছেন, মানুষ হিসেবে তাঁদের পরিচয় ভুলে গেছি আমরা। আমাদের কাছে কেউ কেশী, কেউ বরাহ, কেউ বৃষ অসুর হিসেবে রূপকথার চরিত্রে রূপান্তরিত হয়ে দেখা দিয়েছে। [এ প্রসঙ্গে তাত্ত্বিক আলোচনার জন্য লেখকের দানিকেনতত্ত্ব ও মহাভারতের স্বর্গদেবতা দ্র:]। হরিবংশে কেশীর মানুষি সত্তাকে বৈশম্পায়ন সুস্পষ্ট স্বীকৃতি জানিয়েছেন। নিহত কেশীর রূপ বর্ণনার সময় তাঁকে মেঘেঢাকা (মেঘ =কৃষ্ণ) ম্লান চন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করে বলা হয়েছে :

কেশী চ কৃষ্ণসংসক্তঃ শান্তগাত্র ব্যরচত।
প্রভাতাবনতশ্চন্দ্রঃ শ্রান্ত মেরুমিবাশ্রিতঃ॥

অর্থাৎ কৃষ্ণের দ্বারা কেশীর শরীর বেষ্টিত হলে তাঁকে মেরু পর্বতের অস্তাচল শিখরে প্রত্যূষকালীন চন্দ্রের মতো শ্রান্ত দেখাতে লাগল। কেশী অশ্বরূপী দানব হলে এই বর্ণনার প্রয়োজন হত না। অশ্বের সঙ্গে চন্দ্রের তুলনা অসম্ভব। পুরাণকার কিন্তু নির্ভুলভাবে তিন তিনবার একই তুলনা দিয়ে কেশীর চন্দ্রতুল্য রূপ বর্ণনা করেছেন। আমরা লোকনৃত্যে অদ্ভুত মুখোশ ও পোশাকধারী নর্তক আজও দেখতে পাই। তিব্বতী নৃত্যে ভয়াবহ ও ভয়ঙ্কর মুখোশের ব্যবহার আছে। আদিম জাতির সাজ সজ্জায় আজও তাদের টোটেম প্রীতির ছাপ ফুটে ওঠে। কেশীর হয়ত অশ্বমুখ শিরস্ত্রাণ ছিল।

পৃ ১৭৯—(২) কেশী-কৃষ্ণ যুদ্ধের পরেই অন্তরীক্ষ থেকে অবতরণ করে নারদ কৃষ্ণকে অভিনন্দিত করে 'কেশব' খেতাবে ভূষিত করেন। বলা হয়েছে, দেবতারা তাঁদের উড়ন্ত যানে চেপে এই যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করেন। অর্থাৎ খাণ্ডবদাহন ও অন্যান্য দেবাসুর যুদ্ধের সময় যেমন, কেশীবধের সময়ও তেমনি কৃষ্ণবাহিনীর সাহায্যার্থে দেবতারা রণক্ষেত্রের মাথায় প্রহরারত ছিলেন। কেশীবধে তুষ্ট দেবতারা নারদের মাধ্যমে সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন : কেশব নাম নাম্না ত্বং খ্যাতো লোকে ভবিষ্যসি" [বিষ্ণুপর্ব ২৪ অ / ৬৫]।

পৃ ১৮০—(৩) কেশীর সঙ্গে কৃষ্ণের একক যুদ্ধের কথাই উল্লিখিত হয়েছে। সুতরাং অনুমান অকারণ নয় যে, কেশীর সৈন্যদল বিভিন্ন উপায়ে খতম হয়ে যাওয়ার পরে গোপ ও দেববাহিনীসহ কৃষ্ণ কেশীবধ করেন। কেশীবধের পুরো ক্রেডিট পুরাণকার কৃষ্ণকেই দিয়েছেন। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যুদ্ধের বিস্তৃত বর্ণনা নেই। পুরাণমতে এ যুদ্ধকে এখানে সংক্ষেপে বর্ণনা করেও রূপকথার রহস্যভেদ করা সম্ভব হয়েছে, তাই পৌরাণিক তথ্যকে যথাযথই রেখেছি।

পৃ ১৮০—(৪) বোঝা যায় কেশীর মুখাবয়ব অশ্বমুণ্ডাকৃতি লৌহ শিরস্ত্রাণে ঢাকা ছিল। তাতে ছিল লৌহ দন্ত। বলা হয়েছে, কৃষ্ণ সেই দৈত্যের মুখে নিজ

বাহু দীর্ঘাকার করে প্রবেশ করিয়ে দিলে কেশী সেই বাহু চর্বণ করতে সমর্থন হয় নি। বরং তার সেই লৌহ দন্তগুলিই মূলসহ উৎপাটিত হল। এই আক্রমণে কেশীর ওষ্ঠ ও কণ্ঠ বিভক্ত এবং দুই কর্ণ ছিন্ন হয়ে যায়। অবস্থাটি বিচার করলে কৃষ্ণের পক্ষে এযুদ্ধে লৌহ নখরযুক্ত লৌহ হস্ত ব্যবহারের কথাই মনে আসে। তাঁর দীর্ঘাকার হাতও এভাবেই সম্ভব। কৃষ্ণ বিভিন্ন যুদ্ধে লৌহ নখর ব্যবহার করেছেন বলে পুরাণে উল্লেখ আছে।

পৃ ১৮২—(৫) কেশী বধের পর কৃষ্ণের কাছে ব্রহ্মার পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করেন নারদ। হরিবংশের আর্যশাস্ত্র সংস্করণ থেকে অনুবাদ অংশ তুলে দিচ্ছি:

"সমুদ্রতুল্য মহাযুদ্ধের (কুরুক্ষেত্র) সময় এখন নিকট হইয়া আসিতেছে। যুদ্ধে নিহত হইয়া স্বর্গে গমনকারী রাজাদের জন্য যুদ্ধের সুযোগ যেন হস্তগতই হইয়া গিয়াছে।...কেশব! উগ্রসেনপুত্র কংস নিহত হইলে পর যখন আপনি যাদবগণের সংরক্ষকরূপে মুখ্য পদে অধিষ্ঠিত হইবেন, তখন সর্বদিকে রাজাদের মধ্যে সেই মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যাইবে।... রাজাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির ফলে (দেবতারাই যদুদের মধ্যে সে বিভেদ সৃষ্টি করেছিলেন) যখন আপনি রাজাসনে উপবিষ্ট হইবেন, তখন আপনি পাণ্ডবগণের পক্ষ গ্রহণ করিবেন। যখন আপনি রাজাসনে উপবিষ্ট হইবেন, তখন আপনারই প্রভাবে সকল রাজা নিজ নিজ উত্তম ও শুভ রাজলক্ষ্মী পরিত্যাগ করিবেন, ইহাতে সংশয় নাই (অর্থাৎ এমনিই এক পরিকল্পনা দেবসভায় গৃহীত হয়েছে বলে নারদ জানতেন)।...ইহাই হইল আমার ও স্বর্গবাসী (হিমালয়বাসী) দেবগণের সমাচার, যাহা শ্রুতি সমূহের দ্বারা গূঢ়ভাবে প্রতিপাদিত আছে" (অর্থাৎ এই দেবচক্রান্তটিকে নানা কৌশলে পৌরাণিক শ্রুতি সমূহে আচ্ছন্ন করে রাখা হয়েছে)। [ঐ/৬৮-৭৩/ব্রাকেট আমার]।

ধর্মগ্রন্থের স্বরূপ নারদের বক্তব্যে উদ্‌ঘাটিত হয়ে পড়ল। যুদ্ধ, লোভ, হিংসা কূটমন্ত্রণা, বিশ্বাসঘাতকতা.—পুরোহিততন্ত্র প্রতিষ্ঠার এই ইতিহাসই আমাদের পুরাণ ও ধর্মগ্রন্থ: ভূমিগ্রাসী এই আর্যসম্প্রসারণের ইতিকথায় আধ্যাত্মিকতা কোথায়?

পৃ—১৮

পৃ ২০০—(১) কৃষ্ণযুগে বিদ্যাপতি নেই। কিন্তু মাথুর বিরহের যে আর্তি বিদ্যাপতি ফুটিয়ে তুলেছেন তা কালাতীত। আমরাও এযুগে বসে সে যুগের ছবি আঁকছি। সেজন্য তাঁর পদ ব্যবহার করলাম।

পৃ ২০০—(২) ঐ।

---

* রাজসভায় বাগবিতণ্ডার সময় যেখানে সভাসদবর্গের ও কংসের ভাষণ কোট চিহ্নভুক্ত করা হয়েছে, বুঝতে হবে সেই লেখাগুলি সংলাপ হরিবংশ থেকে হুবহু উদ্ধৃত। [১৫ পরিচ্ছেদ দ্রঃ]